ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

সোনার গণপতি
হিরের চোখ

আষাঢ় শ্রাবণ গেল, বৃষ্টি হল না। অথচ ভাদ্রের শুরুতেই দুর্যোগের কী ঘনঘটা। সব সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আছে, আর সেইসঙ্গে মাঝে-মধ্যে চলেছে বজ্র-বিদ্যুৎ সহ প্রবল বর্ষণ। একটানা এবং একঘেয়ে এই বিরক্তিকর আবহাওয়ায় জনজীবনও বিপর্যস্ত। চুপচাপ ঘরে বসে থেকে হাঁফ ধরে যাচ্ছে যেন। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে লোডশেডিং। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর শুভঙ্কর ঘরে শুয়ে পাতলা বেডকভার পা থেকে গলা পর্যন্ত ঢাকা দিয়ে রুদ্ধশ্বাস একটা গল্পের বই পড়ছিল। এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।

শুভঙ্কর উঠে এসে দরজা খুলেই অবাক, "একী বিল্টু!"

"তোর কাছেই এলাম। বিশেষ দরকারে। তোর মা কোথায়!"

"মা পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু এই ভরদুপুরে বৃষ্টিতে ভিজে ব্যাপারটা কী?"

"আছে ভায়া, আছে। সব বলছি। আগে একটা গামছা দে। গায়ের জলটা মুছি। তারপর বলব।"

ওদের কথাবার্তায় মায়ের ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম জড়ানো চোখে উঠে এসে মা বললেন, "কী ব্যাপার বিল্টু! তুমি এমন অসময়ে যে?"

"এমনি এলাম মাসিমা। ঘরে বসে থাকতে ভাল লাগছিল না। তাই কী আর করি, চলে এলাম শুভর কাছে।"

"বেশ করেছ। ও বেচারাও নির্বান্ধব একলা বসে আছে। কী যে আরম্ভ হয়েছে ক'দিন, বিরক্তি ধরে গেল।"

শুভঙ্কর বিল্টুকে নিয়ে ওর ঘরে ঢুকল।

বেশ সাজানো-গোছানো পরিপাটি ঘর শুভঙ্করের। যদিও গলির ভেতরে বাড়ি তবুও বাড়িটা নতুন। নীচে-ওপরে করে আটখানা ঘর। অথচ বাড়িতে বাসিন্দা মাত্র ক'জন। মা, ঠাকুরমা, বাবা ও শুভঙ্কর। বাবা শিবশঙ্কর দত্ত পুলিশে কাজ করেন। ডি এস পি। কলকাতার বাইরে থাকেন। অত্যন্ত ভালমানুষ। ছুটিছাটা খুব কম। তবুও একটু-আধটু সময় পেলেই কলকাতায় আসেন। ওদের বাড়িটা অবশ্য কলকাতায় নয়। বাজে শিবপুরের একটি কানা গলিতে এবং ভদ্র পরিবেশে। ছেলের লেখাপড়ার কথা চিন্তা করেই শিবশঙ্করবাবু তাঁর কোয়ার্টারে নিয়ে যাননি ফ্যামিলিকে। তা ছাড়া তাঁর বৃদ্ধা মা, অর্থাৎ শুভঙ্করের ঠাকুরমাও যেতে চান না এই পরিবেশ ছেড়ে। তাই উনিও খুব একটা জোর করেননি। কেননা, যতই পরিবেশ ভাল হোক তবুও এই

বাজারে তালাবন্দী খালি বাড়ি ফেলে রেখে অন্যত্র থাকাটাও তো ঠিক নয়।

যাই হোক, ওরা দু' বন্ধুতে শুভঙ্করের নিজস্ব ঘরে একটা সোফায় গিয়ে বসল। এই ঘরে চার-পাঁচটি আলমারি ভর্তি যত রাজ্যের বই। ভূত, গোয়েন্দা আর অ্যাডভেঞ্চারের বই যে কত আছে তার কোনও হিসেব নেই। গলির মুখে কেষ্টদার যে ছোট্ট বইয়ের দোকানটা আছে, বাপির সেখানে বলাই আছে নতুন ভাল বই যা কিছুই বেরোক না কেন শুভঙ্করের জন্য এককপি যেন বরাদ্দ থাকে।

বিল্টু সোফায় বসে হাত দুটো ওপর দিকে টান করে একটা হাই তুলে দেহটা বেশ ভালভাবে এলিয়ে দিয়ে বলল, "আমি আজ বিকেলের ট্রেনেই বিশেষ একটু জরুরি কাজে ধলভূমগড় যাচ্ছি। তুই আমার সঙ্গে যাবি শুভ ?"

"ধলভূমগড় ! হঠাৎ ?"

"ব্যাপার আছে। যাবি কি না বল ?"

"অসম্ভব।"

"প্লিজ। তুই না করিস না রে। তুই না গেলে হয়তো আমারও যাওয়া হবে না। তুই যদি যাস তা হলে মা আমাকে আটকাবেন না।"

"তোর কি মাথা খারাপ ? এই দুর্যোগে কেউ ঘর থেকে বেরোয় ?"

"দুর্যোগ কেটে যাবে।"

"এ দুর্যোগ কাটার লক্ষণ কই ?"

"আরে, দিঘার কাছে নিম্নচাপ। কাল সকালে অথবা দুপুরের দিকে মেঘ সরে গিয়ে রোদ উঠবেই।"

"কিন্তু...।"

"কোনও কিন্তু নয়। চল না তুই। চমৎকার বেড়ানো হবে। তা ছাড়া তুই জানিস না ধলভূমগড়ের রাঙা মাটি যখন বৃষ্টিতে ভেজে তখন মাটির রূপ কেমন সিঁদুর বরন হয়ে যায়। আর দূরের ছোট-ছোট টিলা পাহাড়গুলো কী অপূর্ব দেখায়। শাল-মহুয়ার গাছগুলো সতেজ হয়ে এমন এক সবুজ গন্ধ ছড়ায় যে, তা কল্পনাও করতে পারবি না।"

"সবই তো বুঝলুম। কিন্তু এমন কী ব্যাপার ঘটল যে, এই দুর্যোগ মাথায় নিয়ে আজই যেতে হবে ?"

"ব্যাপার যা ঘটেছে তা একমাত্র তোকে ছাড়া আর কাউকেই বলা যাবে না। এমনকী মাকে বাবাকেও নয়। ভাইরা ছোট। তাদেরও নয়। তুই তো জানিস, আমাদের ওই ধলভূমগড়ের বাড়ি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। শেঠ সুরজমল আগরওয়াল নামে এক ভদ্রলোক বাড়িটা কিনে নিচ্ছেন। মোটা টাকা দাম দিচ্ছেন তিনি। জেঠু অসম থেকে এলেই যে-কোনওদিন বিক্রি হয়ে যাবে বাড়িটা।"

"বাড়ি যখন বিক্রিই হবে তখন তার ওপর টান রেখে লাভ ?"

"আছে রে আছে। ওই বাড়ি বিক্রি হওয়ার আগেই আমার কাজ আমি সেরে ফেলতে চাই।"

শুভঙ্কর একটুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর বলল, "তোর বাড়ির কেউ না গেলে হঠাৎ যদি আমরা দু'জনে যাই, অসুবিধে হবে না ?"

pathagar.net

"কিসের অসুবিধে ? পুণ্ডরীককাকা আছেন না ?"

"পুণ্ডরীককাকা কে ?"

"উনি আমাদের পরিবারের একজন বলতে পারিস। খুব ভালমানুষ। আমাদের বাড়িটা তো উনিই দেখাশোনা করেন। আমার দাদুর আমলের লোক। বিশ্বাসী। বাগানের দিকে চার-পাঁচটি টালির ঘর আছে আমাদের। পুণ্ডরীককাকা বউ আর মেয়েকে নিয়ে সেখানেই থাকেন। আমাদের বাড়ি বিক্রি হয়ে গেলে পাছে ওঁরা আশ্রয়হীন হন, তাই আমরা ঠিক করেছি বাগানের দিকটা বিক্রি না করে পুণ্ডরীককাকার নামে লিখে দেব।"

"খুব ভাল কথা। এটা কিন্তু তোরা একটা ভাল সিদ্ধান্ত নিয়েছিস।"

"তুই চল না। গেলে দেখবিখন কী দারুণ ভালমানুষ ওরা। আমরা গেলে যত রাতই হোক কাকিমা ঠিক উনুন ধরিয়ে রান্না করে দেবেন। আর তিন্নি তো আছেই। খুব ভাল মেয়ে। বারো-তেরো বছরের মেয়ে, কিন্তু এমন সুন্দর চা করে যে খেলে অবাক হয়ে যাবি।"

"তোর সঙ্গে তোদের ওই ধলভূমগড়ের বাড়িতে যাওয়ার শখ আমার বহুদিনের। কিন্তু এমন দিনে তুই এলি যে আজ এই দুর্যোগে মা-ঠাকুরমা কিছুতেই ছাড়বেন না আমাকে।"

"বলেই দ্যাখ না একবার।"

"যদি কাল সকালে যাই বা হলেই বা ক্ষতি কী ?"

"ক্ষতি আছে। এখন আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করা উচিত নয়। তা ছাড়া সকালের গাড়ি ধরার অনেক অসুবিধে। ছ'টা কুড়িতে ট্রেন। আকাশের অবস্থা কেমন থাকবে তার কোনও ঠিক নেই। সকালবেলা হয় আমি তোর বাড়িতে আসব, নয় তুই আমার বাড়িতে যাবি। তারপর বাসে চাপব। হাওড়ায় যাব। গিয়ে দেখব ট্রেন ছেড়ে গেছে। কিন্তু আজই যদি যাই আরামে যাব। এখনও হাতে অনেক সময় আছে। ধীরেসুস্থে মেজাজে যাওয়া যাবে। আজ রাত্রিটুকু বিশ্রাম নেব। তারপর কাল সকাল থেকেই শুরু করে দেব কাজ। তুই যদি যাস তা হলে ভাল। না হলে হয়তো একাই যেতে হবে আমাকে। তবে বাড়িতে তো ছাড়বে না। তাই লুকিয়ে পালাতে হবে। অবশ্য তুই গেলে বুকে একটু বল পেতাম আমি। না হলে বাধ্য হয়েই তিন্নির সাহায্য নিতে হবে।"

"কী তোর কাজ আমাকে একবার অন্তত বল।"

"তুই যদি যাস তা হলে বলতে পারি। না হলে গোপন ব্যাপার গোপনই থাক।"

"আমার যাওয়া হবে না রে।"

বিল্টু আর বসল না। হতাশ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "ঠিক আছে। আমি তা হলে একাই যাই। যেতে যখন হবেই তখন অযথা দেরি করেই বা লাভ কী ? মাকে একটু ম্যানেজ করবার চেষ্টা করি। রাজি হলে ভাল। না হলে পালাব।"

শুভঙ্কর ওর হাত ধরে টেনে বসাল। বলল, "দ্যাখ বিল্টু, কী তোর কাজ তা জানি না। তবে তুই যে একটা দারুণ টেনশনের মধ্যে আছিস তা বেশ বুঝতে

pathagar.net

পারছি। বাড়িতে না ছাড়লে একাই যখন পালাবি তখন বিষয়টি নেহাত হেলাফেলার নয়। ঠিক আছে। আমিও যাব। মাকে ঠাকুরমাকে যেভাবেই হোক রাজি করাব আমি।"

বিল্টু বলল, "আমার ঠাকুরদাদা বরদাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে দেহরক্ষা করেছেন। তিনি যখন ধলভূমগড়ে আমাদের বিশাল বসতবাড়ি তৈরি করেন, তখন ধলভূম বাংলার মধ্যেই ছিল। তা আমার ঠাকুরদা ছিলেন একজন ভ্রমণবিলাসী মানুষ। একদিকে তিনি ছিলেন যেমন ভ্রমণ-বিলাসী, অপরদিকে ছিলেন তেমনই শিকারপ্রিয়। তাঁর বন্দুকের গুলিতে কত হিংস্র বা নিরীহ পশুপক্ষী যে প্রাণ হারিয়েছে তার বুঝি লেখাজোখা নেই। আমার সেই ঠাকুরদার লেখা একটি ডায়েরি আজই সকালে আমার হস্তগত হয়েছে। তাতে এমন কিছু লেখা আছে যার রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্যই আজ এই দুর্যোগ মাথায় নিয়েও আমার এই ধলভূমগড় যাত্রা।"

"ডায়েরিটা এনেছিস?"

"এনেছি।"

পলিথিনে মোড়া একটা পুরনো খাতা জামার ভেতরে প্যান্টের সঙ্গে গোঁজা ছিল। সেখান থেকে খাতাটা বের করে শুভঙ্করের হাতে দিয়ে বিল্টু বলল, "খুব মন দিয়ে পড়ে দ্যাখ এটা। একটুও অন্যমনস্ক হবি না। এটা পড়লেই বুঝতে পারবি কেন আমি এত উতলা হয়েছি।"

শুভঙ্কর বিল্টুর কথামতো একমনে পড়ে যেতে লাগল ডায়েরিটা। তাতে যা লেখা ছিল তা হল এই—

"কুমায়ুন রোহিলখণ্ড রেলের ব্রাঞ্চ লাইনে পিলিভিতে গাড়ি বদল করিয়া টনকপুর মাণ্ডি নামক স্থানে যাইতে হয়। সারদা নদীর তীরে টনকপুর একটি সাজানো শহর। নদীর ওপারে নেপাল রাজ্যের পর্বতমালা। এপারে ধুলিগাড়ের মহারণ্য। এইখান হইতেই দুইটি পার্বত্য পথ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া কুমায়ুনের দুই প্রান্তে চলিয়া গিয়াছে। একটি পথ গিয়াছে কাঠগোদাম হইয়া আয়ারপাটার দিকে। আর-একটি পথ তিব্বতে। তিব্বতের দিকে যে পথটি গিয়াছে সেই পথে পিথোরাগড়, ধরচুলা, গারবিয়াং ও কালাপানি পর্যন্ত কোনওক্রমে যাওয়া গেলেও বাকি পথ বড়ই দুর্গম। ওই দুর্গম পথের পথিক হইবার আমাদের কিন্তু খুব একটা বাসনা ছিল না। আমাদের আসল লক্ষ্য ছিল সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭,৪৬১ ফুট উচ্চে অবস্থিত ভয়ঙ্কর অরণ্যানী বেষ্টিত আয়ারপাটা অভিযান। ইহার স্থানে-স্থানে মনুষ্যবাস থাকিলেও অধিকাংশ ভাগ নিবিড় অরণ্যময় ও শ্বাপদসঙ্কুল। ইংরাজ গভর্নমেন্টের প্রভাবে এখন এই স্থানে সুন্দর-সুন্দর ঘর-বাড়ি তৈরি হইলেও ইহার বন্যভাব ঘুচিতেছে না। যাহাই হউক, এই আয়ারপাটার আকৃতি অতি ভীষণদর্শন। রজনীতে সরোবরের জলে যখন ইহার ছায়া পতিত হয় তখন ইহাকে কোনও ভীমকায় দৈত্য বলিয়াই ভ্রম হয়। আমরা আয়ারপাটা অভিযান করিয়াছিলাম এই কারণে যে, দক্ষিণাপথ যেমন ডেক্কানে পরিণত হইয়াছে, অসুরপথ বা অসুরপত্তন তেমনি আয়ারপাটা হয় নাই তো? এইখানে আসিয়া আরও শুনিলাম আয়ারপাটার পার্শ্ববর্তী এবং সরোবরের পশ্চিমস্থ আর-একটি পর্বতের নাম দেওপাটা। সন্দেহ তখন আশায় পরিণত হইল এবং আমরা দেওপাটা দেখিতে চলিলাম। এই পর্বত সাগরপৃষ্ঠ হইতে ৭,৯৮৭ ফুট উচ্চ।

অত্যন্ত রমণীয় স্থান। এই দেওপাটা দেবপথ বা দেবপত্তনের অপভ্রংশ, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। যাহাই হউক, ইতিহাসে দেখা যায় পশ্চিমের খাস উত্তরখণ্ডী গাড়োয়ালিদের সহিত দক্ষিণের ও পূর্বের কুমায়ুনিদের ঘোর শত্রুতা ছিল। ইহাই প্রকৃতপক্ষে আয়ারপাটাকে অসুরপত্তন বলিয়া নির্দেশ করে। বর্তমান রেলপথ যাইবার পূর্বে এতদঞ্চলে আসিবার জন্য আয়ারপাটার ভিতর দিয়াই প্রবেশপথ ছিল। ভারতীয় আর্যগণ পশ্চিমের দেবপথ দিয়া প্রবেশ করিতেন বলিয়া হয়তো এই স্থান দেবপত্তনে পরিণত হইয়াছিল এবং পরে দক্ষিণে যখন উপনিবেশ স্থাপন করেন বা দক্ষিণের পথ দিয়া আর্যাবর্তে গমন করেন তখন নিদর্শক হিসাবে দক্ষিণের এই পর্বতকে আর্যপত্তন বা আর্যপথ নামে অভিহিত করেন নাই তো? ইহাই গবেষকদের ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের চিন্তা ও অনুসন্ধানের বিষয়। আমরা বেশ কয়েকদিন ধরিয়া এই আর্যপথ আয়ারপাটা ও দেবপত্তনের গুহাগুলি এবং নির্জন অরণ্য ঘুরিয়া সেকালের বহু দুষ্প্রাপ্য নিদর্শন সংগ্রহ করিলাম। এই সময় চেমং দাওয়া লামা নামে এক মৃত্যুপথযাত্রী তিব্বতী একটি দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য জিনিস আমাদের দেন। সেটি হল বহু বছরের প্রাচীন নৃত্যরত এক সোনার গণপতি। এক ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট এই সোনার গণপতির হিরার চোখ। মূল্যবান দুইটি হিরা গণপতির দুই চোখে এমনভাবে বসানো যে, তাহা দেখিলেই চোখ যেন দ্যুতিতে ঝলসাইয়া যায়। তিব্বতি লামা আমাদিগকে অনুরোধ করেন এই গণপতির মূর্তিটি আমরা যেন অত্যন্ত যত্ন সহকারে গারবিয়াং-এ তাঁর স্ত্রীর নিকট পৌঁছাইয়া দিই। এই প্রাচীন মূর্তিটি কোনও এক হিন্দু রাজা এক সন্ন্যাসী মারফত রাবণ হ্রদে বিসর্জনের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। পথে খাম্পা দস্যুদল কর্তৃক মূর্তিটি অপহৃত হয়। কিন্তু এই অভিশপ্ত মূর্তি অপহরণকারী দস্যুদল হঠাৎ তুষারঝড়ে নিহত হয়। সন্ন্যাসী সেই মূর্তি অপহরণের ঘটনাটি সকলকে বলিয়াছিলেন। তাই আমি দীর্ঘদিন ওই মূর্তির খোঁজে জীবনের দীর্ঘ সময় নষ্ট করি। পরে যখন মূর্তিটি আমার হস্তগত হয় তখন আমার স্ত্রী বারংবার আমাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন এবং অনুরোধ করিয়াছিলেন এটিকে রাবণ হ্রদে ফেলিয়া দিয়া আসিবার জন্য। কিন্তু আমি লোভের বশবর্তী হইয়া এই মূর্তিটি লইয়া আয়ারপাটা অতিক্রম করিয়া সমতলে বিক্রয়ের জন্য যাইতে থাকি। ইতিমধ্যে হঠাৎ এমন গুরুতর রকমের অসুস্থ হইয়া পড়ি যে, এখন আর আমার সুদূর গারবিয়াং পর্যন্ত যাইবার সাধ্যমাত্র নাই। তাই অনুরোধ, এই মূর্তিটি আমার স্ত্রী শিরিং দাওয়া লামার হাতে তুলিয়া দিলে সে উহা অবশ্যই রাবণ হ্রদে নিক্ষেপ করিবে এবং আপনারাও ওই সঙ্গে মানস সরোবর দর্শন করিয়া আসিতে পারিবেন। দাওয়া লামার ওই হিরার চোখ বিশিষ্ট সোনার গণপতি লইয়া আমরা গারবিয়াঙের পথে রওনা হই। এই সময় পথিমধ্যে বাবর সিং তামাং নামে একজনের সহিত আমাদের বন্ধুত্ব হয়। কিন্তু লোকটি যে একটি পাক্কা শয়তান প্রথমে তাহা বুঝিতে পারি নাই। যখন পারিলাম তখন সোনার গণপতি আমরা খোয়াইয়া বসিয়াছি। যাহাই হেউক, দেবীধুরা নামক একটি স্থানে গভীর জঙ্গলের মধ্যে বাবরের সহিত আমাদের আবার দেখা হইলে আমার দুই সঙ্গী অর্জুন সিং ও মহীপালের সহিত বাবরের তুমুল যুদ্ধে বাবর সহ আমার দুই সঙ্গীই নিহত হন। আমি তখনও এই গণেশ প্রতিমার অশুভ প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন হই নাই। তাই বারংবার এটি চুরি করিবার চিন্তা মাথায় আনিতেছিলাম। এক্ষণে সুবিধাই হইল। আমি মূর্তিটির একক অধীশ্বর হইয়া ইহার কুফল সম্পর্কে কোনওরকম বিচার-বিবেচনা না করিয়া গারবিয়াঙের পথ না ধরিয়া সোজা চম্পায়ত ও টনকপুর হইয়া বাড়ির পথ ধরিলাম। আমার শোবার

ঘরের মাথার দিকে একটি দেওয়ালের চোরকুঠরিতে ওই মূর্তিটি গাঁথনির মধ্যে লুকাইয়া রাখিলাম। আমার পরিবারের কাহাকেও ওই মূর্তি প্রসঙ্গে কিছু বলি নাই। কেননা, বলিলেই নির্বোধরা আমাকে ওই কুসংস্কারবশত মূর্তিটি যথাস্থানে ফিরাইয়া দিয়া আসিবার জন্য অনুরোধ করিবে অথবা লোকের কাছে রাষ্ট্র করিয়া সম্পত্তি ধারণের গর্ব জাহির করিবে। তবে একটা কথা বলিয়া রাখি—আমি কিন্তু সোনা অথবা হিরার লোভে ওই মূর্তিটি চুরি করি নাই। কারণ মূর্তিটির গঠনশৈলী আমাকে দারুণভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। ওজন করিয়া দেখিয়াছি মোট আধসের মাত্র সোনা রহিয়াছে ওই মূর্তির ভিতর। কুড়ি টাকা ভরি হইলে আধসের সোনার কতই বা দাম? অবশ্য হিরার চক্ষু দুইটির মূল্যায়ন করা হয় নাই। যাহাই হউক। মূর্তি তো স্থাপিত হইল। কিন্তু কয়েকদিন যাইতে না যাইতেই আমি অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে দিন কাটাইতেছি। আমি প্রায় রাত্রেই স্বপ্ন দেখিতেছি ওই সোনার গণপতি তাঁর হিরার চোখ দিয়া ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমাকে শাসাইতেছেন এবং ভয়ঙ্কর নৃত্যের মাধ্যমে বলিতেছেন, তাঁহাকে রাবণ হ্রদের জলে ফেলিয়া দিয়া আসিবার জন্য। আমি কি করিব যখন ভাবিতেছি তেমন সময় হঠাৎ একদিন রাতে...”

ব্যস। এর পর আর কিছুই লেখা নেই। হয়তো কিছু লিখবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি, কিন্তু লিখে যেতে পারেননি। শুভঙ্করের কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমল। এই পর্যন্ত পড়ে সে অপার বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল বিল্টুর মুখের দিকে।

বিল্টু বলল, “শেষ পর্যন্ত পড়লি?”

“হ্যাঁ পড়লাম।”

“এর পরে আর কি দুর্যোগ কাটা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায়? না, কাল সকাল পর্যন্ত তর সয়?”

“তার আগে একটা কথা বল। তোর দাদু কীভাবে মারা যান তুই জানিস?”

“জানি বইকী। অপঘাতে। আমাদের ধলভূমগড়ের ওই বাড়িতে একবার ভয়াবহ ডাকাতি হয়। দাদু তাতেই মারা যান। পরে আরও দু-একবার ওই ধরনের ডাকাতি হতেই আমরা দেশছাড়া হই। আমার জেঠু চা-বাগানের চাকরি পেয়ে চলে যান অসমে। এখন দুরারোগ্য যক্ষ্মা রোগে ভুগছেন। তাঁর বড় ছেলে ব্লাড ক্যান্সারে মারা যায়। আমার বাবা খিদিরপুরে ডকে কাজ করেন। দু-দু'বার দুটি দুর্ঘটনায় একবার পায়ের গোড়ালির হাড় ভেঙেছেন আর-একবার বাঁ হাতের একটি আঙুল। আজ সকালে এই ডায়েরিটা আমার হাতে আসার পর থেকেই আমার চোখের সামনে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমি বেশ বুঝতে পেরেছি ওই সিদ্ধিদাতা গণেশের অশুভ প্রভাব আমাদের কারও পক্ষেই শুভপ্রদ নয়। যেভাবেই হোক রাবণ হ্রদে ওকে ফেলতেই হবে। না হলে হয়তো আমাদের বংশই থাকবে না।”

শুভঙ্কর বিল্টুর কথা শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে কী যেন ভাবল। তারপর বলল, “শোন বিল্টু, যদি আগাগোড়া ব্যাপারটাই একটা রূপকথার গল্পের মতো বা কুসংস্কারে ভরা, তবুও এ-জগতের সব কিছুই হেসে উড়িয়ে দেওয়ার নয়। তাই এ-ব্যাপারে আমিও তোর সঙ্গে একমত। এই মূর্তি যদি উদ্ধার করা যায় তা হলে একে রাবণ হ্রদে না ফেলা ছাড়া কোনও উপায়ই

pathagar.net

নেই। সেখানে কীভাবে যাবি বা যেতে পারবি কি না সে-কথা আলাদা। তবে যেতেই হবে। তোর দাদুর ডায়েরির প্রতিটি ছত্রে ফুটে উঠেছে, ওই মূর্তি যেখানে, অশুভ প্রভাবও সেখানে। সেই সন্ন্যাসী, খাম্পা দস্যুদল, তিব্বতি লামা, বাবর সিং, অর্জুন সিং, মহীপাল, এমনকী তোর দাদুর ওই শোচনীয় মৃত্যুও একই সূত্রে গাঁথা। শুধু তাই নয়, ওই অশুভ মূর্তির প্রভাবে ওই বাড়িতে একাধিকবার ডাকাতির কথাটাও চিন্তা কর। যার ফলে আজ তোরা সর্বস্বান্ত ও ভিটে-ছাড়া। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই, মূর্তির ব্যাপারে তোর জেঠু কিংবা বাবা কেউ কি কিছুই জানতেন না?"

"তা যদি জানতেন তা হলে তো সে-ব্যাপারে একটা আলোচনা হত এবং আমিও তা শুনতে পেতাম। তা ছাড়া দাদু তো কাউকেই কিছু বলে যাননি। যা লিখবার লিখেছিলেন ওই ডায়েরিতে।"

"তা হলে তোদের হাওড়ার ভাড়া-বাড়িতে ধলভূমগড়ে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে লেখা ওই ডায়েরিটা এল কী করে? ভূতে আনেনি নিশ্চয়ই।"

"শুনেছি ধলভূমগড়ের বাড়ি থেকে কয়েকটি প্রয়োজনীয় জিনিস এখানে আনা হয়েছিল। তার সঙ্গেই হয়তো চলে আসবে এটা। তবে বাবা-মা বা ঠাকুরমার মুখে আমি এটুকু শুনেছি যে, আমাদের ওই ধলভূমগড়ের বাড়িতে নাকি সাত রাজার ধন লুকনো আছে। ওই বাড়ির জঠরে-জঠরে ইটের গাঁথনির গুপ্ত কোটরে আছে অনেক অমূল্য রত্ন।"

"তোর দাদুর লেখা আর কোনও ডায়েরি বা অন্য কিছু ওখানে নেই?"

"থাকতে পারে। কখনও তো ও-ব্যাপারে সচেষ্ট হয়ে কিছু অনুসন্ধান করিনি। তবে ডাকাতির সময় দাদুর অনেক মূল্যবান কাগজপত্র ডাকাতরা পুড়িয়ে দিয়ে যায়।"

"এই বাড়ি তোরা কী বলে বিক্রি করে দিচ্ছিস?"

"আমি তো দিচ্ছি না ভাই, দিচ্ছেন আমার জেঠু আর বাবা। এখন আমরা গরিব হয়ে এসেছি। আগের মতো সেই প্রতিপত্তি আর নেই।"

"আমার মনে হয় ওই বাড়ির মধ্যে লুকনো কোনও মূল্যবান কিছুর কথা শুনেই ওই ব্যবসাদার বাড়িটি কিনে নিতে চান। এই ব্যবসায়ীদের কাজই হল লক্ষ-লক্ষ টাকা খরচ করে পুরনো বাড়ি কেনা এবং তার ভিত পর্যন্ত খুঁড়ে দেখা। বাড়িটা কত দামে বিক্রি হচ্ছে?"

"শুনেছি দেড় লাখ টাকায়।"

"তা হলে? অথচ তোরা নিজেরাই যদি ওই বাড়িটাকে ভেঙে বিক্রি করতিস, তা হলে হয়তো দেখতিস ওই বাড়ির ইট বিক্রি করেই কয়েক লাখ টাকা পেয়ে গেছিস। সাবেককালের বাড়ি যখন, বিশ ইঞ্চির দেওয়াল তো নিশ্চয়ই।"

"বিশ ইঞ্চি কী রে! চল্লিশ ইঞ্চি।"

"তা হলে কেন এত অল্প দামে এই বাড়ি বেচে দিচ্ছিস তোরা? এর ওপর ঘরের কড়ি-বরগা, বার্মাটিকের জানলা-দরজা তো আছেই। তার ওপর সত্যিই যদি গুপ্তধন কিছু থাকে তা হলে তো কথাই নেই। বিক্রির আগে তোর বাবাকে আর-একবার ভেবে দেখতে বল।"

boiRboi.net

"মা অনেক বুঝিয়েছেন। কিন্তু বাবার ওই এক গোঁ। ওসব লুকনো ধনরত্ন মাথায় থাক। যে পায় সে নিক। এখন একসঙ্গে অত ক্যাশ টাকা তো হাতে পেয়েই যাই। আমি অবশ্য এই ডায়েরির কথা বা সোনার গণেশের কথা কিছু বলব না কাউকে। শুধু একবার যদি ওই জিনিস হাতে পাই তা হলে যেভাবেই হোক জিনিসটাকে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে এসে শাপমুক্ত হব।"

"তুই তা হলে সত্যিই যাবি বিল্টু? তোর ভয় করবে না? সে পথ কিন্তু যেমন দূর, তেমনই দুর্গম।"

"জানি। তবুও যেতে আমাকে হবেই। এখন তুই-আমি গিয়ে কোনওরকমে মূর্তিটাকে আগে উদ্ধার করি চল। এবার বুঝতে পারছিস তো কেন আমি অত করে তোকে পেতে চাইছি? আমার আর একদম তর সইছে না। মনের ভেতরে যে কী হচ্ছে তা তোকে বলে বোঝাতে পারব না। ওই বাড়ি বিক্রি হলে, ওই বাড়ি ভেঙে যখন তার প্রতিটি ইট লরিতে করে চালান হয়ে যাবে, তখন ওই ব্যবসায়ী সোনার গণেশ পেয়ে উল্লাসে নাচবে, এ-আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না।"

শুভঙ্কর বলল, "সে-কথা ঠিক। তবে ধর, যদি আমরা ওই মূর্তি উদ্ধার করতে না পারি?"

"না পারবার কোনও কারণ আছে কি? নিশ্চয়ই পারব। গণেশের ইচ্ছাও হয়তো তাই। না হলে এতদিন বাদে ওই জিনিসটা হঠাৎ করে এই দুর্যোগের দিনে আমার হাতেই বা এল কেন? আর কেনই বা ওই মূর্তিটাকে পাওয়ার জন্য আমার মনের মধ্যে অমন তোলপাড় করছে?"

কথা বলতে-বলতেই দুপুর গড়িয়ে গেল।

শুভঙ্কর বলল, "ট্রেন ক'টায়?"

"সাড়ে পাঁচটায়।"

"তা হলে তো আর দেরি নেই।"

"এবার তা হলে ওঠা যাক।"

শুভঙ্কর বিল্টুকে নিয়ে ওর মায়ের কাছে এল। মা তখন চোখে-মুখে জল দিয়ে সবে চায়ের সরঞ্জামটি নিয়ে বসেছেন। শুভঙ্কর বলল, "মা! আমাকে কয়েকটা টাকা দেবে? খুব দরকার।"

"টাকা! কত টাকা।"

"তা ধরো না কেন একশোর মতন।"

"একশো! অত টাকা কী করবি তুই?"

"আমি বিল্টুর সঙ্গে আজ সন্ধের গাড়িতে ওদের ধলভূমগড়ের বাড়িতে যাব।"

মা যেন শিউরে উঠলেন কথাটা শুনে, "তোর কি মাথাখারাপ? এই দুর্যোগে কোথায় যাবি? এই অবস্থায় কেউ ঘর থেকে বেরোয়?"

"যাই না মা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি। আমার অনেকদিনের সাধ ওদের বাড়িতে যাওয়ার।"

মা বললেন, 'বেশ তো, যেতে চাস যা। আমি বাধা দেব না। তবে এই দুর্যোগে আমি ছাড়ব না। কোথায় কখন কী অঘটন ঘটে তা কে বলতে

pathagar.net

পারে ?" তারপর বিল্টুকে বললেন, "তোমাকেও বলি বাছা, তুমি কি আর দেশে যাওয়ার দিন পেলে না ? একেবারে আজই যেতে হবে ?"

বিল্টু বলল, "একটা জরুরি চিঠি পেয়ে যাচ্ছি মাসিমা। না গেলে নয়। আমি একাই যাচ্ছিলাম। তাই ভাবলাম শুভটা যদি যায়।"

"কাল সকালে যাও না।"

এবারে বিল্টুর হয়ে শুভঙ্করই বলল, "কাল গেলে হবে না মা। বলেই একটা মিথ্যে কথা বলল, "আসলে যিনি ওদের দেশের বাড়ি দেখাশোনা করেন, সেই পুণ্ডরীককাকার খুব অসুখ। টেলিগ্রাম এসেছে। তাই কিছু টাকা নিয়ে ও দিতে যাবে। দু-একদিনের তো ব্যাপার। যাব ?"

এর পরে আর কথা চলে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মা বললেন, "আমি কিছু বলতে পারব না। তোমার ঠাকুরমাকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখো। উনি যদি বলেন তা হলে যাবে।"

ঠাকুরমা পাশের ঘরেই ছিলেন। ওদের কথা শুনে বেরিয়ে এসে বিল্টুকে বললেন, "তা বাপু এইরকম যখন অবস্থা তখন তোমার বাবা তো একবার যেতে পারতেন।"

"বাবার এখন কোনওমতেই অফিস কামাই করা চলবে না। তা ছাড়া আমি তো একা-একা দেশের বাড়িতে যাই।"

শুভঙ্কর ঠাকুরমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, "তুমি না কোরো না ঠাকুরমা। আমাকে যেতে দাও। অন্তত এই বৃষ্টি-বাদলের হাত থেকে দু' দিন একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।"

ঠাকুরমা বললেন, "না। এই দুর্যোগে যাওয়া তোমার হবে না।"

বিল্টু বলল, "তবে থাক। আমি আসি রে শুভ। তোর মা-ঠাকুরমা কেউই যখন রাজি হচ্ছেন না তখন আমিও আর যেতে বলব না। বলা যায় না অঘটন যদি কিছু ঘটে তখন আমাকেই তো দায়ী করবেন সবাই।"

মা বললেন, "একটু বসে যাও বাবা। অনেকক্ষণ এসেছ। চা করি, একটু চা অন্তত খেয়ে যাও।"

শুভঙ্কর বলল, "থাক। ওর হয়তো দেরি হয়ে যাবে। ওকে যেতে দাও।" বলে বিল্টুকে বলল, "তোকে আর চা খেতে হবে না রে। তুই চলে যা। আর কখনও ভুলেও যেন আমাদের বাড়িতে আসিস না। আমি তোর সুসময়ের বন্ধু। অসময়ের নয়। মনে করবি তোর বন্ধু শুভঙ্কর মরে গেছে।"

মা-ঠাকুরমা দু'জনেই হাঁ-হাঁ করে উঠলেন এবার, "ও মা! একী অলুক্ষুণে কথা ?"

শুভঙ্কর বলল, "ঠিকই বলছি, ছেলে শুধু তোমাদেরই ঘরে আছে আর কারও ঘরে নেই, না ? ওর মা যদি এই বৃষ্টি-বাদলার দিনে ওকে বুক ধরে ছেড়ে দিতে পারেন তা হলে আমাকে একটু ওর সঙ্গে ছাড়তে তোমাদের আপত্তি কী ? অতদূর পথ একটি ছেলে একা যাবে তাই। তা ছাড়া আমিও তো কচি খোকাটি নই। বাবা বাইরে থাকেন, হঠাৎ যদি কোনও কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন আর সেদিন যদি এইরকম কোনও বৃষ্টি-বাদলা হয় তা হলে সেই অজুহাত দেখিয়েও কি তোমরা আমাকে এইভাবে ঘরে আটকে রাখবে ? আমার বাবার

কাছে যেতে দেবে না ?"

এবার কাজ হল। ঠাকুরমা লাফিয়ে উঠলেন, "সেই থেকে কী সব যা-তা বলছিস বল দেখি ? বিদেশ বিভুঁইয়ে আছে লোকটা। দুর্গা দুর্গা।"

মা বললেন, "একশোটা টাকা হলেই তোমার হবে তো ? আমি দিচ্ছি। খুব সাবধানে যাবে। গিয়েই চিঠি দেবে কিন্তু।"

বিল্টু বলল, "এই তিন ঘণ্টার রাস্তার জন্য চিঠি কী হবে মাসিমা ? তা ছাড়া আমরা খুব জোর দু' রাত থাকব। তা আপনিও চলুন না আমাদের সঙ্গে।"

এইবার সাহস পেয়ে নরম হল মায়ের মন। বললেন, "আমি গেলে কী করে হবে বাবা ? মাকে কে দেখবে ? তা ছাড়া ওর বাবা কখন কোন মুহূর্তে এসে পড়েন তা ঠিক কী ? তোমরা যাও। একটু বোসো। আমি গাড়ির খাবারটা করে দিই।"

শুভঙ্কর আর বিল্টু দু'জনেই হেসে গড়িয়ে পড়ল, "গাড়ির খাবার কী হবে ? ট্রেনে চাপব কি নামব। তিন ঘণ্টার জার্নি।"

"সত্যি !" মায়ের মুখ ঝলমলিয়ে উঠল এবার। বললেন, "আমি ভাবছি না জানি কত দূর। কী সব পাহাড়-টাহাড় আছে শুনেছিলাম।"

"আছে তো। কিন্তু তাই বলে দূর নয়। খড়্গপুর, ঝাড়গ্রাম, চাকুলিয়া, ঘাটশিলা। ট্রেন থামলে তার আগেই নেমে পড়ব।"

ব্যস। অনুমতি পাওয়া গেল। সেইসঙ্গে টাকাও। মা পেট ভরে জলখাবার খাইয়ে দিলেন দু'জনকে। শুভঙ্কর একটা কাঁধে-ঝোলা ব্যাগে ওর জামা-প্যান্ট, গামছা, দাঁত মাজার সরঞ্জাম ইত্যাদি গুছিয়ে নিয়ে মা-ঠাকুরমাকে প্রণাম করে রাস্তায় নামল। বিল্টুর ছাতা ছিল। শুভঙ্কর তবুও নিজের জন্য একটা ফোল্ডিং ছাতা নিয়ে নিল। আকাশে মেঘ তখন আরও ঘনিয়ে আসছে। আর-একবার তেড়ে ঢালবে বুঝি।

ওরা দু'জনে রাস্তায় নেমে এ-পথ সে-পথ করে বিল্টুদের বাড়ি এল। আসতে আসতে শুভঙ্কর বলল, "আমি গুরুজনদের কখনও মিথ্যে কথা বলি না। তবে তোদের ওই পুণ্ডরীককাকার অসুখের কথাটা বানিয়ে না বললে মায়ের মন কিন্তু গলত না।"

বিল্টু বলল, "আমিও বলি না। অবশ্য এক-আধবারে দোষ নেই। কিন্তু এটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেলেই খারাপ।"

বিল্টুদের বাড়ি এসে বিল্টুও বায়না ধরল ওর মায়ের কাছে, "মা ! এই দ্যাখো কে এসেছে।"

"ওমা ! শুভঙ্কর।"

"আমাকে কয়েকটা টাকা দাও না মা। আমি ওকে নিয়ে ধলভূমগড় যাব।"

"এই বৃষ্টিতে !"

"বৃষ্টি তো কী হয়েছে ? এই দ্যাখো, শুভঙ্করও যাওয়ার জন্য তৈরি।"

আসলে শুভঙ্করের বাবা ডি এস পি বলে সবাই ওদের একটু মর্যাদার চোখে দ্যাখে। তাই মা আর না করলেন না। বরং নিজেদের দেশের বাড়ির গুণগান গাইতে গাইতে বিল্টুর জামা-প্যান্ট গুছিয়ে-গাছিয়ে দিলেন।

ওরা জি টি রোডে এসে হাওড়ার বাস ধরল। বাস একেবারে ফাঁকা। সব

সিট খালি। যদিও সেগুলো বৃষ্টির জলে ভিজে শপশপ করছে। তবু লোক কোথায়? শুধু ড্রাইভারের পেছনে লেডিজ সিটটা শুকনো ছিল। দু'জন ভদ্রলোক বসে ছিলেন সেখানে। ওরা বসবার একটুও চেষ্টা না করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে হিহি করে কাঁপতে লাগল। প্রবল বর্ষণে তাপমাত্রাটা হঠাৎ কোথায় নেমে গেছে। তাই বৃষ্টিভেজা শরীরে শীত লাগছে খুব।

বাস দ্রুত এগিয়ে চলল রাস্তায় জমে থাকা জল কাটিয়ে, নৌকোর মতো ভেসে-ভেসে। অন্য দিনের মতো থমকে-থমকে ব্রেক কষে ঝাঁকানি মেরে দশ মিনিটের পথ পঞ্চাশ মিনিটে না গিয়ে দশ মিনিটেই গেল। সাবওয়ের মুখে নেমে ঢুকে পড়ল ওরা স্টেশনে।

হাওড়া স্টেশনের ভেতরও এখন জলে জলময়। সেই প্রাণচঞ্চল হাওড়া স্টেশন এখন কেমন যেন খাঁ-খাঁ করছে। লোকজনের সংখ্যা এত কম যে, তা বুঝি আঙুল দিয়ে গোনা যায়। ওরা ঘাটশিলার দুটো টিকিট কেটে প্লাটফরমে যখন ঢুকল, স্টিল এক্সপ্রেস তখন ছাড়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

॥ ২ ॥

ভাগ্য ভালই বলতে হবে। না হলে এই দুর্যোগে কখনও ট্রেন চলে? ট্রেন অবশ্য যথাসময়ে না ছেড়ে মিনিট কুড়ি দেরিতে ছাড়ল। তাতে কী? এ তো বিদেশ-বিভুঁইয়ে যাত্রা নয়। এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়িতে যাওয়া। যখনই পৌঁছক না কেন কোনও অসুবিধেই হবে না।

বিল্টুর মনে উত্তেজনার ঝড় বইলেও শুভঙ্করের এখন ভাল লাগছে খুব। বাবার পুলিশের চাকরি। ডিস্ট্রিক্টে আছেন। তাই সব সময় বাইরে থাকতে হয় বলে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার ব্যাপারটা ওর ভাগ্যে হয়েই ওঠে না। ওর যখন সাত বছর বয়স তখন মনে আছে, একবার শুধু দুর্গাপুরে গিয়েছিল ওর ছোট মাসির বিয়েতে। সেই ওর প্রথম। তারপরে এই। অথচ বিল্টু কেমন ইচ্ছে হলেই ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। বছরে একবার দেশের বাড়িতে বাবা-মায়ের সঙ্গে তো যায়ই, তা ছাড়াও মাঝেমধ্যে নিজেও চলে যায়। বিল্টুরা চার ভাই। তার মধ্যে ও-ই বড়। কাজেই সময়ে-অসময়ে ওকেই যেতে হয়। তবে আজকের এই যাওয়াটা একটু অন্যরকম।

এই বর্ষণমুখর দিনশেষে ট্রেনের দুলুনিতে সব কিছুই কেমন যেন স্বপ্নময় হয়ে ওঠে ওদের কাছে। ওদের দু'জনেরই কল্পচোখে ভেসে ওঠে এক নৃত্যরত ধাতব গণপতি। যাঁর সোনার শরীর। হিরের চোখ। ওদের দু'জনেরই তাজা দুটি প্রাণে এখন উত্তেজনার ঢেউ। ওদের মানস-নয়নে সুদূরের হাতছানি। শুভঙ্কর মনে-মনে ভাবে, যদি সত্যিই ওই সোনার গণপতিকে উদ্ধার করতে পারে ওরা, তা হলে বিল্টু একা নয়, শুভঙ্করও সঙ্গী হবে ওর। ওই দূর দুর্গমে যাওয়ার ছাড়পত্র বাড়ি থেকে কখনওই পাওয়া যাবে না। তবুও যাবে। কতদিন আর সময় লাগতে পারে? একমাস, দু'মাস, তিনমাস? তার বেশি তো নয়? মা, ঠাকুরমা, বাবা প্রথম-প্রথম হয়তো একটু কান্নাকাটি করবেন, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। যাওয়ার দিন টেবিলের ওপর 'চললাম' বলে ছোট্ট একটা

pathagar.net

চিঠি রেখে একেবারেই উধাও হয়ে যাবে ও।

ট্রেন হু-হু করে ছুটে চলেছে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারায় ভেসে যাচ্ছে দেশ। ভিড় একদম নেই বলেই বেশ ভালভাবে বসার জায়গা পেয়েছে ওরা। মাঝেমধ্যে কফিওয়ালাদের আনাগোনা। পুরোপুরি ভেজাল ঠাণ্ডা পানীয়ও আসছে।

বিল্টু বলল, "কফি খাবি?"

শুভঙ্কর বলল, "তা খেলে একটু মন্দ হয় না।"

নরম প্লাস্টিক কাপে কফিওয়ালা কফি দিল। উঃ। কী গরম। হাত দিয়ে যেন ধরা যায় না।

দু' বন্ধুতে ঘনিষ্ঠ হয়ে কফি খেতে-খেতে খুব চাপা গলায় ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। অ্যাডভেঞ্চারের নেশায়, আনন্দের উত্তেজনায় অভিভূত দু'জনে।

শুভঙ্কর বলল, "দ্যাখ বিল্টু, তুই তো মাঝেমধ্যে প্রায়ই ঘর থেকে বেরোস। একা-একা কেমন তোদের দেশের বাড়িতে আসিস। আমার কিন্তু এই প্রথম। এই দুর্যোগ মাথায় নিয়ে এইভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে আসা, এইরকম ঝড়ের গতিতে ট্রেনে চেপে হু-হু করে ছুটে চলা, এ যে কী দারুণ ফ্যানটাস্টিক, তা তোকে বলে বোঝাতে পারব না। আজ বুঝেছি, ঘরকুনো হয়ে বসে থাকার চেয়ে ঘর ছাড়ার আনন্দ কত। এইটুকু সময়ের মধ্যেই আমার যেন নেশা ধরে গেল রে ভাই।"

"তোকে পেয়ে আমারও খুব ভাল লাগছে রে। এখন সত্যি কথা বলতে কী, আমার আর মনেই হচ্ছে না যে বাড়ি ফিরি।"

"আমারও। ভাবছি কাল সকালের ডাকেই বাড়িতে একটা চিঠি লিখে দেব যে, আমাদের ফিরতে একটু দেরি হবে। অন্তত হপ্তা-খানেকের আগে ফিরছি না।"

"ও, চিঠি আমিও দেব।"

কফি খাওয়া শেষ করে বেশ ভাল করে একটু গুছিয়ে বসে বিল্টু বলল, "আজ বাড়িতে গিয়ে রাতদুপুরে আর গোয়েন্দাগিরি করব না। যা করব কাল দুপুরে। আজ পেট ভরে ভাত-টাত খেয়ে ওপরের ঘরে খাটে শুয়ে তেড়ে একটা ঘুম দেব দু'জনে। তারপর কাল খুব ভোরে উঠে যদি দেখি বৃষ্টি নেই, আকাশ পরিষ্কার, তা হলে তোকে নিয়ে অনেক দূরে বেড়াতে যাব। ভিজে লাল মাটি মাড়িয়ে চলে যাব শাল-মহুয়ার বনের দিকে। কত ছোট-ছোট টিলা আমাদের ওখানে, ঘুরে কূল পাবি না। একটু দূরে সুবর্ণরেখা নদীও পাবি। আর ঘাটশিলা? সেখানে যেন অসীম অপার সৌন্দর্য হাতছানি দিয়ে ডাকছে।"

"তবে যে সবাই বলে ঘাটশিলায় এখন আর দেখবার কিছুই নেই?"

"কথাটায় যে খুব একটা মিথ্যে তা নয়। অরণ্য নিধনের কর্মযজ্ঞে আক্রান্ত হয়ে ঘাটশিলা তার অনেক সৌন্দর্যই হারিয়েছে। তবে বেশিরভাগ লোকই ফুলডুংরি টিলা, ঘাটশিলা স্টেশন, আর মউভাণ্ডার দেখে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে আসে। কিন্তু ঘাটশিলা তো এখন ঘাটশিলাতে নেই। ঘাটশিলা দেখতে

গেলে যেতে হবে হরিণধুবড়ি, রাতমোহনা, ধারাগিরির ঝরনা। সুবর্ণরেখা পার হয়ে মুসাবনির দিকে কিংবা ডান দিকে বাঁক নিয়ে রাখা-র জঙ্গল ফেলে রঙ্কিণী। অথবা তামুকপালের বনে। তামুকপালের বন অবশ্য দেখা যাবে না আর। সম্প্রতি কাটা হয়েছে নৃশংসভাবে। তবে এখানে দাঁড়িয়ে ঢেউ খেলানো টিলার সারি ও দূরের পাহাড়গুলো দেখলে মন ভরে যাবে। ধলভূমগড় থেকে রেলের লাইন ধরে হেঁটেও আসা যায় তামুকপাল। সেখান থেকে ঘাটশিলা।"

"আমরা তো ঘাটশিলাতেই নামছি।"

"নামলেই বা। ওখানে তো থাকছি না। ওখানে নেমে অটো, মিনি যা পাব তাতে চেপেই ফিরে আসব ধলভূমগড়ে। আর যদি আমাদের স্টেশনেই ট্রেন থামে তা হলে তো কথাই নেই।"

ধীর শ্লথ গতিতে ট্রেন থামল খড়্গপুরে।

বিল্টু বলল, "বাবাঃ। এর মধ্যেই খড়্গপুরে এসে গেল? এই তো চাপলাম ট্রেনে!"

পাশের সিটে বসা একজন ভদ্রলোক বললেন, "আজ এই দুর্যোগের দিনে এইভাবে যে লাইন ক্লিয়ার পাব তা কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি। ট্রেন ছাড়ার সময় যে কুড়ি মিনিট লেট ছিল সেটাকেও মেকআপ করে নিয়েছে।"

খড়্গপুরে অনেক লোক নেমে গেল। আবার উঠলও অনেক। তবে অন্যদিনের মতো নয়। এদের মধ্যে বিল্টুর পরিচিত শশিমাস্টারও উঠলেন। ভারী সুন্দর দেখতে ভদ্রলোককে। পঞ্চাশ-পঞ্চান্নের কাছাকাছি বয়স। ঘাড় অবধি লটকানো চুল। শশিমাস্টার একেবারে ওদের মুখোমুখি এসে বসলেন। তারপর খুশিতে মুখ উজ্জ্বল করে বললেন, "আরে! বিল্টুবাবু যে?"

বিল্টু শশিমাস্টারের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, "মাস্টারমশাই, আপনি!"

"খড়্গপুরে আই আই টি-তে একবার এসেছিলাম। একজনের সঙ্গে দেখা করতে।"

বিল্টুর দেখাদেখি শুভঙ্করও প্রণাম করল।

মাস্টারমশাই বললেন, "এ ছেলেটি কে?"

"আমার বন্ধু। ওর অনেক দিনের সাধ আমাদের দেশের বাড়িতে আসবার। তা কিছুতেই আসা হয়ে উঠছিল না। ক'দিন ধরে দুর্যোগ ওখানে এমনই ঘনিয়ে উঠেছে যে, বিরক্তি ধরে গেল। তাই পালিয়ে এলাম একটু হাঁফ ছাড়ব বলে।"

"এসেছ বেশ করেছ। তবে কিনা এখানেও বৃষ্টি বেশ ভালই হচ্ছে।"

"এখানে বৃষ্টি হলে আর যাই হোক প্যাচপ্যাচে কাদা তো হচ্ছে না।"

"তা হচ্ছে না। তবে সব সময় যে বৃষ্টি হচ্ছে তা নয়। মাঝেমধ্যে মেঘ দাঁড়াচ্ছে জল হচ্ছে। শরৎকালে যা হয়। তার চেয়ে একটু বেশি।"

অন্য এক ভদ্রলোক একমনে একটি ইংরেজি জার্নাল পড়ছিলেন। এবার পাতা থেকে চোখ তুলে বললেন, "কলকাতার মেঘ সরে যাবে এবার। সাইক্লোন যেটা হওয়ার আশঙ্কা ছিল সেটা চট্টগ্রামের দিকে চলে গেছে।"

মাস্টারমশাই বললেন, "গেলেই ভাল।"

pathagar.net

বিল্টু বলল, "মাসিমা কেমন আছেন ?"

"ভাল।"

"মউ ?"

"ওর কথা আর বোলো না বাবা। দিনকে-দিন কী যে হচ্ছে মেয়েটার, তা ভগবানই জানেন। যত বড় হচ্ছে তত ওর দুরন্তপনা বাড়ছে। বায়নারও তেমনই শেষ নেই। আজ ঘড়ি কিনে দাও, কাল রেডিও কিনে দাও, পরশু ক্যামেরা কিনে দাও। কেনার আর শেষ নেই। না দিলেই অভিমান। কান্নাকাটি, খাওয়া-দাওয়া বন্ধ।"

বিল্টু হেসে বলল, "তা ওই একটিই তো মেয়ে আপনার। যা চায় দিয়েই দিন না।"

"দিতে-দিতে আকাশের চাঁদ চাইছে সে। এই কিছুদিন আগে সাইকেল কিনে দিয়েছি। এখন বলছে মোটরবাইক কিনে দাও।"

আবদারের কথা শুনে শুভঙ্করও হেসে ফেলল। বলল, "কত বছর বয়স আপনার মেয়ের ?"

"তোমাদেরই বয়সী। তেরো-চোদ্দ বছরের।"

শুভঙ্কর বলল, "আমার বয়স পনেরো।"

"ওই হল।"

খড়্গপুর থেকে ছাড়ার পর ট্রেনটা অসম্ভব রকমের স্পিড নিল। এত জোর যে, এক-এক সময় মনে হচ্ছে লাইন থেকেই ছিটকে যাবে বুঝি।

মাস্টারমশাই বিল্টুকে বললেন, "হ্যাঁ। ভাল কথা, শুনলাম নাকি তোমার বাবা বাড়িটাকে বিক্রি করে দিচ্ছেন ?"

"ঠিকই শুনেছেন।"

"বাড়িটা কি গায়ে কামড়াচ্ছে তোমার বাবার ? একে ওইরকম বাড়ি, তায় পিতৃপুরুষের ভিটে। ও কেউ বেচে ?"

"কী বলব বলুন। আমি তো ছেলেমানুষ।"

"তোমার বাবাকে একবার বোলো আমার সঙ্গে দেখা করতে।"

"বলব। আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল। একসঙ্গেই যাওয়া যাবে। আমরা তো অটো নেব। আপনি আমাদের সঙ্গে অটোতেই যাবেন।"

"অটো ? অটো নেবে কেন ?"

"ট্রেন যদি ধলভূমে না দাঁড়ায়, তা হলে ? ঘাটশিলায় নামলে অটো তো করতেই হবে। না হলে এই রাতদুপুরে অতটা পথ যাব কী করে ?"

"ট্রেন ধলভূমেই থামবে। গাড়িতে ওঠার আগেই আমি জেনে নিয়েছি। রেলের কিছু মালপত্তর নামবে। তাই।"

"তবে তো ভালই হল।"

খড়্গপুরের পর ঝাড়গ্রামে থামল ট্রেন। তারপর আবার চলতে শুরু করল। বিল্টু মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে খোশ গল্পে মেতে উঠল।

একজন কফিওয়ালা 'কফি কফি' করে হেঁকে গেল।

বিল্টু কফিওয়ালাকে ডেকে তিন কাপ কফি নিল। গরম কফি। সবে এক চুমুক দিয়েছে, এমন সময় হঠাৎ বখাটে চেহারার পাঁচজন যুবককে একটু বিশেষ

pathagar.net

রকমের সক্রিয় হয়ে উঠতে দেখা গেল। এরা ঝাড়গ্রামে উঠেই গেট আগলে দাঁড়িয়ে ছিল। নিজেদের মধ্যে কী সব আলোচনা করছিল ফিসফিস করে। মাঝেমধ্যে আড়চোখে দেখছিল। ট্রেন একটু জোরে চলতেই প্যাসেঞ্জারদের দিকে এগিয়ে এল ওরা। ওদের গুপ্তস্থান থেকে বেরিয়ে এল ছোরা, পিস্তল ইত্যাদি। চারজনের হাতে রইল চারটে ছোরা। একজনের হাতে পিস্তল।

বসে থাকা যাত্রীদের মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল এবার। ওরা যে কারা তা বুঝতে আর বাকি রইল না কারও।

একজন যুবক এগিয়ে এসে মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়াল। তারপর বেশ লেকচারের ভঙ্গিতেই বলল, "লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলম্যান। আপনারা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝতে পেরেছেন যে আমরা কারা। তবে কিনা আজকে একটু রঙ্ টার্গেট হয়ে গেছে আমাদের। এই সামান্য বৃষ্টিতেই কাপুরুষের দল যে ঘর থেকে বেরোবে না তা আমরা ভাবতেও পারিনি। এখন আমরা যা বলি, তা মন দিয়ে শুনুন। না না, আমরা সাধারণ চোর-ডাকাতদের মতো নই। ওসব চুরি-ছিনতাই আমরা করি না। শিক্ষিত ভদ্রলোকের ছেলে আমরা। আমাদের প্রত্যেকের নামের পেছনে একটা করে ইউনিভার্সিটির ছাপ আছে। কাজেই আমরা ভদ্র সন্তানরা অযথা রক্তপাত ঘটাতে চাই না। আশা করি আপনারাও চাইবেন না সেটা। যার কাছে যা আছে, মানে টাকাকড়ি, সোনাদানা, সব এনে আমাদের সর্দার 'শিকারিবাজ'-এর পায়ের ওপর রেখে যান।"

গভীর আতঙ্কের ছায়া নামল সকলের মুখে।

যুবক বলল, "নিন, একটু তাড়াতাড়ি করুন। কেননা, এই কামরার ভেতর দিয়ে অন্য কামরায় যাওয়া যায়। বলা যায় না হয়তো কোনও দুঃসাহসী ডানপিটে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে আমাদের ওপর। যদিও তা কেউ করে না। কেননা, জীবন নিয়ে জুয়া খেলতে কেউই চায় না আজকাল। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল আমাদের এই পিস্তলটাও আসল কি নকল, তাও কেউ পরখ করে দ্যাখে না। এই তো, আমরা হচ্ছি পাঁচজন আর আপনারা পঞ্চাশজন। আসুন না, ঝাঁপিয়ে পড়ুন আমাদের ওপর।"

ছোরা হাতে আর-এক যুবক হেসে বলল, "ঝাঁপিয়ে পড়বে কী। ভয়ে মুখের চেহারা কেমন হয়েছে দ্যাখ।"

আগের যুবক বলল, "আমাদের হাতে সময় কিন্তু কম। দেরি হয়ে যাচ্ছে খুব। যার কাছে যা কিছু আছে বের করুন। আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, ছুরি-ছিনতাই আমরা করি না। শুধু মানুষের ভালবাসার দান আমরা গ্রহণ করি। তবে জোর করে যদি আমাদের আদায় করতে হয় তা হলে কিন্তু ভয়ানক ব্যাপার ঘটে যাবে। আমি মেয়েদের বলছি, আপনারা আপনাদের গলার হার, কানের দুল, হাতের চুড়ি ইত্যাদি জিনিস যার যা-কিছু আছে তা শিকারিবাজের পায়ের ওপর ফেলে দিন। দেশের স্বার্থে দশের স্বার্থে এই কাজ করুন আপনারা। মনে রাখবেন, আপনাদের এই ভালবাসার দান নিয়ে কয়েকজন বেকার যুবক বাড়ি-গাড়ি করে বিনা মেহনতে বড়লোক হওয়ার যে বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে, তা কিন্তু আগামী দিনের যুবসমাজের আদর্শ হবে। এই গত সোমবার এক বৃদ্ধ কেরানি তাঁর সারা মাসের মাইনের টাকাটা

আমাদের হাতে হাসিমুখে তুলে দিয়েছেন। কন্যাদায়গ্রস্ত এক পিতা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে ফেরার সময় আমরা বলা-মাত্রই সব টাকা আমাদের সর্দারের পায়ের ওপর রেখে গেছেন। তা হলে আপনারাই বা পারবেন না কেন? রেডি, ওয়ান...টু...।"

এক ভদ্রমহিলা ভয়ে-ভয়ে তাঁর হাতের চারগাছা চুড়ি এনে শিকারিবাজের পায়ের ওপর রাখলেন।

শিকারি বলল, "এগুলো সোনার তো? যদি না হয় তোমার সিঁথির সিঁদুর কিন্তু মুছে যাবে। তুমি টাটানগরের সাকচিতে থাকো। তোমাকে আমি চিনি।"

মহিলা কোনওরকমে "হ্যাঁ" বলে চলে গেলেন।

ট্রেনের অন্য যাত্রীরাও তখন পকেট হাতড়ে যার কাছে যা কিছু ছিল তা বের করতে লেগে গেছে।

শুভঙ্কর আর বিল্টু কফি হাতে ভয়ে জড়োসড় হয়ে বসে রইল একপাশে।

আর-এক ভদ্রলোক তাঁর মানিব্যাগটা বের করে যেই না উঠতে যাবেন অমনই শশিমাস্টার তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, "দাঁড়ান। ওটা আমাকে দিন। ওদের যদি ক্ষমতা থাকে তা হলে আমার কাছ থেকে এসে নিয়ে যাক।"

কুতকুতে পায়রা-চোখের ছিপছিপে লম্বা চাপদাড়ির শিকারিবাজ হিংস্র বাঘের মতন গর্জন করে উঠল, "মা-স্টা-র-ম-শা-ই—।"

শশিমাস্টার একদৃষ্টে কিছুক্ষণ শিকারিবাজের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "তুই মধু মাইতির ছেলে রঘু না?"

"চিনতে পেরেছেন দেখছি। তা আপনার হঠাৎ বুড়ো বয়সে এ ভীমরতি কেন? হিন্দি ফিল্মের হিরো হতে চান?"

"যদি ভাল চাস তা হলে এখনও নেমে যা বলছি।"

"মাস্টারমশাই! আপনি তো দিব্যি বিদ্যের জাহাজ হয়ে বসে আছেন। একদিন আমিও আপনার ছাত্র ছিলাম।"

"এখনও তুই নামলি না?"

শিকারি এবার গম্ভীর গলায় বলল, "তুই-তোকারি করছেন কাছে? মধু মাইতির ছেলে এখন শিকারিবাজ। আমার সামনে দাঁড়িয়ে চোখ রাঙিয়ে কথা বলার স্পর্ধা কী করে হল? এর পরিণাম জানেন?"

"জানি। তুই আমায় খুন করবি। এই তো?"

শিকারি হো-হো করে হেসে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল মাস্টারমশাইয়ের ওপর।

এর পরে আর থাকা যায় না। বিল্টু হঠাৎ রুখে দাঁড়িয়ে কাপসুদ্ধ গরম কফিটা ছুঁড়ে মারল শিকারির মুখে।

শিকারি 'মাই গড' বলে লাফিয়ে উঠে দু' হাতে চোখ ঢাকল একবার। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে এক হাতে বিল্টুর কলার ধরে শূন্যে তুলে নিল ওকে।

ওর পেটের মধ্যে গুঁজে রাখা দাদুর ডায়েরিটা ঠক করে পড়ে গেল নীচে।

ছোরা হাতে আর-এক যুবক কুড়িয়ে নিল সেটা।

বিল্টু চিৎকার করে উঠল, "শুভ! কেড়ে নে ওটা।"

pathagar.net

শিকারি তখন বিল্টুকে অনেকটা ওপরে উঠিয়ে নিয়েছে।

বিল্টু অসহায়ভাবে ছটফট করতে লাগল।

শিকারি বলল, "অদ্যই তোর শেষ রজনী। সুবর্ণরেখার বালিগুলো আজকাল সোনার রেণুর অভাবে বড় বেশি কালো হয়ে যাচ্ছে। তোর রক্তে ওই বালির চরটা আমি লাল করে দেব আজ। আমি তোর মৃত্যুদণ্ড দিলাম।" বলেই আবার নামিয়ে দিল ওকে।

আর ঠিক সেই সময়ই শিকারির অন্যমনস্কতার সুযোগে মাস্টারমশাই ওর হাত থেকে কেড়ে নিলেন পিস্তলটা। নিয়ে ওরই দিকে তাগ করে বললেন, "শয়তান! কে কার মৃত্যুদণ্ড দেয় এবার দ্যাখ। আজ তোর দিন কি আমার দিন।"

শিকারি একটুও ভয় না পেয়ে হেসে বলল, "কী ভুলভাল বকছেন মাস্টার। এখন দিন, না রাত? ওটা ফেরত দিন। ও জিনিস আপনার হাতে মানায় না।"

"তোকে বিশ্বাস নেই পাপী। তুই এখন কেউটে সাপ। এ জিনিস তোর হাতে আমি কিছুতেই ফিরিয়ে দেব না।"

"দেবেন না?" বলেই আচমকা মাস্টারের হাত ধরে কবজিতে একটা মোচড় দিতেই পিস্তলটা খসে পড়ল হাত থেকে।

শিকারি সেটা কুড়িয়ে নিয়েই মাস্টারের দিকে তাগ করে বলল, "এটা পাঠশালার দেওয়ালে ঝোলানো বেত নয় যে, ইচ্ছেমতো পেড়ে নিয়ে যাকে খুশি পেটাবেন। পিস্তল চালাতে গেলে ট্রেনিং নিতে হয়। এখন দেখে নিন পিস্তল কীভাবে চালাতে হয়। অ্যা-অ্যা-অ্যাই। এই দেখুন, রেডি? ওয়ান-টু-ডিস্যুম...।"

পিস্তলের গুলিটা মাস্টারমশাইয়ের বুকে লাগল। রক্তে ভেসে গেল বুক। মাস্টারমশাই আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লেন মেঝের ওপর। কেউ তাঁকে ধরবার জন্য এগিয়ে এল না।

শিকারিবাজ এর পর চলন্ত ট্রেনের চেন টেনে মাঝপথেই ট্রেন থামাল। তারপর অসহায় যাত্রীদের মুখের দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে থেকে রক্তচক্ষুতে তাকাল বিল্টুর দিকে।

বিল্টুর বুক টিপটিপ করছে তখন।

শিকারি একবার ওর দিকে এগিয়ে এসে কী ভেবে যেন আবার পিছিয়ে গেল। তারপর সঙ্গীদের ইশারায় নেমে যেতে বলে নিজেও নেমে গেল ঝুপ করে।

বিল্টু শুভঙ্করকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল, "শুভ রে। দাদুর ডায়েরিটা?"

শুভঙ্করের চোখেও তখন জল এসে গেছে। এই ডায়েরির সূত্র ধরে কী কাণ্ড করে দুর্যোগের মধ্যে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে, বাড়িতে মিথ্যে কথা বলে, গুরুজনদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে এইভাবে আসা। আর সেই ডায়েরিটাই পড়ে গেল এমন দুর্বৃত্তদের হাতে, যারা কিনা খেলার ছলে সত্যিকারের একজন আদর্শবাদী মানুষের জীবনটাকেই নষ্ট করে দিল।

pathagar.net

খবর পেয়ে জি আর পি-র লোকেরা এল। জিজ্ঞাসাবাদের পর শশিমাস্টারের ডেডবডি নামানো হল চাকুলিয়ায়।

॥ ৩ ॥

এর পর ট্রেন ধলভূমগড়েই থামল। মাত্র এক মিনিট। তাই সই। নেমে পড়ল দু'জনেই। দুর্যোগ তখন কেটে গেছে।

বিল্টু বলল, "এই দুঃসংবাদটা যে কী করে দেব মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে, তা ভেবে পাচ্ছি না।"

"তোদের বাড়ি থেকে মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি কতদূর ?"

"বেশি দূরে নয়।"

"তা হলে দিতেই হবে। এ-খবর তো চেপে রাখা যায় না !"

"আমি ভাবছি মউটার কথা। ওর কী হবে বল তো ? কী সুন্দর ফুলের মতো দেখতে মেয়েটাকে। মাস্টারমশাই তো চলে গেলেন। শিকারিবাজ যদি সত্যিই এবার ওর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তা হলে ?"

"এটা অবশ্য চিন্তার কথা। যেভাবে ওরা শাসিয়ে গেল তাতে রীতিমত ভয়ের ব্যাপার বইকী। বিশেষ করে সাইকেল নিয়ে একা-একা ঘোরে যখন মেয়েটা, তখন যে-কোনও মুহূর্তে ওদের খপ্পরে পড়ে যেতে পারে।"

"দাদুর ডায়েরিটাও হাতছাড়া হল। এখন ভাবছি কাল সকালে এলেই হত। খুব বেশি লাফিয়েছিলুম কিনা, গুরুজনদের মিথ্যে কথা বলেছিলুম। তারই ফল হাতেনাতে পেলাম।"

শুভঙ্কর বলল, "দ্যাখ বিল্টু ওই ডায়েরিটা যে আমাদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তা ছাড়া ওটা তোর দাদুর স্মৃতি। আমরা যখন জেনে গেছি সোনার গণপতি কোথায় আছেন, তখন আর ভয় কী ? মূর্তি উদ্ধার আমরা করবই। তবে ডায়েরিটা আর কখনও ফেরত পাব না এইটাই যা দুঃখ। যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। ও নিয়ে তুই মনখারাপ করিসনি। তুই যেভাবে শিকারির মুখে গরম কফিটা ছুঁড়ে দিয়েছিলি বা তারপরে ও যে কথা বলেছিল তাতে সত্যি-সত্যিই যে ও তোকে তুলে নিয়ে যায়নি বা তোর কোনও ক্ষতি করেনি, এইটাই আমাদের সৌভাগ্য।"

স্টেশন থেকে নেমে শালবনের ভেতর দিয়ে হাঁটা-পথে ওরা বাড়ির দিকে চলল। কোথা থেকে যেন বিচ্ছিরি একটা ডাক ভেসে আসছে।

শুভঙ্কর বলল, "ওটা কিসের ডাক রে বিল্টু ?"

"ও তক্ষকের ডাক।"

তক্ষক কী তা জানে না শুভঙ্কর। তাই নামটা শোনামাত্রই এক অজানা আতঙ্কে কেঁপে উঠল ওর বুক। একটা জলঢোঁড়া সাপ পায়ের পাশ দিয়ে হিলহিল করে বেরিয়ে গেল। শুভঙ্কর লাফিয়ে উঠল ভয়ে।

বিল্টু বলল, "কী আশ্চর্য ! টর্চটা আমার ব্যাগেই রয়েছে অথচ আমরা অন্ধকারে পথ চলছি এতক্ষণ।" বলে টর্চ বের করে এ-পথ সে-পথ ঘুরে ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে এক প্রাসাদোপম বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বিল্টু

বলল, "এই হচ্ছে আমাদের বাড়ি।"

শুভঙ্কর অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল বাড়িটার দিকে।

এই বাড়ির সামনে বাগানের অংশে কয়েকটি টালির চালের বাড়ি। বিল্টু সেদিকে তাকিয়ে হাঁক দিল, "তিন্নি।"

বারো-তেরো বছরের একটি ফ্রক-পরা ফুটফুটে কিশোরী বেণী দুলিয়ে ছুটে এল, "কে! আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন।"

ওরা ঘরের দাওয়ার কাছে এগিয়ে গেল। মিটমিট করে হ্যারিকেনের আলো জ্বলছিল ঘরের ভেতর। বিল্টুর গলা পেয়ে আলো হাতে তিন্নির বাবা পুণ্ডরীককাকাও বেরিয়ে এলেন। এলেন কাকিমাও।

পুণ্ডরীককাকা বললেন, "খবর না দিয়ে হঠাৎ? তা কলকাতায় বৃষ্টি কেমন চলছে? এখানে তো দুর্যোগ খুব।"

বিল্টু বলল, "ওখানকার অবস্থা আরও খারাপ।"

"রেডিওর খবরে তাই শুনছিলাম," বলে শুভঙ্করের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ও ছেলেটি কে?"

"আমার বন্ধু। আমাদের দেশ দেখতে এসেছে।"

কাকিমা বললেন, " বাইরে দাঁড়িয়ে কেন বাবা? ভেতরে এসো। একটা চিঠি দিয়ে যদি আসতে তা হলে রেঁধেও রাখতে পারতাম।"

"কোনও ঠিক ছিল না। হঠাৎ ঠিক করে চলে এসেছি আমরা।"

"বেশ করেছ। তা বাবা, ঘরদোর সবই তো বেচে দেবে তোমরা। এমন বাড়ি দেখলে মায়া হয়। যে ব্যবসায়ী কিনছে সে কি আর এ-বাড়ি রাখবে? ভেঙে মাঠ করে দেবে।"

বিল্টু আর শুভঙ্কর পা ধুয়ে ঘরে ঢুকল।

তিন্নি হাসিমুখে পরম সমাদরে ওদের ঘরে নিয়ে বসাল।

পুণ্ডরীককাকা বললেন, "আর সব খবর ভাল তো? মা-বাবা, ভাইদের শরীর ভাল আছে? জেঠুর খবর ভাল?"

বিল্টু বলল, "সব খবরই ভাল। কিন্তু একটা খবর খুবই খারাপ আছে কাকাবাবু। ট্রেনে আসতে-আসতে এমন এক বিচ্ছিরি কাণ্ড ঘটে গেল যে, তা বলবার নয়।"

কাকাবাবু-কাকিমা দু'জনেই উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, "কী হয়েছে বাবা?"

"আমাদের চোখের সামনে শশিমাস্টার খুন হলেন।"

"খুন!" শিউরে উঠলেন সকলে।

তিন্নি দারুণ ভয় পেয়ে বলল, "কোথায়?"

বিল্টু তখন আগাগোড়া সব কথা খুলে বলল।

পুণ্ডরীককাকা বললেন, "ইস্‌স রে। সংসারটা ভেসে গেল একেবারে। অমন মানুষ কালেভদ্রে দেখা যায় বাবা। ওইরকম মানুষের এই পরিণাম?"

বিল্টু বলল, "তাই তো হয় কাকাবাবু। এইসব মানুষ তো পরহিতেই জীবন দান করেন।"

পুণ্ডরীককাকা বললেন, "ঠিক আছে। যা ব্যবস্থা করবার এক্ষুনি আমি সব করছি।"

pathagar.net

বিল্টু বলল, "আমি কি যাব কাকাবাবু আপনার সঙ্গে ?"

"যাবে ? এসো।"

বিল্টু বলল, "তুই একটু বোস শুভঙ্কর। তিন্নির সঙ্গে গল্প কর। তিন্নি খুব ভাল চা করতে পারে। ওর হাতের চা খা। আমি কাকাবাবুর সঙ্গে একটু ও-বাড়ি থেকে আসি।"

কাকিমা বললেন, "তোমরা ঘুরে এসো। তারপর তিন্নিকে নিয়ে আমিও একবার যাব ওদের বাড়ি।"

ধলভূমগড়ের মাটি কাঁপিয়ে একটা মালগাড়ি তখন ঝড়ের বেগে হাওড়ার দিকে ছুটে চলেছে।

বিল্টু চলে গেলে তিন্নি বলল, "আপনি বসুন দাদা, আমি আপনার জন্য চা করে আনি। কী খবর যে শোনালেন না আপনারা ? আজই বিকেলবেলা শিবতলাতে দেখা হল মউয়ের সঙ্গে। কে জানত তখন যে, এত তাড়াতাড়ি মেয়েটি পিতৃহীন হবে।"

শুভঙ্কর বলল, "সবই কপালের লেখা।'

আকাশের ঈশান কোণে তখন বিদ্যুতের ঝিলিক মারল। সেইসঙ্গে মেঘের গর্জনও শোনা গেল, গুড়-গুড়-গুড়-গুড়ুম।

শুভঙ্কর একা বসে রইল ঘরের ভেতর। ডায়েরিটা যদি না খোয়া যেত আর মাস্টারমশাই যদি মারা না যেতেন, তা হলে কী আনন্দ যে হত! শুভঙ্কর বসে-বসে ঘরের চারদিক লক্ষ করতে লাগল। গরিবের সংসার হলে কী হয়, বেশ পরিপাটি করে সাজানো ঘর। দেওয়ালে তারাপীঠ, তারকনাথ ও কালীঘাটের ছবি। তিন্নির ছোটবেলাকার ছবিও আছে কয়েকটি। কী সুন্দর দেখতে তিন্নিকে! মউকে নাকি আরও দেখতে ভাল। ফরসা রং আর সুন্দর মুখের মেয়েদের খুব ভাল লাগে শুভঙ্করের। এইরকম একটি টুকটুকে ফুটফুটে বোন যদি ওর থাকত, তা হলে কী ভালই না হত। ভাইফোঁটার সময় এইরকম কত মেয়ে তো তাদের ভাইদের ফোঁটা দেয়। অথচ শুভর কপালে ফোঁটা দিয়ে শুভ কামনা করবার কেউ নেই। এ দুঃখ কি কম ?

এ-বাড়ির বাইরের দাওয়ায় একটা কোণ ঘিরে রান্নাবান্নার ব্যবস্থা। কাকিমা সেইখানে রান্নার ব্যবস্থা করছেন। একগলা ঘোমটা দেওয়া একজন বউ এসে চাপা গলায় কী সব জিজ্ঞেস করছে কাকিমাকে। হয়তো মাস্টারমশাইয়ের খুন হওয়ার ব্যাপারটাই জানতে চাইছে বিশদভাবে। কাকিমাও ফিসফিস করে বলে চলেছেন।

শুভ যখন ঘরে বসে এইসব অনুভব করছে, তেমন সময় তিন্নি হাসিমুখে এক ডিশ হালুয়া ও এক কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। তারপর হাট থেকে কেনা বাজে কাঠের একটা পালিশ না-করা টেবিলের ওপর হালুয়ার প্লেট ও চায়ের কাপটা বসিয়ে রেখে বলল, "নিন। খেয়ে নিন।"

শুভঙ্করের বেজায় খিদে পেয়ে গিয়েছিল তখন। তাই চটপট হালুয়া খেয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তারপর চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, "এ চা তুমি তৈরি করেছ ?"

সলজ্জ হেসে ঘাড় নাড়ল তিন্নি, "হ্যাঁ।"

pathagar.net

"কী মিষ্টি। খুব ভাল হয়েছে। এরকম চা আমি কখনও খাইনি।"

"মিথ্যে কথা। হালুয়া খেয়ে চা খেলে চা তো মিষ্টি লাগেই না, উপরন্তু স্বাদও পাওয়া যায় না চায়ের।"

শুভঙ্কর বলল, "ঠিক বলেছ তুমি। তবে কিনা ধলভূমগড়ের তিন্নির হাতে তৈরি চা খেলে তা থেকে সব সময় সবরকমের আস্বাদ পাওয়া যায়।"

তিন্নি এবার লজ্জা পেয়ে ঘরের বাইরে চলে গেল।

কাকিমা বললেন, "কী রে! চলে এলি যে? ছেলেটা একা বসে রইল, যা গল্প কর।"

শুভঙ্কর ডাকল, "তিন্নি!"

"বলুন।"

কাকিমা বললেন, "যা, ভেতরে যা।"

তিন্নি তবু যায় না

কাকিমা প্রতিবেশিনী বউটিকে বললেন, "বিল্টুর বন্ধু। ধলভূম বেড়াতে এসেছে। একা আছে বেচারি। একটু গল্পসল্প করতে তো হয়।"

বউটিও বলল, "যা না, মা।"

কাকিমা বললেন, "সমবয়সী ছেলেদের দেখলে ওর কী যে লজ্জা, তা ভগবান জানেন।"

শুভঙ্কর এবার নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "ও, এই কথা? তুমি দুষ্টু, আমাকে দেখে লজ্জা পাচ্ছ বুঝি? এসো, ঘরে এসো। না হলে আমি বাইরের দাওয়ায় গিয়ে বসব।"

তিন্নি বলল, "আচ্ছা আচ্ছা, যাচ্ছি।"

"তোমার কথা বিল্টুর মুখে আমি অনেক শুনেছি। তোমার মতো মেয়ে হয় না। তুমি কি জানো, আমার কোনও বোন নেই বলে আমার কত দুঃখ। তাই তোমার মতো মেয়ে দেখলে কেবলই আমার মনে হয়, এদের ভেতর থেকে কেউ যদি আমার বোন হত তা হলে ভাইফোঁটার দিন কপালের মাঝখানে ফোঁটা একটা পেতাম।"

তিন্নি এবার হাসি-হাসি মুখে বলল, "বেশ তো। এবার ভাইফোঁটার দিন আসবেন। আমিই আপনাকে ফোঁটা দেব।"

"বয়ে গেছে। তোমার বাড়িতে এলে তুমি আমার সঙ্গে না বলে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে আর আমি আসব অতদূর থেকে তোমার কাছে ফোঁটা নিতে? কে রে আমার?"

তিন্নি এবার কাজল-কালো দুটি চোখ মেলে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা বাবা, আচ্ছা। যাচ্ছি।"

ওরা দু'জনেই ঘরে এল।

তক্তপোশের ওপরে পুরু করে পাতা বিছানার এক প্রান্তে শুভঙ্কর বসল। আর-এক প্রান্তে বেশ ভাল করে ছড়িয়ে বসল তিন্নি। তারপর সাপের মতো লম্বা বেণীটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে-করতে বলল, "আপনার তো বোন নেই। ভাই নেই আর?"

"না। আমি আমার বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান।"

pathagar.net

"আমিও। আপনার নাম ?"

"আমার নাম শুভঙ্কর দত্ত। তোমার ?"

"আমার নাম তো তিন্নি।"

"সে তো আমাদের আদরের নাম। ভাল নাম ?"

"নীলাঞ্জনা।"

"বাঃ। কী অপূর্ব নাম। চেহারার সঙ্গে নামের একরম মিল দেখা যায় না বড় একটা। কোন ক্লাসে পড়ো তুমি ?"

"এইট-এ উঠেছি এবার। আপনি ?"

"আমি সামনের বছর স্কুল ফাইনাল দেব।"

"আমার বন্ধু মউও আমার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ে। ও অবশ্য গত বছর ফেল করেছিল। না হলে এ-বছর নাইনে পড়ত ও।"

"সে কী! মাস্টারমশাইয়ের মেয়ে ফেল করেছিল ?"

"করবে না-ই বা কেন ? ভীষণ চঞ্চল প্রকৃতির মেয়ে যে। সব সময় টো-টো করে ঘুরবে। কোথায় গাছে উঠবে, পাহাড়ে চড়বে, সাঁতার কাটবে, লাফাবে। সাইকেল পেলে তো কথা নেই, চষে বেড়াবে চারদিক। পড়াশোনায় মন নেই একদম। করবে না ফেল ?"

"সাইকেল তো নতুন হয়েছে।"

"ও বাবা। তার আগে যখন যার সাইকেল পেয়েছে তারটা নিয়েই উধাও হয়েছে। অথচ কী সুন্দর দেখতে মেয়েটাকে। এ-গ্রামে কেন, আশপাশের গ্রামেও ওরকম মেয়ে নেই।"

"বলো কী ?"

"না দেখলে অনুমান করতে পারবেন না।"

"আমার এই বোনটির থেকেও কি ওকে আরও বেশি সুন্দর দেখতে ?"

"ওর কাছে আমি একটা প্যাঁচা।"

আকাশে আবার মেঘ ডাকল। বিদ্যুৎ চমকাল। ঠাণ্ডা হাওয়া বইল। দূরে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে বোধ হয়।

বউটিও চলে গেল এক সময়।

কাকিমা বললেন, "আজকের দুর্যোগটা যেন ধলভূমগড়ের জন্যই এসেছিল। এ আকাশ ছেড়েও ছাড়ে না। বিল্টুটাও আবার বেরোল ওর সঙ্গে। কখন ফিরবে কে জানে!"

তিন্নি বলল, "আমি একবার যাব মা মউদের বাড়ি ?"

"না, থাক। বাড়িসুদ্ধ সবাই গেলে কী করে হবে ? চারদিকে খবরাখবর করতেই দেরি হচ্ছে হয়তো। বিল্টু আসুক। ততক্ষণে তুই এক কাজ কর দিকিনি। এখানে একটা আসন পেতে দে। ছেলেটাকে খাইয়ে দিই।"

শুভঙ্কর বলল, "বিল্টু আসুক না কাকিমা ?"

"ও এখন কখন আসবে তার কি ঠিক আছে ? রাতও হল অনেক। আকাশও ভেঙে আসছে। যা হোক দুটো খেয়ে নাও।"

অগত্যা বসতেই হল খেতে।

তিন্নি আসন পেতে জায়গা করে দিল। শুভঙ্কর আলুভাজা আর ডিমের

pathagar.net

ঝোল দিয়ে গরম ভাত খেল বেশ তৃপ্তি করে।

কাকিমা তিন্নিকে বললেন, "তুই ওকে নিয়ে ও-বাড়িতে চলে যা। ওপরের ঘরের দরজা খুলে আলো জ্বেলে মশারিটা খাটিয়ে দিয়ে আয়।"

তিন্নি বলল, "বাবা বোধ হয় টর্চটা নিয়ে গেছে। যা অন্ধকার। তুমি তা হলে বাতি আর দেশলাইটা দাও।"

কাকিমা বাতি আর দেশলাই দিলেন। তিন্নি দেশলাই, বাতি আর হুকে টাঙানো চাবিটা নিয়ে শুভঙ্করকে ডাকল, "আসুন।"

শুভঙ্করও টর্চ আনেনি। আসলে এখানে আসার জন্য কোনও প্রস্তুতিই তো ছিল না আগে থেকে। বিল্টুর টর্চ বিল্টু নিয়ে গেছে। তাই অন্ধকারেই পা টিপে-টিপে তিন্নির সঙ্গ নিল শুভঙ্কর।

ঘরের বাইরে আসতেই বড়-বড় দু-একটা বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে পড়ল ওদের।

তিন্নি বলল, "ছুট্টে আসুন।" তারপর বলল, "না থাক। ছোটবার দরকার নেই। এখানে তো পাথুরে মাটি। কোথায় আবার হোঁচট খাবেন শেষকালে। ধীরে-ধীরেই আসুন।"

মাত্র কয়েক হাতের ব্যবধান। তাই এ-বাড়ির চৌহদ্দি পেরিয়ে ও-বাড়িতে পৌঁছতে দেরি হল না। বেশ জোরে হাওয়া বইছে এখন।

অন্ধকারেই সদর দরজার তালা খুলে নীচের দালানে ঢুকল ওরা।

সে কী দারুণ অন্ধকার!

সেই অন্ধকারে বাড়ির আসল চেহারাটা যে কী তা বোঝা গেল না। এই বিশাল অট্টালিকার জঠরে কী করে যে একা থাকবে তা ভেবে পেল না শুভঙ্কর। ভয়ে ওর বুক টিপটিপ করতে লাগল। অথচ তিন্নির কাছে শহুরে ছেলে হয়ে ওর মনের দুর্বলতাটা প্রকাশও করা যায় না। শুভঙ্কর বলল, "এই এত বড় বাড়ি এইভাবে ফাঁকা পড়ে আছে?"

তিন্নি বলল, "হ্যাঁ।"

"চুরি-ডাকাতি হয় না?"

"একমাত্র খাট আলমারিগুলো ছাড়া নিয়ে যাওয়ার মতো কিছুই তো নেই এ-বাড়িতে। চোর এসে পাবেটা কী?"

"কিচ্ছু নেই?"

"না। যা ছিল ডাকাতি হয়ে নষ্ট হয়েছে। আর বাদ-বাকিগুলো বিল্টুদারা নিয়ে গেছে কলকাতায়।"

কথা বলতে-বলতেই দালানের সিঁড়ির মুখে দেশলাই জ্বেলে বড় মোমবাতিটা ধরাল তিন্নি। সেই বাতির আলোয় এই গাঢ় অন্ধকারের তো কিছুই হল না বরং সেই অন্ধকার ক্ষণমুক্ত হয়ে আরও গভীর আতঙ্কময় হয়ে উঠল।

বাতিটা হাতে নিয়ে ধীর পদক্ষেপে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল তিন্নি। আর ওর পিছুপিছু ভয়ে-ভয়ে শুভঙ্কর। বাতির আলোয় তিন্নির ফরসা মুখখানা কী অপূর্ব লাগছে।

সিঁড়ির ওপরেও প্রশস্ত দালান। দালানের ওপর দালান আর কি। সাবেক কালের বাড়ি তো। মুখোমুখি ঘর। কী বড়-বড় দরজা। মোটা রডের জানলা। তিন্নি বাঁ দিকের একটি বড় ঘরের তালা খুলে শুভঙ্করকে নিয়ে

pathagar.net

ভেতরে ঢুকল।

ঘরে ঢুকতেই নজরে পড়ল দেওয়ালের ওপর এক বীরপুরুষের মস্ত তৈলচিত্র।

শুভঙ্কর বলল, "ও-ছবিটা কার?"

তিন্নি বলল, "ঠাকুরদাদার।"

ঠাকুরদাদা অর্থাৎ বরদাপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর কী দীপ্ত চেহারা। দেখলে ভয় লাগে। আবার ভক্তিও হয়। সেই ব্যক্তিত্বের কাছে মাথা যেন আপনা থেকেই নুয়ে আসে।

তিন্নি ঘরে ঢুকে চিমনি লণ্ঠনটা জ্বালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু তেল তো নেই। অগত্যা বড় বাতিটাই বেশ কায়দা করে বসিয়ে রাখল বাতিদানের ওপর। বাতির আলোয় ঘরের ভেতরটা মোটামুটি উজ্জ্বল হল।

শুভঙ্কর বলল, "এখানে ইলেকট্রিক নেই?"

"হ্যাঁ আছে। তবে এ-বাড়িতে নেই। আমাদের ঘরেও নেই। আর সকলের ঘরে আছে। দুর্যোগের জন্য আলোর তার ছিঁড়ে গেছে হয়তো কোথাও। তাই আলো জ্বলছে না।"

শুভঙ্করকে একটা চেয়ারে বসিয়ে তিন্নি বিছানাটা ঝেড়েঝুড়ে দিল। বিছানার তলা থেকে একটা মস্ত বেডকভার বের করে বিছিয়ে দিল বেশ পরিপাটি করে। কী চটপটে মেয়ে। যেন পাকা গিন্নি একটি। তারপর খাটের সঙ্গে গুছিয়ে রাখা মশারিটা খুলে বেশ ভাল করে গুঁজে দিল চারপাশ।

বাইরে তখন দমকা হাওয়ার সঙ্গে প্রবল বর্ষণ শুরু হয়েছে। সেইসঙ্গে বজ্র-বিদ্যুতের কড়কড়ানি। মহাপ্রলয়ের আর দেরি নেই বুঝি।

দরজাটা খোলা থাকায় ঘরের ভেতর বাতিটা ঝোড়ো হাওয়ায় শিরশির করে কাঁপছে।

তিন্নি বলল, "নিন, শুয়ে পড়ুন। আমি নীচে যাই। বিল্টুদা এলে পাঠিয়ে দেব।"

শুভঙ্করের মুখ ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল তখন। অতিকষ্টে সে বলল, "আচ্ছা।"

তিন্নি বলল, "দরজার খিল দেবেন না যেন, এমনই ভেজিয়ে রাখুন। না হলে বিল্টুদা এসে ডাকাডাকি করলে কাঁচা ঘুম ভেঙে উঠতে হবে আবার। আপনাদের খাবার জলটা আমি বিল্টুদাকে দিয়েই পাঠিয়ে দেব, কেমন?"

শুভঙ্কর বলল, "তা তো দেবে। কিন্তু এত বৃষ্টিতে তুমি যাবে কী করে? বরং আমার সঙ্গে বসে একটু গল্প করো।"

"বা রে, রাত হয়নি বুঝি? তা ছাড়া আমার কি ঘরের কাজ নেই?"

এইবার শুভঙ্করের মুখ দিয়ে আসল কথাটা ফুটে বেরোল, "এতবড় একটা পোড়ো বাড়ি। আমার একা থাকতে খুব ভয় করবে। সেইজন্যই বলছিলাম।"

"ভয় করবে! ভয় করবে কেন? তিন্নি বলে একটা ডাক দিলেই তো ছুটে আসব আমি।"

"আসলে আমার খুব ভূতের ভয়।"

pathagar.net

তিন্নি হেসে বলল, "বোকা ছেলে। ভূত বলে কিছু আছে নাকি ? বিল্টুদা যখন আসে, বিল্টুদা তো একাই শোয়। আগে আমিও শুতাম মাঝে-মাঝে।"

"আমার তবুও ভয় করছে তিন্নি।"

"চুপচাপ শুয়ে পড়ুন তো। চোখ মেলেই দেখবেন সকাল হয়ে গেছে। অথচ ভূত-প্রেত কিছুই আসেনি।" এই বলে ছোট্ট একটা মোমবাতি ধরিয়ে বাইরের হাওয়া থেকে সেটার শিখাটাকে বাঁচাবার জন্য হাতের চেটো দিয়ে সেটাকে আড়াল করে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল তিন্নি।

আর শুভঙ্কর ? হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় ঘরের বাতিটা নিভে যেতেই "মা গো" বলে চেঁচিয়ে উঠে ছুটে এল তিন্নির কাছে। ভয়ে যেন নীল হয়ে গেছে সে। সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে। কী ভয় ! কী ভয় ! কী ভয় !

তিন্নির হাত থেকে তখন ছিটকে পড়ে নিভে গেছে বাতিটা। এই আকস্মিক ব্যাপারে সেও ভয় পেয়ে গেছে খুব। বলল, "কী হল ? অমন চিৎকার করে পালিয়ে এলেন যে ?"

শুভঙ্কর তখন ভয়ের চোটে প্রায় কেঁদে ফেলেছে। বলল, "তুমি আমাকে সঙ্গে করে তোমার মায়ের কাছে নিয়ে চলো তিন্নি। এই প্রেতপুরীতে আমাকে একা রেখে কখনও যেও না ।আমার খুব ভয় করছে। একা আমি এই বাড়িতে কিছুতেই থাকতে পারব না। বিল্টু না-আসা পর্যন্ত আমি তোমাদের ঘরেই থাকব।"

তিন্নি বলল, "আসুন।" বলে খুব সাবধানে অন্ধকারে পা টিপে টিপে নীচের দিকে নামতে লাগল ওরা।

আর শুভঙ্কর ভাবতে লাগল, এই তিন্নি কত ভাল। বাড়ি ফিরেই একবার সে মাকে নিয়ে চলে আসবে তিন্নির কাছে। আর ওর জন্য এমন সব ভাল-ভাল জিনিস নিয়ে আসবে, যা দেখলে অবাক হয়ে যাবে তিন্নি।

॥ ৪ ॥

খুব ভোরে তিন্নির ডাকে ঘুম ভাঙল শুভঙ্করের। ঘুম ভেঙেই দরজার দিকে তাকিয়ে দেখল, শাঁখ-সাদা মুখ নিয়ে মিষ্টি হাসির তিন্নি দাঁড়িয়ে আছে। বলল, "উঃ। কী ঘুম ঘুমোতে পারেন আপনি।"

শুভঙ্কর লজ্জিত গলায় বলল, "আসলে কাল অতখানি ট্রেন জার্নির পর শুতে একটু রাত হয়েছে তো। তার ওপর বাদলা। তাই খুব ঘুমিয়ে পড়েছি। বিল্টু কোথায় ?"

"বিল্টুদা এখনও ফেরেনি। কাল রাতেই ও বাবার সঙ্গে টেম্পো নিয়ে চাকুলিয়ায় চলে গেছে মাস্টারমশাইকে আনতে।"

"কখন আসবে ?"

"তা তো জানি না।"

শুভঙ্কর বলল, "ভাগ্যে আমি তোমার সঙ্গে চলে এসেছিলুম কাল, না হলে সারারাত ওই দমবন্ধ করা বাড়িটার ভেতর পড়ে থাকতে হত আমাকে।"

তিন্নি হেসে বলল, "এমন ভিতু ছেলে আমি কখনও দেখিনি।"

pathagar.net

শুভঙ্কর ভেংচি কাটল তিন্নিকে।

তিন্নি বলল, "যাক। আরামে ঘুমিয়েছিলেন তো?"

"খুব ঘুমিয়েছি।"

সত্যিই ঘুমিয়েছে শুভঙ্কর। পুণ্ডরীককাকার ঘরে তক্তপোশের বিছানায় গায়ে চাদর চাপা দিয়ে শান্তির নিদ্রা গেছে। সে এমনই ঘুম যে, এক ঘুমেই সকাল।

তিন্নি বলল, "চলুন। শহরের ছেলে, গ্রাম তো দেখেননি কখনও, আমাদের গ্রামের রূপ আপনাকে দেখিয়ে আনি।"

শুভঙ্কর তো এইসবই চায়। তাই এক লাফে তক্তপোশ থেকে নেমেই বলল, "চলো। ভোরে ওঠা কখনও হয় না, তার ওপর ধলভূমগড়ের এই রাঙামাটির ভোর। চলো, ঘুরে আসি।"

তিন্নি একটা নিম-দাঁতন এগিয়ে দিল ওর দিকে। দিয়ে বলল, "এটা চিবোতে চিবোতে চলুন। পদ্মদিঘির জলে মুখ ধুয়ে শাল-মহুয়ার বন দেখিয়ে আনি আপনাকে।"

শুভঙ্কর চটি পায়ে দিচ্ছিল।

তিন্নি বলল, "থাক। দরকার নেই। খালি পায়েই চলুন। একটু মাটির ছোঁয়া শরীরে লাগানো ভাল।"

"তোমার মা কোথায় তিন্নি?"

"মা কাল রাতে মউদের বাড়িতে গেছেন।"

"তুমি তা হলে সারারাত একা ছিলে?"

"ছিলাম। আমার তো অত ভূতের ভয় নেই যে, একা থাকতে ভয় পাব। তা ছাড়া যা ভিতু ছেলে আপনি, রাত-দুপুরে ভূত এসে যদি আপনার ঘাড় মটকাত, তা হলে কে সামলাত আপনাকে?"

শুভঙ্কর লাজুক মুখে অভিমান করে বলল, "তুমি বারবার ভিতু-ভিতু কোরো না তিন্নি। আমার কিন্তু রাগ হয়ে যাচ্ছে খুব। আমি শহরের ছেলে। কখনও গ্রামে আসিনি। তার ওপর বর্ষার রাত। অন্ধকার। ওই মস্ত বাড়ি। ভয় করে না বুঝি? ভূত না হোক, চোর-ডাকাতই যদি আসত কাল?"

তিন্নি বলল, "আচ্ছা বাবা, আচ্ছা। আর বলব না। আমি আপনাকে রাগাচ্ছিলাম।"

দরজায় শিকল তুলে দাঁত মাজতে-মাজতে বাইরে এল ওরা।

কাল রাতে ট্রেন থেকে নেমে অন্ধকারে আসার দরুন এখানকার পরিবেশ সম্বন্ধে কোনও ধারণাই করতে পারেনি শুভঙ্কর। এমনকী বিল্টুদের যে বাড়িটাকে দেখে ওর ভূতের বাড়ি বলে মনে হয়েছিল, সেই বাড়িটাকে দিনের আলোয় দেখে এখন আর আতঙ্কময় বলে মনেই হল না। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। কী ছেলেমানুষিই না করে ফেলেছিল কাল। তিন্নি নামের এই পুঁচকে মেয়েটির কাছে ওর দুর্বলতা ধরা পড়ে গেল। অথচ আজ? আজ এই ভোরের আবছায়ায় এই রঙিন প্রকৃতি যেন রূপে-রসে-গন্ধে ভরিয়ে তোলার জন্য দু' হাত বাড়িয়ে ডাকছে ওকে।

ওরা যখন ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোল, তখন [illegible] আবছায়া একটু-একটু

করে স্পষ্ট হচ্ছে। চারদিকে কেমন এক স্নিগ্ধ সুন্দর ভাব ফুটে উঠছে। আকাশের মেঘ সরে গেছে কাল রাতেই। কালো মেঘের বদলে কী শুভ্র উজ্জ্বল মেঘ দলে-দলে চলেছে উত্তরে। ধলভূমগড়ের ভিজে লাল মাটি কাছিমের পিঠের মতো ফুলে উঠেছে। কোথাও কোনও কাদা নেই। পাথর, মাটি ও কাঁকরে ভরা পথ। ঘরের উঠোন থেকেই তো প্রায় শালবন শুরু। গাছগাছালির পাতা থেকে বাতাসের আন্দোলনে টুপটাপ ঝরে পড়ছে জমে-থাকা বৃষ্টির জল। আকাশ পরিষ্কার হলেও বাতাসের বেগ খুব। নিম্নাঞ্চলগুলি জলে ভরে আছে। যেখানটা একটু ঢালু, সেখান দিয়ে কলকল করে ঝরনার মতো জলের স্রোত গড়িয়ে চলেছে। গর্তের জলে গা ডুবিয়ে ব্যাঙ ডাকছে গ্যাঁ-গোঁ করে। ব্যাঙ ডাকলে নাকি বৃষ্টি হয়। তবে আকাশের দিকে তাকালে মনে হয় আর বৃষ্টি হবে না। শাল-মহুয়ার গাছগুলো বড় বেশি সজীব ও সবুজ বলে মনে হচ্ছে। কচি-কচি শালপাতাগুলি দেখলে চোখ দুটো ভরে ওঠে। ভিজে মাটি আর গাছপালার ভেতর থেকে কী সুন্দর যে একটা গন্ধ ফুটে বেরোচ্ছে তা বলবার নয়। তার ওপর পাখিদের কলতানে যেন কান পাতা যাচ্ছে না।

ওরা পথের ধারে একজনের কুয়ো থেকে দড়ি-বালতিতে করে জল তুলে মুখ ধুয়ে নিল। জলটা মুখে দিয়েই তৃপ্তিতে ভরে উঠল শুভঙ্কর। কী অপূর্ব স্বাদ জলের।

শুভঙ্কর তিন্নিকে বলল, "তুমি যে আমাকে বললে পদ্মদিঘিতে নিয়ে যাবে, কই গেলে না তো?"

তিন্নি বলল, "মত পরিবর্তন করলাম। পদ্মদিঘি যেতে গেলে অনেকদূর যেতে হবে। আজ আর তা ভাল লাগছে না। মনটা মউয়ের জন্য কেমন-কেমন করছে। তাই ভাবছি, ওটা বরং কাল যাব। এখন আপনাকে কাছাকাছি এমন এক জায়গায় নিয়ে যাব যেখানে গেলে মন আপনার সত্যিই খুশিতে ভরে উঠবে।"

"আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে তুমি?"

"নরসিংগড়।"

"সে কোথায়?"

"কাছাকাছি। এখান থেকে খুব জোর এক-দেড় কিলোমিটার হবে। ওখানে একটা রাজবাড়ি আছে। আপনাকে দেখাব।"

"রাজারা আছেন?"

"এখন কি রাজা-জমিদার বলে কিছু আছে? দেখবেন, ভগ্ন প্রাসাদে চামচিকে আর বাদুড়ের বাসা।"

ওরা পায়ে-পায়ে রুপোলি ফিতের মতো পিচ রাস্তার ওপর উঠল।

তিন্নি বলল, "এটা হল বম্বে রোড। ঘাটশিলা, গালুডি, টাটানগর হয়ে চলে গেছে সুদূর বোম্বাই।"

শুভঙ্কর বলল, "কী সুন্দর।"

সত্যিই সুন্দর। দু'পাশে ঘন হয়ে ওঠা শালবন। তার বুক চিরে রুপোলি রাজপথ। সেই পথ বেয়ে ওরা হেঁটে-হেঁটে একটু এসেই শালবনের ভেতর দিয়ে যে রাঙামাটির পথ, সেই পথ ধরে চলতে লাগল। শুভঙ্কর মনে-মনে

pathagar.net

ভাবল, প্রকৃতির এই রূপ থেকে জীবনের কতগুলো বছর বঞ্চিত ছিল সে। ভাগ্যিস বিল্টু নাচাল ওকে। না হলে এ-দৃশ্য তো দেখা হত না। পেত না এই অরণ্যের স্বাদ।

এই সুন্দর সকালে শাল-মহুয়ার বনের ভেতর হারিয়ে গেল ওরা। কিছুদূর যাওয়ার পরই রেললাইন চোখে পড়ল ওদের। আর বহুদূরে দেখা গেল পাহাড়ের পর পাহাড়ের সারি। শুভঙ্কর তন্ময় হয়ে চেয়ে রইল পাহাড়গুলোর দিকে।

তিন্নি বলল, "অমন অবাক হয়ে কী দেখছেন?"

"আমি কখনও পাহাড় দেখিনি তিন্নি। তাই ওই পাহাড়গুলোকে দেখে আমার মনের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠল। ওই পাহাড়গুলোর দিকে যাওয়া যায় না?"

তিন্নি হেসে বলল, "কেন যাবে না? তবে ওগুলো বুনো পাহাড়। তাই বেড়াবার জন্য ওদিকে কেউ যায় না। ও পাহাড়ে ওঠার তো কোনও পথ নেই।"

"আমার কিন্তু মনে হচ্ছে এক্ষুনি ছুটে যাই ওগুলোর কাছে।"

"ওই পাহাড়গুলো এখান থেকে অনেক দূর।"

"কতদূর?"

"তা ধরুন না কেন, আট-দশ কিলোমিটার তো হবেই। তাও ওই পাহাড়গুলোর পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে সোনার নদী সুবর্ণরেখা। সেই নদীও এখন জলে ভরা। আঘাটায় নদী পার হওয়াও একটা দুরূহ ব্যাপার। অতএব যাব বললেই ওখানে যাওয়া যায় না।"

শুভঙ্কর পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আমার যে পাহাড়ে ওঠার কত শখ তা কী বলব তোমাকে।

"এ আর এমন কী কথা? দু-একটা দিন যাক। তারপর আমি নিজে আপনাকে ধারাগিরিতে নিয়ে গিয়ে পাহাড় আর ঝরনা দেখিয়ে আনব। চলে যাব মুসাবনি। দেখাব জিলিং ডুরিং পাহাড়। ঘাটশিলায় ফুলডুংরি দেখে অবশ্য পাহাড় দেখার শখ মিটবে না। না হলেও তাও দেখাতাম।"

"আমার আর তর সইছে না। মনে হচ্ছে আজই এক্ষুনি চলে যাই ওখানে।"

"যেতাম তো, শুধু কালকের ওই মর্মান্তিক ঘটনাটাই সব কিছুকে ম্লান করে দিল। কী বিচ্ছিরি ব্যাপারটাই না ঘটে গেল কাল।"

শুভঙ্কর বলল, "আজকের দিনটা যাক। কাল যে করেই হোক আমাকে পাহাড়ে ওঠাতে হবে। বিল্টুটা এলে আজ দুপুরের মধ্যেই আমাদের কাজটা সেরে নেব। তারপর কাল সকাল হলেই শুরু করব আমাদের পর্বতাভিযান।"

তিন্নি বলল, "আপনাদের কাজ! কী কাজ আপনাদের?"

শুভঙ্কর বলল, "যে কাজের জন্য এসেছি।"

"আমাকে বলবেন না তো?"

"সে-কথা কাউকে বলা যাবে না তিন্নি।"

"আমাকেও না?"

pathagar.net

"কাউকে না।"

তিন্নি ছলছল চোখে বলল, "ঠিক আছে। না বলা যায়, বলবেন না। তবে এটুকু জানবেন, আমার পেট থেকে গোপন কথা কখনও বেরোয় না।" এর পর অসম্ভব রকমের গম্ভীর হয়ে গেল তিন্নি।

শুভঙ্কর বলল, "তুমি রাগ করলে ?"

তিন্নি অভিমান করে বলল, "আপনি আমার কে যে আপনার ওপর রাগ করব ?"

"সে কী ! আমি তোমার দাদা।"

"তা হলে সত্যি কথাটা খুলেই বলুন এবার।"

শুভঙ্কর চারপাশ বেশ ভালভাবে একবার দেখে নিয়ে বলল, "ব্যাপারটা খুবই গোপনীয়। তবে সাবধান। কেউ যেন না জানতে পারে। তা হলে আমরা কিন্তু খুবই বিপদে পড়ে যাব।"

"তিন্নি অত সোজা মেয়ে নয়।"

শুভঙ্কর তখন এক-এক করে সব কথা খুলে বলল তিন্নিকে। শুনেই চোখ কপালে তুলে তিন্নি বলল, "বলেন কী ! সোনার গণপতি হিরের চোখ !"

"হ্যাঁ।"

"ঠিক বলছেন ?"

"তোমাকে মিথ্যে বলে লাভ ?"

"আমি কিন্তু এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না।"

"তোমার গা ছুঁয়ে বলছি।"

তিন্নি বলল, "তা হলে শুনুন, আমি প্রায়-রাতেই অনেক অদ্ভুত-অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি। স্বপ্ন যখন শেষ হয় তখন কখনও দেখি ইঁদুরের পিঠে চেপে এক অতিকায় গণেশঠাকুর শালবনের ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কখনও দেখি ভারী সুন্দর এক সোনার গণপতি জ্বলজ্বলে চোখে চেয়ে-চেয়ে আমাকে দেখছেন। গত রাতেই আমি স্বপ্ন দেখেছি, এক বিশাল পারাবারে একটি ধুতি পরা গণেশ-মূর্তি নৌকোর মাঝি হয়ে আমাকে নিয়ে দাঁড় বাইছেন। এইসব স্বপ্ন দেখার পর আপনার মুখে এই বাড়ির জঠরে 'সোনার গণপতি হিরের চোখ' শুনে খুবই অবাক হয়ে যাচ্ছি। আমি ভেবে পাচ্ছি না ওই গণেশঠাকুর বারেবারে আমাকেই-বা দেখা দিচ্ছেন কেন ?"

শুভঙ্কর বলল, "বেশ রহস্যময় ব্যাপার তো।"

"সত্যিই রহস্যময়।"

"আচ্ছা, সেই বিশাল পারাবারের আশেপাশে কোথাও কোনও পাহাড় দেখেছ তুমি ?'

"দেখেছি বড়-বড় পাহাড়। বরফে ঢাকা।"

"বুঝেছি। তোমার দিব্যদৃষ্টি আছে। তাই তুমি ওইসব দেখতে পেয়েছ। তোমার ওই স্বপ্নের দেশেই তো আমরা যাব তিন্নি।"

"আমরা মানে ?"

"বিল্টু আর আমি। অবশ্য ওই সোনার গণপতিকে যদি উদ্ধার করতে পারি।"

pathagar.net

বেশ জোরালো গলায় তিন্নি বলল এবার, "আমিও যাব আপনাদের সঙ্গে।"

শুভঙ্কর বলল, "তুমি কী করে যাবে?"

"যেভাবে আপনারা যাবেন।"

"আমরা যেভাবে যাব সেভাবে তুমি তো যেতে পারবে না। তা ছাড়া মেয়েরা যায় না সে-পথে। সে অনেক দূরের পথ। অনেকদিন ধরে যেতে হয়। কুমায়ুন পর্বতমালা পার হয়ে তিব্বতের দিকে। আমাদের অবশ্য তিব্বতে যাওয়ার দরকার হবে না। গারবিয়াং পর্যন্ত গেলেই হবে। তবু ও-পথ তোমার জন্য নয়।"

"আমি যাবই। আমাকে যেতেই হবে। আমার স্বপ্নের দেশে আমাকে বাদ দিয়ে আপনারাই-বা কী করে যান, সেটাই আমি দেখব।"

"তোমাকে বাড়িতে ছাড়বে কেন?"

"আপনাদেরই-বা ছাড়বে কেন?"

"আমরা বাড়ি থেকে পালাব।"

"আমিও পালাব।"

"বেশ, যদি সাহস থাকে তা হলে যেতে পারো। আমাদের দিক থেকে কোনও আপত্তি নেই।"

শুভঙ্করের সম্মতি আদায় করে আনন্দে ভরে উঠল তিন্নি। ওরা দু'জনে পায়ে-পায়ে হাটতলা পার হয়ে জোড়া শিবমন্দির বাঁয়ে রেখে জগন্নাথ মন্দিরের কাছে এল। সব মন্দিরের দরজাই তখন বন্ধ। তারপর এল এক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের কাছে। তখন ভোরের আবছায়া স্পষ্ট হয়ে এসেছে।

তিন্নি বলল, "ওই দেখুন, ত্রিবেণীশ্বর শিবের মন্দির। ওই মন্দির ভগবতীর। এপাশের যে মন্দির, এটা হল গায়ত্রীর। আর ওই যে ভাঙা বাড়িটা দেখছেন, ওই হল নরসিংগড়ের রাজবাড়ি।"

শুভঙ্করের কল্পনায় মিলল না। তাই সে পোড়ো ভাঙা বাড়িটার দিকে তাকিয়ে বলল, "রাজবাড়ির এই হাল?"

তিন্নি বলল, "হ্যাঁ। এর ইটগুলোই এখন অতীতের সাক্ষী।"

শুভঙ্কর বলল, "একবার ভেতরে ঢুকব?"

"না না। দরকার নেই। এইরকম একটা পোড়ো ভাঙা বাড়িতে না ঢোকাই ভাল।"

"এসেছি যখন ঢুকিই-না একটু।"

"চলুন তবে।"

ওরা সেই নির্জন প্রান্তরে গ্রামের শেষে রেলপথের ধারে গাছপালার ছায়া-ঘেরা ভাঙা রাজবাড়ির ভেতরে সাহসে ভর করে ঢুকে পড়ল। চারদিকে আগাছার জঙ্গল। ধসে-পড়া দেওয়ালের গায়ে বড়-বড় ফাটল। তাই দেখতে-দেখতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। হঠাৎই শুভঙ্কর তিন্নির হাত ধরে টান দিল।

তিন্নি বলল, "কী হল?"

শুভঙ্কর চাপা গলায় বলল, "মনে হচ্ছে এখানে কেউ এসেছিল।"

তিন্নি বলল, "এই ভাঙা বাড়িতে সাপের ছোবল খেতে কে আসবে?"

pathagar.net

"ওই দ্যাখো।"

তিন্নি দেখল একটা সিগারেটের খোল আর কয়েকটা আধপোড়া সিগারেটের টুকরো পড়ে আছে সেখানে। বলল, "সত্যিই তো। এই পোড়ো ভাঙা বাড়ির ভেতর এগুলো এখানে কী করে এল?"

শুভঙ্কর বলল, "যেভাবেই হোক এসেছে। হয়তো কোনও খারাপ ছেলেপুলে এসে জুটেছিল এখানে, নয়তো কোনও চোর-ডাকাতের আড্ডা আছে এর ভেতর।"

"সেই যাই থাক। আর বেশি ভেতরে ঢুকে কাজ নেই। চলুন, ঘরে ফেরা যাক।"

"ঘরে তো ফিরবই। একবার ওপরটা উঠে দেখি না। এইরকম আর কোনও নিদর্শন চোখে পড়ে কি না।"

"আমার খুব ভয় করছে কিন্তু। চোর-ডাকাতদের আমি মোটেই পছন্দ করি না।"

শুভঙ্কর বলল, "চোর-ডাকাতদের কে বা পছন্দ করে? ঠিক আছে, তুমি বরং নীচেটা লক্ষ রাখো, আমি একবার ওপর উঠে একটু দেখে আসি।"

এই বলে পা টিপেটিপে ওপরে উঠল শুভঙ্কর। তারপর ভাঙা বারান্দা পার হয়ে ঘরে ঢুকতে গিয়েই যা দেখল তাতে বিস্ময়ের সীমা রইল না ওর। শুভঙ্কর দেখল, কাল সন্ধের সময় ট্রেনের মধ্যে শিকারিবাজের যে দলটির সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছিল, সেই দলেরই দু'জন এখানে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। একজনের পাশে রাখা আছে একটি রিভলভার। আর-একজন সেই হারানো ডায়েরিটা মাথায় দিয়ে শুয়ে আছে। এ যে মেঘ না চাইতেই জল।

শুভঙ্কর বুঝল আসলে কাল রাতেই ওরা ডায়েরিটা পড়ে সব কিছু জেনে ফেলেছে এবং ওই সোনার গণপতি উদ্ধারের আশায় পরের যে কোনও ট্রেনে এখানে এসে হাজির হয়েছে। শিকারি তার অন্য দু'জন সঙ্গীকে নিয়ে এসে পড়লেই হয়তো শুরু হবে কাজ। নয়তো এমনও হতে পারে শশিমাস্টারকে হত্যা করার ব্যাপারে এখানকার প্রতিক্রিয়াটা কী তা জানবার জন্যই চর হিসেবে এসেছে ওরা। শুভঙ্কর ওর বাবার মুখেই শুনেছে, আসলে প্রত্যেক খুনিই খুন করার পর থানা-পুলিশ বা সন্দেহজনক এলাকার কাছে বোকার মতো ঘুরে বেড়ায়। সে সব-সময়ই জানবার চেষ্টা করে তাকে বা তাদের কেউ সন্দেহ করছে কি না। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, এরা যেজন্যই এসে থাকুক না কেন সেই সাত রাজার ধন মানিকের মতো ডায়েরিটা হাতে পেয়ে উদ্ধার করা যায় কী করে?

শুভঙ্কর নিঃশব্দ পায়ে ঘরের ভেতর ঢুকল। তারপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সুযোগ খুঁজতে লাগল ডায়েরিটা মাথা থেকে টেনে নেওয়ার। রিভলভারটা আস্তে-আস্তে তুলে নিল। সেফটি ক্যাচ মুক্ত করে ভেতরের গুলিটা বের করে রিভলভারটাকে পকেটের মধ্যে রাখল। না হলে ট্রিগারে চাপ পড়লে যে-কোনও মুহূর্তে গুলি ছুটে যেতে পারে। পুলিশ অফিসারের ছেলে বলেই এই ব্যাপার-স্যাপারগুলো ও জানে। তবে ট্রিগার টিপে এ-পর্যন্ত গুলি ও করেনি কাউকে।

যাই হোক, রিভলভারটা যথাস্থানে রেখে ও যখন আলতো করে লোকটার মাথার নিচ থেকে ডায়েরিটা সরিয়ে নেওয়ার জন্য ঝুঁকে পড়েছে, ঠিক সেই সময়ই নীচে থেকে ডাক দিল তিন্নি, "শুভদা ! চলে এসো। আমার খুব ভয় করছে। তুমি এত দেরি করছ কেন ?"

সর্বনাশ হয়ে গেল।

ঘুমন্ত যুবক দু'জন এবার চোখ মেলেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

আর শুভঙ্কর ? সে করল কি, চোখের পলকে ডায়েরিটা হাতে নিয়ে ওরা কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই সাহসে ভর করে ভাঙা বারান্দার ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ল পাশের একটা টিবিতে। তারপর হাঁক দিয়ে ডাকল তিন্নিকে, "তিন্নি ! পালিয়ে এসো।" বলেই শুরু করল ছুটতে।

তিন্নিও বিপদের গন্ধ পেয়ে কোনওদিকে না তাকিয়ে ফ্রক উড়িয়ে বেণী দুলিয়ে ছুট-ছুট-ছুট।

আর সেই লোক দুটো দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে ওদের পিছু নিতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। একজন কী ভেবে যেন আবার ছুটে ওপরে উঠে গেল। আর-একজন হতচকিত হয়ে তাকিয়ে রইল পলায়মান এই দুই কিশোর-কিশোরীর দিকে। আসলে এখন সকাল হয়ে যাওয়ায় গ্রামের লোকজন সবাই উঠে পড়েছে। তাই ধরা পড়বার ভয়ে ওদের পিছু নেওয়ার দুঃসাহসটা দেখাল না কেউ।

এদিকে তিন্নি আর শুভঙ্কর ছুটতে-ছুটতে একেবারে জোড়া মন্দিরের সামনে এসে হাঁফাতে লাগল।

সেখানে তখন অনেক লোকজন।

তিন্নির সবাই পরিচিত। কিন্তু শুভঙ্করকে তো কেউ চেনে না। তাই দু-একজন এগিয়ে এসে তিন্নিকে বলল, "তোমাদের কী হয়েছে ? এমন করে ছুটছ কেন ?"

তিন্নি তো জানেই না কী হয়েছে ব্যাপারটা। তাই ভয়ে-ভয়ে শুভঙ্করের দিকে তাকাল।

শুভঙ্কর ভয়ে-ভয়ে বলল, "ওই ভাঙা রাজবাড়ির ভেতর দু'জন খুনি লুকিয়ে আছে।"

"খুনি লুকিয়ে আছে ?"

"হ্যাঁ।"

"তোমরা কী করে চিনলে ওরা খুনি ?"

"আমাদের চোখের সামনে কাল ওরা শশিমাস্টারকে খুন করেছে।"

চমকে উঠল সবাই, "শশিমাস্টার ! মানে, আমাদের সেই মাস্টারমশাই খুন হয়েছেন ? কাল ? কই শুনিনি তো ?"

একজন প্রবীণ ভদ্রলোক বললেন, "তা না হয় বুঝলুম, কিন্তু এত সকালে তোমরা দু'জনে ওই ভাঙা রাজবাড়ির মধ্যে কী করতে গিয়েছিলে ?"

তিন্নি বলল, "আমরা খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। আসলে আমার এই দাদাটি কলকাতায় থাকেন তো, তাই দাদাকে শালবনের ভেতর দিয়ে রাজবাড়ি দেখাতে নিয়ে এসেছিলাম।"

pathagar.net

"বুঝেছি। আর বলতে হবে না। কই চলো তো দেখি কে কোথায় লুকিয়ে আছে?"

গ্রামসুদ্ধ লোক তখন জড়ো হয়েছে সেখানে। এই কথা শুনে সবাই লাঠিসোঁটা হাতে নিয়ে দলবল বেঁধে চলল রাজবাড়ির দিকে। ছেলে-মেয়ে, জোয়ান-বুড়ো কেউ আর বাদ নেই। মার-মার রবে ছুটে চলল সব। কিন্তু কী আশ্চর্য! কোথায় কে? কাকস্য পরিবেদনা সেখানে। কিন্তু কিছুক্ষণ আগেও কেউ যে সেখানে ছিল তার প্রমাণ সর্বত্র। বিড়ি-সিগারেটের টুকরো, পোড়া দেশলাই কাঠি, মাংসের কাই লাগানো ভাঁড়, শালপাতা সবই ছড়ানো আছে। নেই শুধু খুনিরা।

॥ ৫ ॥

শুভঙ্কর আর তিন্নি যখন নরসিংগড় থেকে রেললাইনের পাশ দিয়ে শালবন পার হয়ে ধলভূমগড়ে ফিরল, তখন বেশ ভালভাবে সকাল হয়ে রোদ উঠে গেছে। ওরা ফিরে এসেই দেখল, বিল্টু ও পুণ্ডরীককাকা ফিরে এসেছেন। শশিমাস্টারের শেষকৃত্য কাল রাতেই সম্পন্ন হয়েছে।

বিল্টু ঘুম জড়ানো চোখে বলল, "কী রে! কোথায় গিয়েছিলি তোরা?"

শুভঙ্কর বলল, "তোদের গ্রাম দেখতে।"

"কেমন লাগল?"

"ভারী সুন্দর জায়গাটা। আমার যে কী ভাল লেগেছে, তা তোকে বলে বোঝাতে পারব না।"

বিল্টু হেসে বলল, "অথচ এই গ্রামেই তুই আসতে চাইছিলি না।"

"আসতে চাইছিলাম না দুর্যোগের ভয়ে।"

"আমি তো বললাম, এ-দুর্যোগ বেশিক্ষণ থাকবে না। দিঘার নিম্নচাপ। সরে যাবে অন্যদিকে। ওখানে গেলেই দেখবি সব ঠিক হয়ে গেছে।"

"তোর কথাই ঠিক। বরং নিম্নচাপের ফলে ঝড়-বৃষ্টি হয়ে যাওয়ায় চারদিকের প্রকৃতি বেশ অপূর্ব হয়েছে।"

"গুমোট গরমটাও কেটে গেছে অনেক। না হলে এই সময় রোদ চড়া থাকলে যা গরম হয় তা কল্পনাও করতে পারবি না। প্রাণ আইঢাই করে একেবারে।"

কাকিমা বললেন, "আমি সেই কখন থেকে হানটান করছি। ভাবছি, কোথায় গেল রে বাবা ছেলেমেয়ে দুটো। একটু জল-টল খাবে কোথায়, তা না। কাল রাতে ওই দুর্যোগে কী যে খাওয়া হল, না হল, কিছুই বুঝলাম না। আজ একজনকে বলে দিয়েছি, পুকুরে মাছ ধরলে দিয়ে যাবে। এখন যা হোক কিছু মুখে দিয়ে জল-টল খাও। চা করি, খাও। গরিবের ঘর বাবা। ভালমন্দ কিছু তো খাওয়াতে পারব না। তা ছাড়া এ তোমাদের হাওড়া-কলকাতা শহর নয় যে, সন্দেশ রসগোল্লা আনাব। এ পোড়া দেশে কিছুই পাওয়া যায় না।"

কাকিমার কথা শেষ হলে তিন্নি বলল, "উঃ। তুমি এক নাগাড়ে এত কথা কী করে বলো, বলো তো মা?"

"তুই থাম। তুই হচ্ছিস যত নষ্টের গোড়া। ভোর না হতেই ছেলেটাকে

নিশি-পাওয়ার মতো তুলে নিয়ে চলে গেলি।"

লুচি,আলুভাজা আর হালুয়া করাই ছিল। কাকিমা ডিশ-ভর্তি করে সেগুলো নিয়ে এসে তিনজনকে দিলেন। তারপর উনুনে কেটলি বসিয়ে কুয়োতলায় গেলেন জল তুলতে।

খেতে-খেতেই বিল্টু বলল, "তুই আমার ওপর খুব রাগ করেছিস শুভ?"

"মোটেই না।"

"কী করব বল? সবাই বলল যেতে, তাই গেলাম।"

"বেশ করেছিস। এটা একটা মানবিকতার ব্যাপার। না যাওয়াটাই বরং খারাপ।"

"উঃ। ওই রাত-দুপুরে থানা-পুলিশ, লেখালিখি, কী ঝামেলাটাই না গেল কাল। তার ওপর মউকে সামলানো, যা-তা ব্যাপার!"

শুভঙ্কর বলল, "ওসব কথা এখন থাক। যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। মনে পড়লেও গা যেন শিউরে ওঠে।"

"এখন আমার কী মনে হচ্ছে জানিস? ওই শয়তানটাকে হাতের কাছে পেলে খুন করে ফেলি।"

তিন্নি বলল, "কাল তো হাতের কাছে পেয়েও কিছু করতে পারলে না।"

"কী করে কী করব বল? ওরকম একটা ঘটনা যে ঘটবে তা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি। তবু তো মেরেছিলুম শয়তানটার মুখে গরম কফি ছুঁড়ে।"

"হঠাৎ মাথা গরম করে তুমি নির্বোধের কাজ করেছিলে বিল্টুদা। ওর দলের লোকেরা যদি তখন তোমার গলা টিপে মারত বা ছুরি চালাত তা হলে কী করতে?"

"মরতুম। তবে ধরেও ছিল ওরা আমাকে কাল। ভাগ্যজোরে বেঁচে গেছি। কিন্তু এই কাজ করতে গিয়ে যা আমি খুইয়েছি তা আর কখনও ফিরে পাব না।"

"তোমার দাদুর সেই ডায়েরিটা তো?"

বিল্টু অবাক হয়ে তিন্নির মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই কী করে জানলি?"

"শুভদা আমাকে সব বলেছে, আমি সব জানি।"

বিল্টু শুভঙ্করের মুখের দিকে তাকাল।

শুভঙ্কর বলল, "হ্যাঁ। আমি ওকে সব কথাই বলেছি। আর এও জেনে রাখো, সেই হারানো ডায়েরি এখন আমার কাছে।"

বিল্টু আনন্দে লাফিয়ে উঠল, "শুভ!"

শুভঙ্কর মিটিমিটি হাসল।"

"তুই সত্যি বলছিস শুভ?"

"হ্যাঁ। ওটা এখন আমারই কাছে।"

"আমি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছি না শুভ।"

"না পারবারই কথা। কীভাবে যে ওই দুষ্কৃতীদের কাছ থেকে ওটাকে উদ্ধার করেছি তা কল্পনাও করতে পারবি না। তবে এর কৃতিত্বটুকু তিন্নিরই প্রাপ্য।"

তিন্নি বলল, "মোটেই না।"

pathagar.net

বিল্টু বলল, "কীরকম !"

"ভাগ্যিস ও আমাকে নরসিংগড়ের রাজবাড়ি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। তাই তো উদ্ধার হল ওটা। না হলে কিছুতেই পেতাম না এ জিনিস।"

তিন্নি বলল, "বাঃ রে। আপনি সাহস করে ভেতরে ঢুকলেন বলেই পেলেন। আমিই বরং আপনাকে যেতে না করছিলাম। তার ওপর ওইভাবে বারান্দার ওপর থেকে নীচে লাফিয়ে পড়া, এ কি কম কথা ?"

বিল্টু বলল, "হাজার হলেও ডি এস পি সাহেবের ছেলে তো !"

কথা বলতে-বলতেই খাওয়া শেষ করল ওরা।

কাকিমা চা নিয়ে এলেন।

চা খেতে-খেতে বিল্টু বলল, "আমার তো ঘুমে চোখ বুজে আসছে। চল, আমাদের ও-বাড়িতেই যাই। ওখানে বসেই শুনব সব, কীভাবে কী হল। তারপর তেড়ে একটা ঘুম দিয়ে শুরু করব আমাদের কাজ। ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে নিতে পারলেই শরীর ঝরঝরে হয়ে যাবে। তখন আর কাজ করতে কোনও অসুবিধে হবে না।"

"সেই ভাল। ও-বাড়িতে গিয়েই সব আলোচনা করা যাবে।"

ওরা চা খেয়ে ও-বাড়িতে চলল।

পুণ্ডরীককাকা ঘরে শুয়ে তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। গতকালের পরিশ্রম ও রাত্রি জাগরণের ঘুম।

তিন্নি গেল মউদের বাড়ি, মউ-এর সঙ্গে দেখা করতে। কাল রাতেই যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যা দুর্যোগ গেছে কাল। ইচ্ছে থাকলেও হয়ে ওঠেনি।

কাকিমার কাছ থেকে চাবি নিয়ে শুভঙ্কর আর বিল্টু ও-বাড়িতে গেল। বাড়ির উঠোনে পা দিয়েই অবাক হয়ে গেল বিল্টু। চোখ কপালে তুলে বলল, "এ কী ! ঘরের তালা-ফালা সব খোলা কেন ?"

শুভঙ্কর বলল, "ওঃ হো। তাড়াহুড়োর মাথায় কাল তালাটাই দেওয়া হয়নি। আসলে এক সাঙ্ঘাতিক বৃষ্টি-বাদলা মাথায় নিয়ে আমরা এ-বাড়িতে এসেছিলাম বটে, তবে যাওয়ার সময় এমনভাবে গেছি যে, তখন আর তালা লাগানো সম্ভব ছিল না।"

"তুই কাল এসেছিলি এ-বাড়িতে ?"

"এসেছিলাম।" বলে নিজের দুর্বলতার কথাটা খুলে বলল শুভঙ্কর।

শুনে বিল্টু বলল, "তা এই নির্বান্ধবপুরীতে একা থাকতে ভয় পাওয়ারই কথা। আমারই গা ছমছম করে। তবু থাকি। আসলে সয়ে গেছে তো। কিন্তু তুই একেবারে নতুন। তায় দুর্যোগের রাত।"

যাই হোক, ওরা ওপরে উঠে সেই ঘরটিতে ঢুকে তিন্নির টাঙানো মশারিটা খুলে বিছানার ওপর বেশ হাত-পা ছড়িয়ে বসল। শুভঙ্কর ওরে পেন্টের সঙ্গে প্যান্টের খাঁজে গুঁজে রাখা ডায়েরিটা বের করে বিল্টুর হাতে দিল। তারপর প্যান্টের পকেট থেকে বের করল সেই রিভলভারটা।

রিভলভার দেখেই চমকে উঠল বিল্টু, "এটা তুই কী করে পেলি ?"

শুভঙ্কর এক-এক করে সব বলল।

সব শুনে হায়-হায় করতে লাগল বিল্টু। বলল, "তুই রিভলভার চালাতে

pathagar.net

জানিস অথচ ওর ভেতরে গুলি থাকা সত্ত্বেও ছেড়ে দিলি লোক দুটোকে ?"

"আসলে আমি এসবের ব্যবহার জানলেও কোনও মানুষকে কখনও গুলি করিনি রে বিল্টু। আমার খুব ভয় করে।"

"তুই একটা হোপলেস।"

"সত্যিই তাই।"

"বিশেষ করে কাল ট্রেনের মধ্যে আমি যখন রুখে দাঁড়ালাম তুই কি তখনও কিছু একটা করতে পারতিস না। শিকারিবাজের হাত থেকে রিভলভারটা যখন খসে পড়ল তখন কেন ওটা কুড়িয়ে নিয়ে ওকেই একটা গুলি করলি না ?"

"অন্যায় হয়ে গেছে ভাই। ক্ষমা কর।"

"তা যদি করতিস তা হলে একজন সৎ নাগরিককে ওইভাবে মৃত্যুবরণ করতে হত না। এবং তোরও জয়-জয়কার পড়ে যেত চারদিকে।"

"আমি তখন দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম রে।"

"সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু একটু যদি তৎপর হতিস, তা হলে একটি মেয়ে তার বাবাকে হারাত না। যাক, এবার বল কীভাবে তুই এই রিভলভার বা ডায়েরিটা পেলি ?"

শুভঙ্কর তখন এক-এক করে সব কথা খুলে বলল বিল্টুকে।

বিল্টু বলল, "যাক। যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। আমাদের সামনে এখন কঠিন সংগ্রাম। ওটা যত্ন করে রেখে দে। কাজে লাগবে।"

শুভঙ্কর বলল, "আমি ওই গণপতির শপথ নিয়ে বলছি, যে ভুল আমি দু'বার করেছি, তা তিনবার করব না। তা ছাড়া এইসব দেখে-শুনে মনের ভয় আমার কেটে গেছে। এই মুহূর্তে আমার সামনে যদি ওই দুষ্কৃতকারীদের কেউ এসে পড়ে তা হলে সে কিন্তু পার পাবে না।"

বিল্টু শুভঙ্করকে জড়িয়ে ধরে বলল, "শাবাশ বন্ধু। আমি ঠিক এই কথাটাই তোর মুখ থেকে শুনতে চাইছিলাম। আমিও নিরস্ত্র থাকব না। একটা চাকু-টাকু জোগাড় করি। তারপর খেল কাকে বলে দেখাব।"

শুভঙ্কর বলল, "হ্যাঁ, খেল কাকে বলে তা দেখাতেই হবে। মূর্তিটা আগে উদ্ধার করি, তারপর প্রেতের মতো নাচব। ওই শিকারিবাজকে আমরা ছাড়ব না। ওটাকে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে তারপর যেখানে যাওয়ার যাব আমরা। তুই, আমি আর তিন্নি।"

"তিন্নি! তিন্নি কী করতে যাবে ?"

"ওকে যেতেই হবে রে বিল্টু। তোকে সব কথা বলেছি। বলিনি শুধু ওর স্বপ্নের কথা। ও কী স্বপ্ন দেখেছে জানিস ?"

"কী স্বপ্ন ?"

শুভঙ্কর তিন্নির স্বপ্নের বিবরণও দিল বিল্টুকে।

বিল্টু অবাক হয়ে বলল, "বলিস কী রে! এইসব স্বপ্ন দেখেছে তিন্নি। তা হলে তো ওকে আমাদের দলে নিতেই হবে।"

"না নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তিন্নি খুব আঘাত পাবে না হলে। আর এইসব স্বপ্ন দেখার পর ওকে বাদ দিয়ে কোথাও যেতে গেলে হয়তো আমরাই প্রকৃতির রুদ্র রোষে পড়ব।"

pathagar.net

"তা হলে একটা রীতিমত অভিযান হবে, কী বল ?"

"তা হবে।"

"সবই গণপতির ইচ্ছে। তোরা না গেলে একা আমি যে কীভাবে কী করতাম তা কে জানে ? এখন আর কোনও ভয় নেই। আসলে ওই মূর্তিটাকে নিয়েই তো যত সমস্যা। ওটাকে যত্ন করে এবং ঠিকভাবে রাখার চেয়ে কঠিন কাজ আর কী আছে বল ? তাই তোর কথা শুনে আমি বুকে দারুণ বল পেয়ে গেছি। তুই, আমি, তিন্নি—তিনজনেই যাব।"

শুভঙ্কর বলল, "সে তো যাব। এখন মূর্তি উদ্ধার কীভাবে হবে সে সম্বন্ধে কোনও পরিকল্পনা করেছিস ?"

"এখনও কিছু করিনি।"

"কখন করবি তা হলে ? শিকারিবাজের বাহিনী এসে ঝাঁপিয়ে পড়লে তারপর ? আর দেরি নয় বিল্টু। এবার আমাদের সক্রিয় হতেই হবে। ডায়েরি যখন ওদের হাতে পড়েছে, ওরা যখন রাজবাড়ি পর্যন্ত এসেছে, তখন আর নিশ্চিন্ত থাকা ঠিক নয়।"

"না। আমরা আর দেরি করব না। একটু পরেই শুরু করব কাজ।"

"প্রথমেই আমাদের বুঝে নিতে হবে দেওয়ালের কোন অংশে ওটা গাঁথা আছে। তারপরে দেখতে হবে কীভাবে ওটাকে ভাঙা যায়। দেওয়াল ভাঙার জন্য ছেনি-হাতুড়ি-শাবল এইসব তো চাই।"

বিল্টু অনেকক্ষণ ধরে কীসব চিন্তা করল। তারপর বলল, "ওগুলো তো চাই-ই। তা ছাড়াও চাই আর-একটা জিনসি। বাশুলা। হাতুড়ির মতো দেখতে, তার একদিক ছুঁচলো। এটা না হলে দেওয়ালের প্লাস্টার ঝরানোর অসুবিধে।"

"ওটা কোথায় পাবি ?"

"এসব জিনিস রাজমিস্ত্রিদের কাছে ছাড়া পাওয়া যাবে না।"

"তা হলে ?"

"অবশ্য তিন্নি ইচ্ছে করলে এগুলো জোগাড় করে আনতে পারে।"

"ও তো এখন মউদের বাড়ি গেল।"

"যাক না। ফিরে আসুক, তারপর যা হোক ব্যবস্থা করা যাবে। সবচেয়ে ভাল হয়, এই কাজের জন্য যদি কোনও রাজমিস্ত্রিকে পাওয়া যায়।"

শুভঙ্কর যেন আঁতকে উঠল, "খবরদার। সেই রাজমিস্ত্রিই মূর্তি উদ্ধারের পর যদি নিজমূর্তি ধারণ করে তখন ? অথবা ব্যাপারটা যদি রাষ্ট্র করে দেয় চারদিকে, তা হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। প্রথমেই তো পুলিশ এসে গালে চড় মেরে কেড়ে নিয়ে যাবে মূর্তিটা।"

"ঠিক বলেছিস তুই। কোনও অবস্থাতেই রাজমিস্ত্রির সাহায্য নেওয়া চলবে না।"

"তবে ! মূর্তি উদ্ধারের পরেও কি দায়িত্ব কম ? ওই মূর্তি নিয়ে শিকারি বাজের নজর এড়িয়ে এলাকা ছেড়ে পালানো এবং সুদূর যাত্রা রীতিমত একটা অসম্ভব ব্যাপার। শুধু শিকারিবাজ কেন, পথে রেল-ডাকাত ও দস্যু-তস্করের ভয়কেও উপেক্ষা করা যায় না।"

pathagar.net

বিল্টু বলল, "এর ওপর আছে টাকার সমস্যা। তুই, আমি, তিন্নি—তিনজনের রেল ভাড়া, বাস ভাড়া, থাকা-খাওয়া এবং অন্যান্য পথ-খরচার হিসেব যে কত তা কে জানে ? কিছু না হোক মাথাপিছু হাজার দুই টাকা করে তো লাগবেই।"

"তা লাগবে।"

"সে টাকা আমরা পাব কোথায় ?"

শুভঙ্কর বলল, "গণপতির ইচ্ছে হলে সে টাকা ঠিকই জোগাড় হয়ে যাবে। এখন ডায়েরিটা খুলে দ্যাখ, কোন জায়গায় ওই দুর্লভ মূর্তিটি থাকতে পারে।"

বিল্টুর ঢুলুনি ভাবটা যেন নিমেষের মধ্যে কেটে গেল এইসব উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনায়। সে তক্ষুনি ডায়েরিটা খুলে তার দাদুর লেখাটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিল। এই তো পরিষ্কার লেখা আছে 'আমার শোবার ঘরের মাথার দিকে একটি দেওয়ালের চোর-কুঠরিতে ওই মূর্তিটি গাঁথনির দ্বারা লুকাইয়া রাখিলাম।' কিন্তু দাদুর শোবার ঘর কোনটি ? কোন দিকের দেওয়ালে মাথা করে তিনি শুতেন ? আজ এই দীর্ঘ কয়েক বছর পরে এ-প্রশ্নের উত্তর দেবে কে ? বাবা হয়তো বলতে পারেন। হয়তো কেন, পারেনই, কিন্তু এখন বাবাকে কোথায় পাওয়া যায় ? বিল্টু যখন এইসব ভাবছে, তখন হঠাৎই ওর মনে পড়ে গেল পুণ্ডরীককাকার কথা। পুণ্ডরীককাকা বহুদিনের পুরনো লোক। উনি নিশ্চয়ই জানবেন দাদুর শোবার ঘর কোনটি ছিল। তাই আর এক মুহূর্ত দেরি না করে শুভঙ্করকে একটু বসতে বলে দ্রুত চলে গেল নীচে।

পুণ্ডরীককাকা তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। তাই কাকিমাকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা কাকিমা, আপনি কি বলতে পারেন, আমার ঠাকুরদার শোবার ঘর কোনটি ছিল ?"

কাকিমা বললেন, "আমি অবশ্য দেখিনি তাঁকে। তবে শুনেছি মাঝের বড় ঘরটিতেই তিনি শুতেন। কেন, হঠাৎ এ-কথা জানতে চাইছ ?"

বিল্টু বলল, "ও কিছু না। এমনই। তিন্নি এলে একবার ওপরের ঘরে পাঠিয়ে দেবেন তো।"

"ও কখন আসবে তার কি ঠিক আছে বাবা ? তোমাদের জন্য বরং দুটো ডিমের ওমলেট করে দিই, নিয়ে গিয়ে খাও।"

"এখন আর কিচ্ছু খাব না কাকিমা। একটু আগে জলখাবার যা খেয়েছি তাতেই পেট ভরে গেছে।" বলে বিল্টু আবার ওপরে উঠে গেল।

তারপর চাবির গোছা থেকে বেছে বেছে মাঝের বড় ঘরের তালাটা খুলল ওরা। দরজা ঠেলতেই বহুদিনের বন্ধ ঘরের একটা ভ্যাপসা গন্ধ বেরিয়ে এল ঘরের ভেতর থেকে।

শুভঙ্কর বলল, "তোর দাদুর আমল থেকেই বুঝি বন্ধ আছে ঘরটা ?"

বিল্টু হেসে বলল, "না না। তারপর বহুবার খোলা হয়েছে।"

ওরা ঘরে ঢুকেই প্রথমে জানলাগুলো খুলে দিল। খড়খড়ি দেওয়া বড়-বড় জানলা। ওপরে বেলজিয়াম কাচ লাগানো। হুহু করে হাওয়া ঢুকতে লাগল ঘরে। ওদের দু'জনেরই লক্ষ দেওয়ালের দিকে। ঘরে খাটও পাতা আছে একটা। কিন্তু দাদু যে কোন দিকে মাথা করে শুতেন তা কে জানে ? ওরা

pathagar.net

অনেকক্ষণ ধরে গবেষণা করে ঠিক করল, জানলার দিকে মাথা করে শোয়াটাই স্বাভাবিক। যে-কোনও মানুষ আলো-বাতাসের জন্য জানলার দিকেই মাথা করে শোয়। ওরা একটা টুল এনে তাতে দাঁড়িয়ে দেওয়ালের গায়ে একটা পেপার ওয়েট দিয়ে ঠুকে-ঠুকে দেখতে লাগল। কিন্তু না, এই সুকঠিন প্রাসাদের ইটের দেওয়ালে কোথাও কোনওরকম আলগা গাঁথনির সম্ভাবনা দেখা দিল না। ম্লান হয়ে গেল ওদের মুখ। যাঃ, এত জল্পনা-কল্পনা, এত কিছু—সব কি তা হলে ব্যর্থ হয়ে যাবে ?

শুভঙ্কর বলল, "ঘাবড়াও মাত। তিন্নিকে আগে আসতে দে। দেওয়ালের প্লাস্টারগুলো ছাড়ানো হোক। তারপর দেখা যাবে। এখনই ভেঙে পড়বার কিছু নেই।"

বলতেই-বলতেই তিন্নি এসে গেল। তিন্নি এসে অবাক হয়ে বলল, "এ কী করছেন আপনারা ?"

শুভঙ্কর বলল, "একটু ঠুকে-ঠুকে দেখছি। তার কারণ আর তো অপেক্ষা করা উচিত নয়।"

বিল্টু বলল, "দেওয়ালের প্লাস্টারগুলো ঝরানো যায় এমন কিছু একটা এনে দিতে পারিস তিন্নি ? সবচেয়ে ভাল হয় যদি একটা বাশুলা জোগাড় করতে পারিস।"

তিন্নি বলল, "আনছি। লাইনধারে রেলের মিস্ত্রিরা কাজ করছে, ওদের কাছ থেকেই নিয়ে আসছি। আপাতত আমাদের কয়লাভাঙা হাতুড়িটা তোমরা নাও।" বলেই ছুটে ঘর থেকে একটা হাতুড়ি নিয়ে এসে বিল্টুকে দিল তিন্নি। তারপর লাইনধারে যাচ্ছিল, শুভঙ্কর বাধা দিয়ে বলল, "কোনও দরকার নেই। বরং একটা শাবল জোগাড় কর দেখি ? তাতেই কাজ হবে।"

তিন্নি বলল, "হাতুড়ি, শাবল, ছেনি, দুরমুশ সব তো এ-বাড়িতেই আছে। নীচের দালানে সিঁড়ির তলায় আছে সব।"

বিল্টুর মনে পড়ল, সত্যিই তো। সবই তো আছে ওদের। তাহলে এত ভাবনা কেন ? ও নিজেই এবার নীচে গিয়ে যা-যা দরকার নিয়ে এল। ভাগ্যক্রমে বাশুলাও পেয়ে গেল একটা।

বিল্টু তিন্নিকে বলল, "তুই নীচের দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে দিয়ে আয় তিন্নি। যাতে কোনও শব্দই এখান থেকে বাইরে না যায়।"

তিন্নি আর শুভঙ্কর সবকিছু বন্ধ করে দিয়ে এল। বিল্টু শুরু করল ওর কাজ। বহুদিনের পুরনো বাড়ি। তাও চুন-বালির প্লাস্টার। বাশুলার ঘা পড়া মাত্র ঝরঝর করে ঝরে পড়তে লাগল সব। বিল্টুটা পারেও বটে। এক-একটা ঘা দিচ্ছে আর অমনই চাপড়া হয়ে ঝরে পড়ছে প্লাস্টার। কিন্তু যার জন্য এত কাণ্ড, সে-মূর্তি কই ? কোথায় সেই সোনার গণপতি হিরের চোখ ? আঁখখান থেকে চুন-বালি ঝরে ঘরের মেঝেয় একরাশি রাবিশ জমল।

বিল্টু ক্লান্ত হলে শুভঙ্করের পালা। সেও বিল্টুর মতো বাশুলার ঘা মেরে দেওয়াল পরিষ্কার করে দিল। কিন্তু না, সেই ইটের গাঁথনির মধ্যে চোর-কুঠরির কোনও স্থানই নির্ণয় করতে পারল না ওরা।

এদিকে ওদের অবস্থা হয়েছে তখন ভূতের মতন। তিন্নি সরাসরি কোনও

pathagar.net

কাজ না করলেও চুন-বালির রেণুতে ওকেও আর চেনা যাচ্ছে না। ওরা ছেনি মেরে, শাবলের খোঁচা দিয়ে কিছুতেই কিছু করতে পারল না। অতদিনের পুরনো বাড়ি কিন্তু একটি ইটও খসাতে পারল না কেউ। জেদের বশে ঘরের চারটে দেওয়ালকেই শ্রীহীন করে ফেলল ওরা।

এক সময় মনের দুঃখে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সব। সবাই তখন ক্লান্ত পরিশ্রান্ত আশাহত।

বিল্টুর দু' চোখে জলের ধারা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল, "এ-জগতে দৈব, দৈবের নির্বন্ধ, ভবিতব্য—এসব কথা শুধুই দেখছি কথার কথা। আসলে এ-জগতে মিথ্যাই সত্য। সত্য কিছু নয়।"

তিন্নি বলল, "কী ভুলভাল বকছ বিল্টুদা ? এত হতাশ হয়ে পড়ছ কেন ? সামান্য একটা ডায়েরির লেখা পড়ে তুমি যেন পাগল হয়ে উঠেছ। কোনও মানে হয় ?"

বিল্টু রেগে বলল, "এটা সামান্য ডায়েরি ? ওই ডায়েরির ছত্রে-ছত্রে যেসব কথা লেখা আছে, তা কী সামান্য হতে পারে ? তা যদি হত তা হলে তুই-ই বা ওই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিস কেন ? কেন তুই গণপতির বদলে অন্য কোনও দেবতাকে স্বপ্নে দেখিস না ? আমরা ঠাকুরদাদা বরদাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী বাজে কথা লেখবার লোক নন। তা ছাড়া কোনও মানুষ আজ পর্যন্ত তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরিতে কখনও মিথ্যে কথা লিখেছে,না লিখতে পেরেছে ?"

শুভঙ্কর বলল, "না না। ওই ডায়েরির লেখা মিথ্যে হবে কেন ? তবে এমনও তো হতে পারে, ধর, এই ডায়েরির লেখা পড়ে ডাকাতরা যে রাতে তোর ঠাকুরদাকে খুন করে সেই রাতেই দেওয়াল ভেঙে ওই সোনার গণপতিকেও অপহরণ করে ?"

"অসম্ভব।"

"অবশ্য এসবই আমার অনুমান। হয়তো তোর বাড়ির লোকেরাও জানতে পারেন না ওই গণপতির বৃত্তান্ত। পরে তাঁরা ওই দেওয়ালে কোনও মূল্যবান জিনিস ছিল এবং সেটা চুরি করবার জন্যই ডাকাতরা এসেছিল ভেবে ওখানটা মেরামতি করেন।"

"আর ডায়েরিটা ?"

"ওটার আর কোনও প্রয়োজন না থাকায় ডাকাতরা ওটাকে ফেলে রেখেই চলে যায়।"

"তোর কথাই যদি সত্যি হয়, তা হলে ওই ডায়েরিটা তো আমাদের পরিবারের সকলের হাতেই পড়ত এবং ওই সোনার গণপতি লুণ্ঠনের ব্যাপারটা আমাদের কারও আর অজানা থাকত না। সে কাহিনী আমাদের পরিবারের মুখে-মুখে ফিরত। এমনকী ডায়েরিটাও আলমারির চোর-কুঠরির মধ্যে লুকনো থাকত না এতদিন।"

শুভঙ্করের কথাগুলোও যেমন ফেলে দেওয়ার নয়, বিল্টুর যুক্তিও তেমনই অসার নয়। তার আর-একটা কারণ, ঘরের দেওয়ালে ঘন সন্নিবদ্ধ যে ইটের গাঁথনি তা দেখে মনেই হয় না পরে কোনও সময়ে নতুন ইট দিয়ে কোনও শূন্যস্থান পূরণ করা হয়েছে বলে। অতএব ডায়েরির লিখন রহস্যময়ই রয়ে

boiRboi.net

গেল।

এমন সময় তিন্নিই হঠাৎ কী ভেবে যেন বলল, "আচ্ছা বিল্টুদা, এমনকী হতে পারে না, দাদু পরবর্তী কোনও সময়ে তাঁর শোবার ঘরের পরিবর্তন করেছিলেন। এবং সেই ঘরেই ওই মূর্তিটা রাখার কথা লিখেছেন?"

আশার আলো দেখে উৎসাহিত হয়ে বিল্টু বলল, "তুই ঠিক বলেছিস তিন্নি। নিশ্চয়ই তিনি তা করেছিলেন। অথবা এমনও হতে পারে কাকিমা না জেনেই ওই ঘরটাকে চিহ্নিত করেছেন দাদুর ঘর বলে। আদৌ হয়তো ও ঘরে দাদু শুতেনই না।"

শুভঙ্কর বলল, "আমার মনে হয় ঠিক তাই। আমরাই ঘর ভুল করে অযথা পরিশ্রান্ত হয়েছি।"

বিল্টু বলল, "যা আছে কপালে। গোটা বাড়ির প্লাস্টার ঝরাব আজ। এতে পাই ভাল, না পাই বাড়িতে বকুনি খাব।"

তিন্নি বলল, "বাড়িতে বলবে কেন? তোমরা চলে গেলে আমিই একদিন দরজার তালাগুলো খুলে রেখে দেব। তারপর রটিয়ে দেব রাতদুপুরে ডাকাতরা এসে গুপ্তধনের লোভে এইসব করে গেছে।"

বিল্টু বলল, "দি আইডিয়া। তোর পেটে যে এত বুদ্ধি তা আগে জানতুম না রে।"

শুভঙ্কর বলল, "এখনকার মতো তা হলে ক্ষান্ত দে। আগে স্নান-খাওয়া সেরে নিই আয়। তারপর নতুন উদ্যমে দুপুরবেলা আবার লাগব।"

তিন্নি বলল, "সেই ভাল।"

বিল্টু বলল, "ভাল তো। কিন্তু এই অবস্থায় আমরা ঘর থেকে বেরোব কী করে? কুয়োতলায় স্নান করতে গেলে আমাদের চেহারা দেখেই তো চমকে উঠবেন কাকিমা।"

তিন্নি বলল, "তোমরা নীচে অপেক্ষা করো। আগে আমি গিয়ে এক বালতি জল নিয়ে আসি। সেই জলে তোমরা মুখ-হাত ধুয়ে পরিষ্কার হও। তারপর কুয়োতলায় যাবে।"

তিন্নি কতকটা যেন নৃত্যের ছন্দে লাফাতে-লাফাতে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল।

শুভঙ্করকে নিয়ে বিল্টু পাশের ঘরে, মানে যে-ঘরে ওর দাদুর তৈলচিত্রটি ছিল, সেই ঘরে গেল। বিল্টুর চোখে জল। ও দাদুর ছবির ওপর মাথা রেখে কাঁদল কত। তারপর টিপটিপ করে মাথা খুঁড়ে বলল, "তুমি আমার পিতামহ। তোমার যশ ও কীর্তির কথা শুনেছি কত। এ-জীবনে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়নি। শুধু তোমার লেখা ওই মূল্যবান ডায়েরিটা পড়েই আজ এক অদম্য উৎসাহ নিয়ে ছুটে এসেছি এখানে। আমি তোমাকে অভিশাপ-মুক্ত করব। তোমার বংশধরেরা গণপতির রুদ্র রোষ থেকে যাতে চিরমুক্ত হন, তাই করব আমি। আমার জীবনের বিনিময়ে এ-কাজ আমাকে করতেই হবে। তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো। যেন আমি সফল হই। তোমার আশীর্বাদে সোনার গণপতি যেন প্রসন্ন হন।" এই বলে ছবি থেকে মাথাটা তুলে যেই না দু'হাত জোড় করে প্রণাম করতে যাবে অমনই বহুদিনের পুরনো সেই ছবিটা নড়াচড়া

পেয়ে পচা দড়ি সমেত হুকসুদ্ধু দেওয়াল থেকে খসে পড়ল।

যেই না পড়া অমনই আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত বিল্টু চিৎকার করে উঠল, "হুর্‌র্‌রে। শুভঙ্কর! দ্যাখ, দ্যাখ, ভাল করে চেয়ে দ্যাখ, ও কিসের সঙ্কেত। কিছু বুঝতে পারছিস?"

শুভঙ্করের চোখে অপার বিস্ময়।

বিল্টুর চিৎকার শুনে তিন্নিও তখন ছুটে এসেছে। এসে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে ওরও মুখে কথা নেই।

ওরা তিনজনেই দেখল, দেওয়ালের গায়ে প্লাস্টারের ওপর রং দিয়ে আঁকা আছে একটি গণেশ প্রতিমা। যদিও সেটি বিবর্ণ হয়ে গেছে, তবুও এই স্থানেই যে ওই দুর্লভ ধাতব গণপতির অবস্থান, তা অতিবড় মূর্খও অনুমান করতে পারে।

ওরা তিনজনেই করজোড়ে প্রণাম করল সেই গণপতিকে।

শুভঙ্কর বলল, "আর কেন? এবার উদ্ধার কার্যে লেগে পড়ি আয়?"

বিল্টু বলল, "না। এখন নয়। সঙ্কেত যখন পেয়েছি তখন ও মূর্তি যে এখানেই আছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এখন আয় দাদুর ছবিটাকে হুক সমেত আবার যথাস্থানে আটকে দিই। দুপুরে খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নিয়ে রাতের অন্ধকারে যা করবার তা করব।"

শুভঙ্কর বলল, "ঠিক বলেছিস। এখনই মূর্তিটি ওখান থেকে বের করে আনলে লুকিয়ে রাখার জায়গা পারি না। আমরা বরং মূর্তিটিকে রক্ষা করার একটা ব্যবস্থা করে তারপরে দেওয়াল ভাঙব।"

"অবশ্যই।"

শুভঙ্কর বলল, "তিন্নি! একটা শক্ত মোটা দড়ি আনতে পারিস?"

এসব কাজ তিন্নি ছাড়া হয় না। তাই ওকেই যত ফরমাশ।

তিন্নিও চটপটে মেয়ে। চোখের নিমেষে কোত্থেকে একটা শনের দড়ি এনে বলল, "আপাতত এটা দিয়েই কাজ চালাও। পরে ভাল দড়ি দেখব'খন।"

ওরা দেওয়ালের হুকটাকে ঠুকে-ঠুকে আবার যথাস্থানে বসিয়ে দড়ি বেঁধে ছবিটা যেমন ছিল তেমনই টাঙিয়ে দিল। তারপর বেশ ভাল করে দরজায় তালা দিয়ে নীচে নামল ওরা। ওদের আনন্দ দ্যাখে কে?

নীচে নামতে-নামতে বিল্টু বলল, "দ্যাখ শুভ! শুভস্য শীঘ্রম। আমার মনে হয় রাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করা আমাদের ঠিক হবে না। আমরা স্নান করে শুচি হয়েই গণপতিকে স্পর্শ করব।"

শুভঙ্কর বলল, "তা করলেও হয়।"

তিন্নি বলল, "আমি তা হলে গণপতির অভিষেকের জন্য মালা-চন্দনের ব্যবস্থা করি।"

বিল্টু বলল, "এত বেলায় ফুল পাবি তুই?"

"কেন পাব না? গাছ-ভর্তি গন্ধরাজ ফুটে আছে। আমি সেই ফুল মালা গেঁথে গণেশ ঠাকুরের গলায় পরিয়ে দেব। চন্দন ঘষে আনব। গণেশ ঠাকুরের পায়ে সেই চন্দন তোমরা মাখিয়ে দেবে। তুলসী পাতা দেবে। আমি ধূপ-ধুনো সব কিছুর ব্যবস্থা করছি।"

pathagar.net

ওরা ওই অবস্থাতেই কুয়োতলাতে এল। ভাগ্যিস কাকিমা ছিলেন না সেখানে। ওরা দড়ি-বালতিতে করে জল তুলে হুড়হুড় করে মাথায় ঢেলে স্নান করতে লাগল।

তিন্নি ঘর থেকে সাবান আর গামছা নিয়ে এসে এগিয়ে দিল ওদের দিকে। তারপর সাজি হাতে বাগানে গেল ফুল তুলতে।

গন্ধরাজ আর চাঁপাফুলে বাগান যেন ভরে আছে। তিন্নির মনে হল সোনার গণপতিকে কনক চাঁপার মালা গেঁথে পরালে কেমন হয়? চাঁপা আর গন্ধরাজের গন্ধে বিভোর হয়ে সোনার গণপতিও হয়তো তাঁর হিরের চোখে চেয়ে গভীর রাতে শুঁড় দোলাবেন। তিন্নি ঘুমঘোরে স্বপ্ন দেখবে— এক বিশাল পারাবারে, যেখানে টলমলে কালো জলে থরেথরে পদ্ম ফুটে থাকবে, সেখানে সোনার নৌকোর মাঝি হয়ে সোনার গণপতি রুপোর দাঁড় বেয়ে অজানার উজান স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ওকে। সিদ্ধিদাতা গণেশ। সিদ্ধিদাতা গণেশ। তিন্নি আপনহারা হয়ে যাবে।

॥ ৬ ॥

বিল্টু ও শুভঙ্কর অনেকক্ষণ ধরে সাবান মেখে সাবানের ফেনায় গা-মাথা সব ভরিয়ে স্নান করল। ওঃ, যা ধুলো লেগেছে গায়ে। এবার শুধু ছেনি-হাতুড়ি ঠুকে ঠিক জায়গা থেকে ঠিক জিনিসটাকে বের করে নেওয়া। কিন্তু যা ওরা ভাবল তা কার্যকর হল না। তার কারণ কাকিমা ওদের খাবার জন্য ডাকলেন।

তিন্নি বাগান থেকে সাজি-ভর্তি ফুল নিয়ে ওপরের ঘরে চলে গেল। করবী, চাঁপা, গন্ধরাজ, কত ফুল।

বিল্টু আর শুভঙ্কর গেল খেতে। বিল্টু অবশ্য আপত্তি করেছিল খাবার ব্যাপারে। কিন্তু কাকিমা শুনলেন না। বললেন "বেলা একটা বাজে। আর দেরি নয়। আগে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকোও, তারপর যা ইচ্ছে করোগে যাও। ওই একটা ছেলে, প্রথম এসেছে এ-বাড়িতে। কী ভাববে কী ও?"

শুভঙ্কর বলল, "কাকিমা ঠিকই বলছেন বিল্টু। খাওয়াদাওয়ার পাটটা আগেই বরং চুকিয়ে নেওয়া যাক। তারপর ভেবেচিন্তে কাজ করা যাবে। সারাটা দুপুর তো রইলই আমাদের জন্য।"

"বলছিস? চল তবে। খাওয়াদাওয়াটাই সেরে নিই।"

ওরা স্নান করে আর ওপরে না গিয়ে তিন্নিদের ঘরেই এল। এখানেই ব্যাগ-ট্যাগগুলো রাখা ছিল ওদের। তা থেকেই পাজামা-পাঞ্জাবি বের করে পরে নিল ওরা।

দাওয়ায় আসন পেতে কাকিমা খেতে দিলেন ওদের। তারপর নিজের মনেই বলতে লাগলেন, "দুষ্টু মেয়েটা, কোথায় যে গেল। সকাল থেকে ঘুরছে। একটু হাতাপাতি করলে কখন হয়ে যেত সব কিছু।"

শুভঙ্কর বলল, "আমার বোনের ব্যাপারে এসব বলবেন না কাকিমা। ও কিন্তু সারাক্ষণ আমাদের কাছে-কাছেই আছে।"

"না না। এতখানি বেলা হল, এবার নিজেও তো চান-টান সেরে নিতে

pathagar.net

পারে।"

বিল্টু বলল, "আসলে ওকে আমরা একটা কাজ দিয়েছি। ও ওপরের ঘরে বসে দাদুর ছবিতে পরাবে বলে মালা গাঁথছে।"

"তাই নাকি! তা এতদিন বাদে হঠাৎ দাদুর ওপর এত দরদ কেন? তাঁর অমন সাধের বাড়িই তোমরা বিক্রি করে দিচ্ছ?"

"সেইজন্যই তো এ-বাড়িতে আমরা তাঁর শেষ পূজা করে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি কাকিমা।"

"তা বেশ করছ বাবা। তোমাদের ভাল হোক। তোমরা সুখী হও। বাড়ি বিক্রি হলেও আমাদের যেন ভুলে যেও না। মাঝে-মধ্যে এসো। এসে থেকে যেও। দু' বন্ধুতেই এসো, কেমন?"

শুভঙ্কর বলল, "ও না আসুক, আমি তো আসবই। ভাইফোঁটার দিন তিন্নির হাতে ফোঁটা নিতে হবে না?"

কাকিমা হেসে বললেন, "নেবে বইকী বাবা। নিশ্চয়ই নেবে। তোমার বাবা-মাকেও নিয়ে আসবে। আমাদের গরিবের ঘর হলেও থাকার জায়গার অভাব হবে না এখানে। ধলভূমগড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখলে তো? যে-কোনও মানুষের মন ভরে যাবে। তা ছাড়া এখানকার জলহাওয়াও কত ভাল। দিন কতক থাকো, তা হলেই বুঝবে। চেহারা ফিরে যাবে।"

বিল্টু বলল, "কাকিমা! আজ দুপুরের জন্য তিন্নিকে আমরা চেয়ে নিচ্ছি আপনার কাছ থেকে। ওকে যেন কোনও কাজ দেবেন না। আজ ও সারা দুপুর আমাদের কাছে থাকবে। আজ আমরা ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ করে দাদুর কাছে প্রার্থনা করব যেন এই বাড়ি কোনওমতেই বিক্রি না হয়।"

কাকিমা বললেন, "বেশ। তাই কোরো। তোমাদের অন্তরের ডাক যদি তাঁর কানে পৌঁছয়, তা হলে নিশ্চয়ই তাঁর আশীর্বাদে এ-বাড়ি রক্ষা পাবে।"

ওরা খাওয়াদাওয়া সেরে মুখ-হাত ধুয়ে ও-বাড়িতে চলে গেল। ওপরে উঠে দেখল তিন্নি তখন দিব্যি ছুঁচ-সুতো নিয়ে মালা গাঁথতে বসে গেছে। ওদের দেখে বলল, "কী! এত দেরি করলে যে? চান করতে এত সময় লাগে?"

বিল্টু বলল, "একেবারে স্নান-খাওয়ার পাট চুকিয়ে নিয়ে চলে এলাম। তুইও যা। এখন মালা গাঁথা রাখ। আগে স্নান-খাওয়া সেরে আয়। কাকিমা বলছিলেন, তুই এখনও স্নান-খাওয়া না করে ঘুরছিস। আমি কাকিমাকে বলে এসেছি, আজ সারা দুপুর তুই এখানে থাকবি।"

তিন্নি বলল, "খুব ভাল হয় তা হলে। তবে একটা কথা, আমি না-আসা পর্যন্ত দেওয়াল ভেঙে গণেশ ঠাকুর বের কোরো না যেন! তা হলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে।"

বিল্টু বলল, "না রে বাবা, না। যা করব আমরা তিনজনেই করব। তুই খেয়ে আয়।"

"বাবার খাওয়া হয়েছে?"

"তা তো বলতে পারব না। ঘরে শুয়ে আছেন দেখলাম। তুই যা।"

তিন্নি বলল, "যাচ্ছি।" বলে অসমাপ্ত মালা গাঁথার কাজ ফেলে রেখে কোনও একটি গানের কলি গুনগুন করতে করতে নীচে নেমে গেল।

pathagar.net

ফুলের সুগন্ধে ঘরের ভেতরটা তখন ম-ম করছে।

বিল্টু টেনে-টেনে দু-একবার শ্বাস নিয়ে বলল, "আঃ। শুভ রে। আমার দু' চোখ জুড়ে যত রাজ্যের ঘুম যেন নেমে আসছে এবার।"

শুভঙ্কর বলল, "সে তো আসবেই। কাল সারাদিনে ধকলটা কি কম গেছে? তার ওপর রাত জাগা। আজও সকাল থেকে পরিশ্রমটা কম কী হল? বেলা দুটো বাজে। পেটে ভাত-জল পড়েছে। ঘুমের আর দোষ কী বল?"

"একটু ঘুমিয়ে নেব?"

"সে-কথা বলতে! আগে ঘুম, তারপরে অন্য কিছু। তুই একটু ঘুমিয়েই নে। তিন্নি স্নান-খাওয়া করে আসুক। তারপর একটু দেরি করেই না হয় কাজে লাগা যাবে।"

বিল্টু বলল, "তুই ঘুমোবি না?"

"না। তুই তো জানিস, আমি দিনের বেলায় ঘুমোতে পারি না। তা ছাড়া কাল সারারাত যা ঘুমিয়েছি, তাতে আজ আর আমার চোখে ঘুম নেই। তুই ঘুমো। আমি বরং জেগে থাকি। তিন্নির প্রতীক্ষা করি। ও আসুক। মালা গাঁথুক। তারপর ডাকব তোকে।"

বিল্টু বলল, "তাই ডাকিস। আমি আর থাকতে পারছি না।" বলেই হাত-পা ছড়িয়ে বিছানায় শুয়ে পাশ ফিরল তারপর দু' চোখ বুজেই ঘুমিয়ে পড়ল সে।

আর শুভঙ্কর! সে বেচারি শুয়ে-শুয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে থেকে কত কী চিন্তা করতে লাগল। গণপতি উদ্ধার তো হবেন, তারপর? আনন্দের উচ্ছ্বাসে বিল্টুকে কথাও তো দিয়ে দিল যাবে বলে, কিন্তু কীভাবে যাবে? টাকার ব্যবস্থা কী করে করবে? অথচ যেতে ওকে হবেই। কেননা, তিন্নি যেখানে যাবে সেখানে ওর না গেলে মান থাকে না। এইসব চিন্তা করতে করতে একসময় কী ভেবে যেন উঠে দাঁড়াল ও। তারপর ধীরে-ধীরে সিঁড়ি ভেঙে উঠে পড়ল ওপরের ছাদে। এখান থেকে ধমভূমগড়ের অরণ্য-প্রকৃতি ওর মন-প্রাণ কেড়ে নিল। বৃষ্টিস্নাত গাছপালাগুলোর ওপর রোদের ছটা কী অপরূপ। আর দূরে বহুদূরের ওই পাহাড়মালা ওকে যেন পাগল করে তুলল। কাল-পরশুর মধ্যে যেভাবেই হোক ওকে কোনও একটা পাহাড়ে উঠতে হবে। ধারাগিরি না কী যেন, সেখানে ও যাবেই। সিংভূম জেলার এই অরণ্য-সৌন্দর্য ওকে যেন পাগল করে তুলেছে। আজ গণপতির মূর্তিটা উদ্ধার হলেই চেষ্টা করবে কাল দেখাশোনার পাটটা চুকিয়ে নিতে। তারপর মূর্তিটাকে সামলে নিয়ে ভালয়-ভালয় বাড়ি ফিরতে পারলেই নিশ্চিন্দি। পরে টাকা-পয়সা জোগাড় হলে কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হবে ওদের মানসযাত্রা।

শুভঙ্কর সেই প্রকৃতির স্বর্গরাজ্যের কল্পনায় বিভোর হয়ে কতক্ষণ তন্ময় হয়ে ছিল কে জানে? তিন্নির ডাকে সংবিৎ ফিরে পেল। কিন্তু পিছু ফিরেই অবাক। আরে! এ কে! এই শ্যামল সবুজ প্রকৃতির উপত্যকায় দূরে দূরান্তরে সার্কাসের তাঁবুর মতো লাল মাটির ঢেউ খেলানো ফ্রেমের মধ্যে আটকে-পড়া কে ও? তিন্নির সঙ্গে যেন দূর দিগন্ত থেকে একটি শ্বেত কবুতর উড়ে এসে

pathagar.net

ছাদে বসেছে। বিধাতাপুরুষ তাঁর তুলির টানে যে মুখ এঁকেছেন তার বুঝি তুলনা নেই। আর ওই চোখ দুটো ? অমন সুন্দর চোখ তো কখনও দ্যাখেনি ও। কী সুন্দর সহজ সরল নিষ্পাপ ও শুচি-স্নিগ্ধ। সাদা ফ্রক পরে বেণী দুলিয়ে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। যেন সুদূর আকাশ থেকে হংস বলাকার একটি পালক খসে পড়েছে। জল ভরা দিঘির বুকে ফুটে থাকা পদ্মের মতো মুখখানি তার প্রস্ফুটিত। কিন্তু সেই অপরূপ রূপের মাঝে সৌন্দর্যে ভরা মুখ-চন্দ্রিমায় যেন এক কালো মেঘের করাল ছায়া। দেখলেই বোঝা যায় গভীর সমুদ্রে হাল-ভাঙা নাবিকের মতো সে অসহায়। অথবা ঝোড়ো হাওয়ায় এক ক্লান্ত-ডানা চিল।

শুভঙ্কর ওর দিকে গভীর সহানুভূতি নিয়ে অপলকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "জানি, তুমি কে।"

মেয়েটি চোখ তুলে তাকাল। চোখ তো নয় যেন কালো জলের দিঘির বুকে ঝুঁকে থাকা নারকোল পাতা।

শুভঙ্কর বলল, "তুমি মউ। তোমার কথা কাল থেকে তিন্নির মুখে আমি অনেক শুনেছি। মউ ছাড়া আর কেউ তুমি হতেই পারো না।"

মউয়ের দু' চোখ বেয়ে জলের ধারা নামল এবার।

মউ দু' হাতে মুখ ঢেকে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, "তুমি তো শুভঙ্কর ! তাই না ?"

শুভঙ্কর বলল, "হ্যাঁ, আমিই শুভঙ্কর।"

"তোমার বাবা ডি. এস. পি ?"

"হ্যাঁ।"

মউয়ের দু' চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল এবার। ফোঁস করে ফণা তুলে বলল, "তাঁর ছেলে হয়ে তুমি এমনই অপদার্থ যে, হাতের কাছে রিভলভার পেয়ে সেটাকে তুমি কাজে লাগাতে পারলে না ? বিল্টুদার মতো তোমারও যদি রুখে দাঁড়াবার মেরুদণ্ড থাকত, তা হলে আজ আমি আমার বাবাকে হারাতাম না তা জানো ?"

এ-কথার উত্তরে কীই-বা বা বলবে শুভঙ্কর ? সত্যিই তো ! শিকারিবাজের হাত থেকে রিভলভারটা যখন খসে পড়েছিল, তখন যদি ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে না থেকে সে সেটাকে কুড়িয়ে নিত, আর শিকারিবাজকে লক্ষ্য করে ট্রিগারটা টিপে দিত, তা হলে এই ফুলের মতো মউ আজ পিতৃহীন হত না।

শুভঙ্কর বলল, "আসলে আমি খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিলাম তখন। কী যে করা উচিত তা মাথায় আসছিল না।"

মউ তেমনই রুষ্ট স্বরে বলল, "তার মানে তোমার ভেতরে বিদ্রোহের আগুন নেই। তুমি রুখে দাঁড়াতে জানো না। অবশ্য ওই বীজ সকলের মধ্যে থাকে না। ওটা সহজাত। তা যাক, তোমার কাছে একটাই অনুরোধ আমার। তুমি যেন বড় হয়ে পুলিশের চাকরি নিও না। তা হলে অপরাধীর বদলে নিরীহ লোক ধরা পড়ে মারধোর খেয়ে মরবে।"

ঠিক এই ধরনের খোঁচা খেতে শুভঙ্কর অভ্যস্ত নয়। তাই লজ্জায় অপমানে ওর ফরসা মুখ লাল হয়ে উঠল। বাবার পদমর্যাদার সম্মানের ভাগ এতদিন

সর্বত্রই পেয়ে আসছিল শুভঙ্কর। কিন্তু কোথা থেকে এই মেয়েটা এসে, বিশেষ করে তিন্নির সামনে কী যা-তা বলল ওকে। নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারল না সে।

মউ আবার বলল, "তিন্নির মুখে আমি সব কথা শুনেছি। তাই কয়েকটা কথা তোমাকে বলব বলেই ছুটে এসেছি। অবশ্য বলেই বা লাভ কী ? আমরা তোমার কে ? আমার বাবা তো তোমার বাবা নন। তোমার বাবা যদি ওইরকম অসহায় অবস্থায় পড়তেন, তুমি নিশ্চয়ই ওইরকম চুপ করে থাকতে না। কোথাকার কে এক স্কুল-মাস্টার। তাঁর পরিবার পথে বসলে একজন ডি. এস. পি'র ছেলের কীই-বা আসে-যায় ?"

তিন্নি এবং শুভঙ্কর দু'জনেই নীরব।

মউ বলল, "বিশেষ করে আজ সকালে ওই খুনিদের দু-দুজনকে হাতে পেয়েও তুমি ছেড়ে দিলে কী বলে ?"

শুভঙ্কর বলল, "সত্যি কথা বলতে কি, আমি আগ্নেয়াস্ত্রের প্রয়োগ জানি। কিন্তু কখনও করিনি। তাই ভয় হয়। রাস্তার কুকুর তো নয়, যে হুট করতেই মেরে দেব। মানুষ বলে কথা !"

মউ যেন বোমার মতো ফেটে পড়ল এবার। বলল, "ওদের তুমি মানুষ বলো ? ওই খুনিদের মানুষের মর্যাদা দাও তুমি ? ছিঃ।"

"না। তা দিই না, তবে..."

"তবে-টবে কিছু নয়। আসলে তুমি একটা...।"

শুভঙ্করের মাথাটা হেঁট হয়ে গেল।

তিন্নি এবারে ওর অবস্থাটা বুঝে বলল, "কী হচ্ছে মউ ! কাকে কী বলছিস তুই ? যেখানে কামরাসুদ্ধু লোক ভয়ে চুপ করে বসে আছে, সেখানে একা শুভদা কী করতে পারেন বল ?" তারপর শুভঙ্করকে বলল, "আপনি ওর কথায় কিছু মনে করবেন না শুভদা। আজ ওর মাথার ঠিক নেই।"

শুভঙ্কর বলল, "না। ওর যা মুখে আসে তাই বলুক, যা প্রাণে চায় তাই করুক। তবে আমি ওকে কথা দিচ্ছি, একজন দুঁদে পুলিশ অফিসারের রক্ত যদি আমার শরীরে সত্যিই বয়ে থাকে, তা হলে আমি কী তা আমি ওকে দেখিয়ে দেব। আমি দু-দু'বার সুযোগ হাতছাড়া করেছি। আর করব না।"

মেঘ-ভাঙা রোদের মতো মউয়ের রাগী মুখে একটু হাসি ফুটে উঠল এবার। বলল, "শাব্বাস। এই তো চাই। আমি তোমার মতো একজনকেই মনে-মনে খুঁজছিলাম এতদিন। যার ফণা আছে, যাকে খোঁচা দিলে ফোঁস করে। যার রক্তে বারুদ আছে। একটা দেশলাই কাঠি ধরিয়ে দিলেই যে বিস্ফোরণ ঘটায়। সেই তাকেই আমি পেয়েছি। শুভঙ্কর ! তুমি ছেলেমানুষ। আমিও এমন কিছু বড় হইনি। আমার গায়ের রং দেখেছ তো ? কিন্তু আমার মনের আগুন যে কত দ্বিগুণ তা কেউ জানে না। সেই আগুনের শিখাকে আমি দাবানল করে তুলতে চাই। আমাকে আমার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতেই হবে শুভঙ্কর। আমার দেহ-মন-প্রাণ সেই হত্যাকারীর রক্তপিপাসায় তৃষ্ণার্ত হয়ে আছে। ওকে আমার চাই। শিকারিবাজকে আমি চিনি না। তবে এখানকার সন্ত্রাস সে। কয়েক বছর ধরে পুলিশ প্রশাসন এবং সাধারণ মানুষকে ভয়ঙ্কর রকম জ্বালিয়ে

মারছে। তাকে আমি দেখিওনি কখনও। তোমরা দেখেছ। বিল্টুদা, তুমি। তাই আমি তোমাদের কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি। তোমরা আমাকে চিনিয়ে দাও কে সেই শিকারিবাজ ? আমি তাকে হত্যা করব।"

শুভঙ্কর বলল, "বেশ তো দেব। কিন্তু কোথায় পাব তাকে ?"

"এখানেই পাবে। সে আমাদের আশেপাশেই ঘোরাফেরা করছে।" বলেই ছোট্ট একটি ধারালো ছুরি বের করে বলল, "এই দ্যাখো, কী জিনিস আমি সঙ্গে রেখেছি। ওর গলার নলিটাকে দু'ফাঁক করে দেওয়ার পক্ষে এইটাই কী যথেষ্ট নয় ?"

শুভঙ্কর বলল, "অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে আমিও চাই। আর চাই বলেই আমি তোমার হাতে হাত মেলাচ্ছি। তোমার হাতটা একবার আমার দিকে বাড়িয়ে দাও তো।"

মউ ওর হাতটা বাড়িয়ে দিতেই হাতে হাত মেলাল শুভঙ্কর। সেই হাতের ওপর আরও একটি হাত এসে পড়ল। সে হাত তিন্নির। বলল, "আমিও আজ এই মুহূর্তে শপথ নিলাম, আমিও সব সময় তোমাদের পাশে-পাশেই থাকব।"

এমন সময় সিঁড়ির দরজার কাছ থেকে শোনা গেল, "ও, আমি বুঝি কেউ নই ?"

মউ বলল, "কে বলল তুমি কেউ নও ? তুমি তো তবু কিছু করেছ। কিন্তু যে তোমার চেয়েও বেশি কিছু করতে পারত, অথচ পারল না, তাকে দিয়েই আজ কঠিন শপথ করালাম।"

শুভঙ্কর বিল্টুর দিকে তাকিয়ে বলল, "কতটুকু ঘুমোলি তুই ? এরই মধ্যে উঠে পড়লি যে ?"

"এরই মধ্যে ? সূর্য কোথায় ঢলে পড়েছে দ্যাখ।"

"হলেই-বা। শুয়েছিস তো দুটোয়।"

"কী জানি। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। পাশ ফিরতে গিয়ে দেখি তুই নেই। এমন সময় তোদের কথাবার্তা কানে এল। তাই ঘুম ছেড়ে উঠে এলাম ওপরে।"

"বেশ করেছিস।" বলে মউয়ের হাত থেকে হাত সরিয়ে শুভঙ্কর বলল, "শোনো মউ, এই দুরূহ কাজে নামার আগে তোমার কাছে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। আমি যা জানতে চাইব তা ঠিক-ঠিক বলবে। তাতে কিন্তু আমাদেরই কাজের সুবিধে হবে খুব।"

"কী জানতে চাও বলো ?"

"কাল ট্রেনের মধ্যে শিকারিবাজের কথা শুনে বুঝলাম, সে তোমার বাবার ছাত্র ছিল। ওর আসল নাম রঘু। ওর বাবা মধু মাইতি এই গ্রামেরই লোক। এর পরও তুমি বলছ শিকারিবাজ কে তা তুমি জানো না। এবং তাকে চিনিয়ে দিতে বলছ। ব্যাপারটা কি বুঝলুম না।"

মউ বলল, "এতক্ষণে তুমি একটা পুলিশি চাল চেলেছ।"

শুভঙ্কর রেগে বলল, "শোনো। ফের যদি তুমি আমাকে বিদ্রূপ করে কিছু বলবে, তা হলে কিন্তু আমি তোমার পথ থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হব। আমার সাহায্য যদি চাও, আমার হাতে হাত মিলিয়ে যদি কাজ করতে চাও তা হলে

pathagar.net

কোনওরকম বাড়াবাড়ি করবার চেষ্টা করবে না।"

মউ হেসে বলল, "আচ্ছা বাবা, আচ্ছা। তুমি খুব রেগেছ বুঝতেই পারছি এবং এও বুঝতে পারছি এবারই তোমাকে দিয়ে কাজ হবে। তোমার ওই দুর্বল সত্তাকে যদি এইভাবে না খোঁচাতাম, তা হলে এত সহজে তুমি এমন তেতে উঠতে না।"

তিন্নি বলল, "তোমরা কি এখন ঝগড়া করবে, না কাজের কাজ কিছু করবে?"

মউ বলল, "হ্যাঁ শোনো, যা তুমি জানতে চাইছ তা বলি। অনেকদিন আগে মধু মাইতি এই গ্রামেই বাস করত। সে ছিল সুবর্ণরেখার মাঝি। কিন্তু পাক্কা চোর একটা। দাগি আসামি। আজ থেকে বছর-কুড়ি আগে ঝাড়গ্রামে পুলিশের গুলিতে সে মারা যায়। মধু মাইতির ছেলে রঘুর তখন দশ-বারো বছর বয়স। সে আমার বাবার পাঠশালায় পড়ত। মাথা মোটা। পড়াশোনা করত না। অর্ধেক দিন পাঠশালাতেও আসত না। ওর বাবার মৃত্যুর পর ওর মা ওকে নিয়ে গিধনিতে ওর মামার বাড়ি চলে যায়। সেই রঘুই পরে সঙ্গদোষে রঘু ডাকাত হয়। তবে ইতিহাসের সেই বিখ্যাত রঘু ডাকাত নয়, ও হল নিম্নস্তরের এক জঘন্য প্রকৃতির হিংস্র ডাকাত। শিকারিবাজ নাম নিয়ে সে চাইছে নিজেকে চম্বলের দস্যু সর্দারের মতো বিখ্যাত করতে। অপ্রয়োজনে নিরীহ মানুষ মেরে সে অযথা আতঙ্ক সৃষ্টি করছে। আমি ওর নামের সঙ্গেই পরিচিত। চেহারার সঙ্গে নয়। আমার বয়স চোদ্দ। ওরা কুড়ি বছর আগে এ-জায়গা ছেড়ে চলে গেছে। কাজেই আমি ওদের কী করে চিনব বলো?"

"অথচ সে কিন্তু তোমাকে বা তোমাদের সবাইকেই চেনে।"

"স্বাভাবিক। কিন্তু আমি তাকে চিনি না। আবার এমনও হতে পারে যে, সে আমার খুবই চেনা। হয়তো বহুবার দেখেছি তাকে। কিন্তু সেই যে শিকারিবাজ জানি না তা। পথেঘাটে কত লোককেই তো এইরকম দেখা যায়। কিন্তু কে কী তা কি কেউ বলতে পারে? তোমরা তাকে দেখেছ। শিকারিবাজ বলে চিনেছ। কাজেই তোমরাই পারো তাকে আমায় চিনিয়ে দিতে।"

শুভঙ্কর বলল, "হ্যাঁ, চিনিয়ে তোমাকে দেবই।"

"দেবই নয়। দিতেই হবে। ওর ক্ষতি না করা পর্যন্ত আমার মনের আগুন নিভবে না শুভঙ্কর।"

বিল্টু বলল, "ঠিক আছে। আমরা চারজনেই তা হলে শপথ নিলাম, আগে শিকারিবাজ তারপরে অন্য কাজ।"

তিন্নি বলল, "তা হলে কাল সকাল থেকেই শুরু হোক আমাদের কাজ?"

"হ্যাঁ। কাল সকাল থেকেই আমরা চারদিক তোলপাড় করব শিকারিবাজের জন্য। ওর দেখা আমাদের পেতেই হবে।"

তিন্নি বলল, "এদিকে মালাগুলো যে শুকিয়ে গেল তার কী উপায়?"

বিল্টু বলল, "কথায়-কথায় অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর নয়। সন্ধে হয়ে আসছে। এবার নীচে নাম।"

মউ বলল, "মালা শুকিয়ে গেল মানে?"

pathagar.net

শুভঙ্কর বিল্টুর দিকে তাকাল।

বিল্টু বলল, "ও-ও যখন আমাদের সঙ্গে একজোট হয়েছে, তখন ওকেও আর বলতে বাধা নেই।"

মউ জিজ্ঞেস করল, "ব্যাপারটা কী ?"

"খুবই গোপনীয়।"

তিন্নি বললে, "আয়, নীচে আয়। তা হলেই চোখের সামনে দেখবি সব।"

ওরা সবাই ধীর পদক্ষেপে দোতলায় নামল। তারপর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেই মউ বলল, "কী ব্যাপার ? তোমরা ঘরের ভেতর ফুলের মালা গাঁথছ, দরজা বন্ধ করছ, ব্যাপারটা কী ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

তিন্নি বলল, "মার কাছ থেকে শাঁখটা নিয়ে আসব বিল্টুদা ?"

"অমনি একটা দেশলাই নিয়ে আসিস। আলো জ্বালতে হবে।"

মউয়ের বিস্ময় সীমা ছাড়া। বলল, "শাঁখ ? শাঁখ কী হবে ?"

তিন্নি দুষ্টুমি করে বলল, "বাঃ রে। সোনার গণপতি বরণ হবে না ?"

"সোনার গণপতি !"

"হ্যাঁ। সিদ্ধিদাতা গণেশ। তাঁকে বরণ করেই আমাদের বড় কাজে নামতে হবে।"

"তোর কথার আমি কোনও মানে পাচ্ছি না।"

"পাবি, পাবি। নে, ততক্ষণ বসে না থেকে মালাটা গাঁথ দেখি। আমি চট করে আলো জ্বালবার জন্য একটা দেশলাই আর বাজাবার জন্য শাঁখটা নিয়ে আসি।" বলেই ঘরের দরজা খুলে তরতরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল তিন্নি।

সেই যে গেল আর তার ফেরবার নামটি নেই। এক মিনিট, দু' মিনিট, পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, আধ ঘণ্টা পার হয়ে গেল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঘনীভূত হল, তবুও তিন্নি ফিরল না।

মউয়ের মালা গাঁথা শেষ হয়ে গেছে কখন। তিন্নির প্রতীক্ষায় সবাই বসে আছে চুপচাপ। এই বুঝি আসে, এই বুঝি আসে, করে তো অনেক সময় পার হয়ে গেল। এক সময় অধৈর্য হয়ে মউ বলল, "একটু দেখে আসব, কী ব্যাপার ? কেন এত দেরি করছে মেয়েটা ?"

বিল্টু বলল, "যা তো ! দ্যাখ তো কী ব্যাপার। নিশ্চয়ই কাকিমা ওকে কোনও কাজে আটকেছেন।"

মউ বলল, "আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। সেরকম কিছু হলে কাকিমা নিশ্চয়ই আলো নিয়ে আসতেন।"

বিল্টু বলল, "তোমরা বোসো। আমিই বরং দেখে আসছি ব্যাপারটা কী ?" বলে অন্ধকার হাতড়ে এক পা, দু'পা করে যেই-না কয়েক ধাপ নেমেছে, অমনই মনে হল কে যেন আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'হাতে মুখটাকে চেপে ধরল ওর।

বিল্টুও ছাড়বার পাত্র নয়। রীতিমত ধস্তাধস্তি লাগিয়ে দিল তার সঙ্গে। গায়ের জোরে ওর হাতটাকে একবার মুখ থেকে সরিয়েই চেঁচিয়ে উঠল, "শু-ভ-ঙ্ক-র !" সে হাত পরক্ষণেই ওর মুখ আবার শক্ত করে চেপে ধরল।

মুহূর্তের জন্য হলেও বিল্টুর ওই ডাক এবং সিঁড়িতে ধস্তাধস্তির শব্দ কানে গেল ওদের। তাই মউকে নিয়ে দ্রুত ছুটে এল শুভঙ্কর, "কী হল বিল্টু !

কোথায় তুই ! বিল্টু !"

কিন্তু কোথায় কে ? আগন্তুক বিল্টুকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে চলে গেল বাড়ির বাইরে। সেখানে আরও দু'জন অপেক্ষা করছিল। তারা ওকে একটা গাড়িতে তুলে নিয়ে চোখের পলকে হাওয়া হয়ে গেল।

এদিকে শুভঙ্কর ও মউয়ের চেঁচামেচিতে সবাই ছুটে এল সেখানে। গ্রামসুদ্ধ লোক যেন ভেঙে পড়ল।

পুণ্ডরীককাকা এবং কাকিমা 'তিন্নি-তিন্নি' করে কত খুঁজলেন তিন্নিকে। ঘরে-বাইরে, মাঠে-ঘাটে কোথাও পাওয়া গেল না। মেয়ের জন্য হন্যে হয়ে উঠলেন কাকা-কাকিমা। তবুও তিন্নির খোঁজ পাওয়া গেল না কোথাও। পরিস্থিতিই বুঝিয়ে দিল, শুধু বিল্টু নয়, তিন্নিকেও নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা।

পুণ্ডরীককাকা দু-একজনকে সঙ্গে নিয়ে তক্ষুনি চললেন পুলিশে খবর দিতে।

আর কাকিমা ! "উঃ মাগো," বলে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

ঠিক এই অবস্থায় কী যে করা যায় বা কী করা উচিত তা কেউ ঠিক করতে পারল না । প্রতিবেশীরা কাকিমাকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে গিয়ে চোখে-মুখে জল দিতে লাগলেন।

শুভঙ্কর বোবার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখতে লাগল। সে যেমন বিস্মিত, তেমনই হতচকিত।

এক সময় মউই শুভঙ্করের একটি হাতে টান দিয়ে বলল, "তুমি একবার এসো তো আমার সঙ্গে।"

শুভঙ্কর কিছু না জেনেই নীরবে অনুসরণ করল ওকে।

যেতে-যেতে মউ বলল, "আমার অনুমান কতখানি ঠিক তা বুঝলে তো ? আমি তোমাকে বলেছিলাম না ওরা আশপাশেই কোথাও আছে। হাতেনাতেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল।"

শুভঙ্কর বলল, "সত্যি ! তুমি মেয়ে হতে পারো। আমার সমবয়সী কিংবা হয়তো দু-এক বছরের ছোট। তবু তুমি অনেক বুদ্ধি রাখো। কিন্তু এই রাতদুপুরে অন্ধকারে কোথায় যাচ্ছ তুমি ?"

"এসোই না আমার সঙ্গে।"

"এদিকে ওপরের ঘরটা খালি রইল যে !"

"থাকুক। ও ঘরে কেউ ঢুকবে না।"

"তুমি তো জানো না মউ, কী অমূল্য ধন ওই ঘরের মধ্যে লুকনো আছে। জানলে এ-কথা বলতে না।"

মউ এবার চলা থামিয়ে বলল, "হ্যাঁ, কী ব্যাপার বলো তো । সেই থেকে তোমরা কী যেন বলি-বলি করছ, অথচ বলছ না। দারুণ একটা সাসপেন্সের মধ্যে রাখছ আমাকে। এবার সত্যি করে বলো তো শুনি, ব্যাপারটা কী ?"

শুভঙ্কর বলল, "এই ঘরের ভেতর বিল্টুর দাদুর একটা মূল্যবান ডায়েরি আছে। আর আছে ওই ঘরের দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথা এক সোনার গণপতি। যাঁর চোখ দুটো হিরের।"

"বলো কী ?"

"বিল্টুর ধারণা এবং ওই ডায়েরির লেখা পড়ে আমারও ধারণা, সোনার গণপতির অভিশাপে বিল্টুদের পরিবার আজ ভেসে যেতে চলেছে। তাই আমরা এসেছি ওই গণপতি দেবতাকে ইটের পাঁজর থেকে বের করে এনে যথাস্থানে পৌঁছে দিতে।"

"সেই যথাস্থানটা কোথায় জানতে পারি কী?"

"নিশ্চয়ই। সে স্থান বহুদূরে। ইচ্ছে করলেই সেখানে যাওয়া যায় না। সেখানে যেতে গেলে সমস্ত রকমের মায়া-মমতা ত্যাগ করে, ঘরের বাঁধন ছিঁড়ে দিয়ে যেতে হবে। কৈলাসের পাদমূলে মানস সরোবরে। মূর্তিটা অবশ্য ফেলতে হবে রাবণ হ্রদে।"

"তোমরা কি সত্যি সেখানে যাবে?"

"যাব না মানে?"

"কে-কে যাবে?"

"আপাতত তিনজনে। বিল্টু, আমি আর তিন্নি।"

"আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে।"

"সত্যি?"

"সত্যি না তো কি মিথ্যে?"

"খুব ভাল হয় তা হলে।"

"কবে যাবে ঠিক করেছ?"

"তা কি এখন বলা যায়? আগে মূর্তিটা হাতে পাই, টাকাপয়সা জোগাড় করি, তবে তো।"

মউ বলল, "ঠিক আছে। তবে একটা কথা, আজ রাতে ওই ঘর ছেড়ে তুমি কিন্তু কোথাও যেও না।"

"বেশ।"

"রিভলভারটা তোমার কাছে-কাছেই আছে তো?"

"আছে। তবে এখন এই মুহূর্তে এখানে নেই। ঘরের ভেতর বালিশের তলায় চাপা দেওয়া আছে।"

"ঠিক আছে। এখন থেকে ওটা সব সময় কাছে-কাছেই রাখবে তুমি।"

শুভঙ্কর বলল, "তা তো রাখতেই হবে।"

"আর শোনো, আজ রাতে নীচের ঘরের দরজাটা খোলা রেখে ওপরের ঘরের জানলা বন্ধ করে দরজায় খিল দিয়ে সজাগ থাকবে।"

কৌতূহলী শুভঙ্কর প্রশ্ন করল, "কেন?"

"হয়তো মাঝরাতে অথবা শেষ রাতে আমি গিয়ে ডাকব তোমায়। আমি ছাড়া আর কেউ ডাকলে না বুঝে দরজা খুলো না তুমি। আগে সাড়া বুঝবে, তারপর দরজা খুলবে।"

"পুলিশ এলে?"

"পুলিশ এলে দরজা তো অবশ্যই খুলতে হবে। তবে আসল পুলিশ কি নকল পুলিশ সেটা জানবার জন্য পুণ্ডরীককাকাকে ডাকবে। উনি খুলতে বললে তবেই খুলবে দরজা। না হলে শিকারিবাজের দল রাত দুপুরে 'আমরা থানা থেকে আসছি' বলে দরজা খোলাতে পারে।"

pathagar.net

শুভঙ্কর বলল, "আমি তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করি। কিন্তু এখন তুমি কোথায় যাচ্ছ ?"

"কোনও অকাজে নয়। এসো, দেখতে পাবে।"

শুভঙ্কর মউয়ের পিছু-পিছু পথ চলতে লাগল। এদিক-সেদিক করে অন্ধকার শালবনের ভেতর দিয়ে ওরা এক জায়গায় একটি মাটির ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। বাড়ির ভেতরে ঢুকে উঠোনে দাঁড়িয়ে হাঁক দিল মউ, "বুদ্ধু ! এই বুদ্ধু !"

দাওয়ায় একটি চিমনি লণ্ঠন জ্বলছিল। সেখানে মাদুর পেতে শুয়ে ছিল এক বুড়ি। মউয়ের গলা শুনে ঘরের দিকে মুখ করে ডাকল, "খোকা ! এই খোকা ! দ্যাখ তো কে ?"

ঘরের ভেতর থেকে বুদ্ধু বেরিয়ে এল। ঘন কৃষ্ণবর্ণের কুড়ি-বাইশ বছরের এক যুবক। বলিষ্ঠ দেহ। মজবুত গড়ন। মাথায় কোঁকড়া চুল। অসম্ভব তেজী। বুদ্ধু বেরিয়ে এসে বলল, "কে !"

"আমি রে।"

বুদ্ধু একটু অপ্রসন্ন এবং ভারিক্কি গলায় বলল, "কী চাই ?"

"একটা বিশেষ দরকারে তোর কাছে এসেছি ভাই। তোর মোটর বাইকটা একবার দিবি আমাকে ?"

"না। ও আমি কাউকেই দিইনি। তোকেও দেব না। তা ছাড়া তোর হাত সেটই হয়নি ভাল করে। ব্যালান্সই হয়নি।"

"ভয় নেই। তোর গাড়ির ক্ষতি করব না আমি।"

"বললুম তো দেব না।"

"বুঝেছি। আসলে এ-কথা তুই বলছিস না। তোর রাগ বলছে। সেদিন বারোয়ারিতলায় তোর গালে আমি চড় মেরেছিলাম, সেই রাগে তুই দিবি না। অথচ রাগের মাথায় এইরকম করে মনে-মনে আমি যে কত দুঃখ পেয়েছিলাম, তা কি তুই জানিস ?"

বুদ্ধু গম্ভীর গলায় বলল, "তোর আর কিছু বলার আছে ?"

"আছে।"

"তাড়াতাড়ি বল।"

"শোন বুদ্ধু। দুর্বুদ্ধি মানুষকে দিয়ে অন্যায় করায়। কিন্তু পরিস্থিতিই তাকে সুযোগ দেয় সেই দোষ ঢেকে ফেলার। তেমনই, তুই সেদিন যে অন্যায়টা করেছিস, আজই তোর সুযোগ এসেছে সেই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করার। দোষ আমারও আছে। সেইজন্য তোকে ওইরকম অপমান করেও আবার তোরই কাছে এসেছি সাহায্য চাইতে।"

"কিন্তু...।"

"তুই শুনেছিস নিশ্চয়ই শিকারিবাজ আমার বাবাকে কীভাবে খুন করেছে। আমার বাবার কাছে তুইও তো পড়েছিস । আমার বাবার ছাত্র তুই। আমাকে তুই ফিরিয়ে দিবি ? তা ছাড়া ওই শয়তান শিকারিবাজের লোকেরা আজ এইমাত্র বিল্টুদাকে তুলে নিয়ে গেছে। সেইসঙ্গে নিয়ে গেছে পুণ্ডরীককাকার মেয়ে তিন্নিকেও।"

pathagar.net

বুদ্ধু যেন শিউরে উঠল, "সে কী !"

"তোরা গ্রামে বাস করেও তো গ্রামের মানুষ নোস। এখন তামুকপালের ফ্যাক্টরিতে কাজ পেয়েছিস, কোম্পানির টাকায় মোটর বাইক কিনেছিস, কত বড় হয়েছিস তোরা। আর আমরা, যে-কে-সেই আছি। পুলিশ এসে যদি কিছু করে তো করবে, না হলে যা হয় হবে এই ভেবে জোয়ান ছেলে হয়ে ভর সন্ধেবেলা ঘরে ঢুকে প্যাঁচার মতো বসে আছিস। তোর দুটি পায়ে পড়ি আমাকে একবার তোর বাইকটা দে। কেননা, আমার সাইকেলে হবে না। তা ছাড়া আজ এই মুহূর্তে আমার বাড়ির যা অবস্থা, তাতে ঘর থেকে সাইকেলও বের করা যাবে না।"

বুদ্ধু বলল, "বাইকটা কখন ফেরত পাব ?"

"আজ রাতেই। অথবা কাল সকালে।"

"ঠিক আছে। দেব তোকে। একটু দাঁড়া। বের করে আনছি।" বলে পাশের একটি ঘর থেকে লাল রঙের নতুন ঝকমকে মোটর বাইকটা বের করে এনে মউয়ের হাতে দিয়ে বুদ্ধু বলল, "খুব সাবধানে চালাবি কিন্তু ? তুই যা লিকপিক করে চালাস, দেখলে ভয় লাগে।"

মউ বলল, "কবে আমাকে লিকপিক করে চালাতে দেখেছিস তুই ?"

"মাস দুই আগে শুঁটেদার বাইকটা নিয়ে ঘুরছিলি না তুই ?"

"এখন দেখবি ? এই দ্যাখ।" বলেই একবার প্রচণ্ড বেগে বাইকটা নিয়ে চক্কর দিয়ে এসে বলল, "কী দেখলি ?"

"দেখলাম। ঠিক আছে। কোথাও ধাক্কা-টাক্কা লাগাস না যেন।" তারপর হঠাৎ শুভঙ্করের দিকে চোখ পড়ায় বুদ্ধু বলল, "এ ছেলেটি কে রে ?"

"তুই চিনবি না। ও ডি. এস. পি. সাহেবের ছেলে। শুভঙ্কর। আমাদের গ্রামে বিল্টুদার সঙ্গে বেড়াতে এসেছে। আমার বন্ধু।"

"অ।"

মউ বলল, "শুভঙ্কর। আমাদের কথা শুনে তুমি খুব অবাক হয়ে যাচ্ছ, তাই না ? আসলে বুদ্ধুটা সত্যিই বুদ্ধু। কিন্তু ওর মনটা কত নরম। তা দেখলে তো ? যদিও ও তোমার-আমার চেয়ে অনেক বড়, তবু ও আমাদের চেয়ে অনেক ছেলেমানুষ। তুমি এক কাজ করো, এই পথটা ধরে সোজা চলে যাও। খানিক গিয়ে বাঁ দিকের রাস্তাটা ধরে এগোলেই বাড়ি চলে যেতে পারবে। আমি একটু এগিয়ে দেখি ওদের কোনও সন্ধান পাই কি না।"

শুভঙ্করের বুক শুকিয়ে গেল ভয়ে। বলল, "কেন, আমাকেও তোমার সঙ্গে নাও না !"

"আমি কখনও ডবল ক্যারি করিনি। তাড়াহুড়োর মাথায় যদি তোমাকে সামলাতে না পারি ? তার চেয়ে তুমি যাও। তা ছাড়া তোমার এখন ঘর আগলানো দরকার। তোমাকে যা-যা বললাম, মনে রেখো। আমি আসছি।" বলেই চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল মউ।

সেই অন্ধকারে শালবনের দিকে তাকিয়ে শুভঙ্কর ভয়ে কাঁপতে লাগল। এই অন্ধকার জঙ্গলে একা-একা ওকে পথ চলতে হবে ? সর্বনাশ।

বুদ্ধু বলল, "বড্ড অন্ধকার। তাই না ? তোমার কাছে টর্চ আছে ?"

pathagar.net

শুভঙ্কর বলল, "না। তোমার আছে?"

"আছে। কিন্তু ব্যাটারি নেই।"

শুভঙ্করের চোখে যেন জল এল। কেন যে ওর এত ভয় তা কে জানে? যেমন দুর্যোগ মাথায় নিয়ে বেরিয়েছে তেমনই দুর্ঘটনার পর দুর্ঘটনা চলছে। কিন্তু এই অন্ধকারের রাজত্বে ঘন শালবনের ভেতর দিয়ে একা-একা পথ চলা! এ কি ভাবা যায়? গা যেন শিউরে ওঠে। তবু ওকে যেতে তো হবেই। একবার ভাবল বুদ্ধুকেই বলে একটু এগিয়ে দিতে। আবার দুর্বলতা ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে বলতে লজ্জা করল খুব।

ওর অবস্থা দেখে বুদ্ধুই বলল শেষে, "কী হল! ভয় করছে?"

শুভঙ্কর বলল, "না, তা ঠিক নয়। যা অন্ধকার তাতে পথ হারাই যদি?"

"পথ হারাবার ভয় তো নেই। বাঁ দিকের পথ ভুল হলেই সোজা রেল লাইন। রেল লাইন ধরে বরাবর বাঁ দিকে এগোলে পৌঁছে যাবে ওদের বাড়ি। অন্ধকারে ঠাহর করতে পারবে না অবশ্য।"

শুভঙ্কর বলল, "দ্যাখো, আমার হারিয়ে যাওয়ার বা অন্য কিছুর ভয় নেই। আমি ভয় করি শুধু সাপকে। একে রাত্রিবেলা। তার ওপর কাল পর্যন্ত বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখনও গর্তের জল শুকোয়নি। তুমিই আমাকে একটু এগিয়ে দাও না বুদ্ধুদা?"

বুদ্ধু খিকখিক করে হেসে বলল, "বুদ্ধুদা? বেশ বলেছ ভাই। আজ পর্যন্ত কেউ আমাকে বুদ্ধু ছাড়া অন্য কিছু বলেনি। তুমি একেবারে দাদা বলে দিলে? ঠিক আছে। তুমি একটু দাঁড়াও, আমি আসছি।" বলে বুদ্ধু যে ঘর থেকে সাইকেল বের করেছিল, সেই ঘরের দরজায় শিকলটা তুলে দিয়ে দাওয়ায় শুয়ে থাকা বুড়িকে বলল, "এই মা! আমার ফিরতে দেরি হলে খেয়ে নিস। বুঝলি?"

বুড়ি বলল, "কখন ফিরবি তুই?"

"রাত হবে।"

বুড়ি আর কিছু না বলে চুপচাপ শুয়ে রইল।

বুদ্ধু আর শুভঙ্কর এগিয়ে চলল অন্ধকারে।

যেতে-যেতে শুভঙ্কর বলল, "মউয়ের সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়েছিল বুঝি?"

"আরে না না। ওটা একটা মাথা-পাগলি মেয়ে। তবে ভীষণ সেন্টিমেন্টাল। আর তেমনই বদরাগী!"

"তাই নাকি? দেখে তো মনে হয় না।" এ-কথাটা অবশ্য শুভঙ্কর মিথ্যে করেই বলল। কেননা, মউয়ের রাগের নমুনা প্রথম দর্শনেই যা পেয়েছে তা ভোলার নয়।

বুদ্ধু বলল, "তবুও ওর মতো মেয়ে হয় না।"

কথা বলতে-বলতে ওরা ঘন শালবনের ভেতরে ঢুকল। তারপর বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকের একটা রাস্তা দেখিয়ে বুদ্ধু বলল, "তুমি এই পথটা ধরে সোজা চলে যাও। তা হলেই বাড়ি পৌঁছে যাবে। বিল্টুদের বাড়ি যাবে তো?"

"হ্যাঁ। তুমি আর যাবে না?"

pathagar.net

"না। আমি একটু লাইন ধারে যাব। তাসের আড্ডায়। ওখানে খবর দিয়ে একটু পরেই আসছি।"

বুদ্ধু চলে গেল।

আর শুভঙ্কর? সে সেই শালবনের ঘন অন্ধকারে একা অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। ভয়ে পাণ্ডুর হয়ে গেল ওর মুখ। অন্ধকার রাতে একা শালবনে ওর মনে হল শত-শত প্রেত যেন নেচে-নেচে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। তবু নিরুপায় হয়ে সাহসে ভর করে এগোতে লাগল ও। ঝিরঝিরে পোকাগুলো কী বিশ্রীভাবে ডাকছে। ঝিল্লির কলতানে কানে যেন তালা ধরে যায়। আরও কত যে বিচ্ছিরি ডাক কানে এল তার যেন শেষ নেই। ডানা ঝাপটে একটা প্যাঁচা বুঝি উড়ে গেল ওর মাথার ওপর দিয়ে। হঠাৎ ও কী! কী ওটা! মূর্তিমান প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে আছে। কী ভীষণ। কী ভয়ঙ্কর! ও কি তবে মৃত্যুর দূত! অগ্নিগোলকের মতো চোখ দুটো জ্বলছে তার। ঘন কালো, আর কী বিশাল। শুভঙ্কর এক-পা এক-পা করে পিছোতে লাগল। ও যত পেছোয় সে তত এগোয়। এক সময় দারুণ ভয়ে চিৎকার করে উঠল শুভঙ্কর, আঁ-আঁ-আঁ। তারপর আর কিছুই ওর মনে নেই।

॥ ৭ ॥

জ্ঞান যখন ফিরল তখন ও পুণ্ডরীককাকার ঘরে শুয়ে আছে। চারদিকে তখন অনেক লোকজন। পুলিশও আছে। শুভঙ্কর চোখ মেলেই উঠে বসল। তারপর বলল, "তিন্নি! তিন্নি কোথায়? বিল্টুকে পাওয়া গেছে?"

পুণ্ডরীককাকা বললেন, "না বাবা। ওদের কাউকেই পাওয়া যায়নি।"

দারোগাবাবু বললেন, "সেইসঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে না আরও একজনকে।"

শুভঙ্কর বলল, "কাকে?"

"শশিমাস্টারের মেয়ে মউকে। তোমাকেও পাওয়া যাচ্ছিল না। বহুকষ্টে ওই শালবনের ভেতর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। ওখানে তুমি এই রাত দুপুরে কী করতে গিয়েছিলে? কেউ কি তোমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল?"

শুভঙ্কর বলল, "না। আমি মউয়ের সঙ্গে বুদ্ধুদার বাড়ি গিয়েছিলাম। ও বুদ্ধুদার বাইকটা নিয়ে দুষ্কৃতকারীদের সন্ধানে গেছে। আমি একা এই পথে ফেরার সময় একটা ভয়ঙ্কর কিছু দেখে অজ্ঞান হয়ে যাই।"

"বুঝেছি। তুমি একটা গোরু দেখে ভয় পেয়েছ।"

"গোরু!"

"হ্যাঁ। বিশাল শরীর একটা ষাঁড়। ভয়ঙ্করদর্শন। কাউকে গুঁতোয় না। শুধু ফোঁস-ফোঁস শব্দ করে। ওরই চোখ দুটো অন্ধকারে জ্বলছিল, তাই দেখেই তুমি ভয় পেয়েছ। ওকে তুমি নিশ্চয়ই ভূত বা অন্য কিছু ভেবেছিলে? অচেনা লোকেরা সবাই অন্ধকারে ওকে দেখে ভয় পায়। তা এই রাত্রিবেলা অন্ধকারে তুমি শালবনে ঢুকলে অথচ একটা টর্চ নাওনি কেন? তা হলে তো এ-কাণ্ডটা হত না।"

শুভঙ্কর লজ্জায় মাথা হেঁট করল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ। শেষকালে কিনা একটা

গোরু দেখে ভয় পেল সে ?

দারোগাবাবু বললেন, "যাক। এবার আসল কথায় আসি। কীভাবে কী হল সব ঠিক করে আমাকে খুলে বলো তো দেখি ? মানে তোমার বন্ধু বিল্টু বা তিন্নিকে ওরা কীভাবে নিয়ে গেল ?"

শুভঙ্কর বলল, "কীভাবে নিয়ে গেল তা তো বলতে পারব না।" বলে এক-এক করে সব কথা খুলে বলল দারোগাবাবুকে। এমনকী সকালে নরসিংগড়ের ঘটনাটাও বলতে ভুল করল না। চেপে গেল শুধু দাদুর ডায়েরি, সোনার গণপতি, ও ওদের কাছ থেকে ছিনতাই করা রিভলভারটার কথা।

দারোগাবাবু সব শুনে যা-যা নোট করবার করে নিয়ে বললেন, "শুনলাম তুমি একজন ডি এস পি সাহেবের ছেলে। তাই বলি বাবা, তুমি একটু সাবধানে চলাফেরা করবে। কেননা, তুমি নিশ্চয়ই জানো পুলিশের শত্রুর অভাব নেই। বিশেষ করে বঙ্গভূমির লাগোয়া সিংভূমের ক্রিমিনালদের বাংলা পুলিশের ওপর রাগ থাকাই স্বাভাবিক। কাজেই কার মনে কী আছে কেউ কি বলতে পারে ? আর শশিমাস্টারের ওই মেয়েটাকেও সাবধান করে দেবে। ও যেন রাগের মাথায় একা কিছু করতে না যায়। দুষ্টের দমনের জন্য তো আমরা আছি।"

দারোগাবাবুর হিতোপদেশ কান পেতে শুনল শুভঙ্কর। কিন্তু কিছু বলল না।

দারোগাবাবু আবার বললেন, "আমরা ও-বাড়িতে ঢুকে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখলাম। তোমরা লক্ষ করেছ কিনা জানি না। আমরা দেখলাম, একটি ঘরের চার দেওয়ালেরই প্লাস্টার ছাড়ানো হয়েছে। এবং সদ্য। ও ব্যাপারে তুমি কিছু বলতে পারবে ?"

শুভঙ্কর অবাক হওয়ার ভান করে বলল, "কই না তো। সেরকম কিছু তো দেখিনি।"

"বুঝেছি। আসলে দুষ্কৃতীরা কোথাও থেকে কোনও গুজবটুজব শুনে নির্ঘাত গুপ্তধনের আশা করেছে। তাই ছেলেমেয়ে দুটোকে অপহরণ করার পর বাড়িটা যখন ফাঁকা হয়ে যায়, তখনই বোকার মতো এইসব করে পালিয়েছে।"

পুণ্ডরীককাকা বললেন, "সে যাই করুক, আপনি সার একটু দেখুন, যেন ছেলেমেয়ে দুটো উদ্ধার হয়। বিশেষ করে যখন বোঝাই যাচ্ছে এ-কাজ শিকারি বাজের, তখন যেভাবেই হোক ধরুন ওই শয়তানটাকে।"

দারোগাবাবু বললেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমাদের দিক থেকে যা-যা করণীয় তা করছি।" বলে চলে গেলেন।

এবার পুণ্ডরীককাকা শুভঙ্করকে বললেন, "কিছু মনে কোরো না বাবা, আজ রাতে এইসব ঘটনার পর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কিছু তো করা গেল না। করবেটাই বা কে ? দেখছ তো কাকিমার অবস্থা। তা একটু দুধ আর মুড়ি তুমি খেয়ে নাও।"

কাকিমা অতি-কষ্টে বললেন, "ও-ঘরের তাকে দুটো কলা আছে।"

শুভঙ্কর বলল, "আমি কিচ্ছু খাব না। একে অবেলায় খেয়েছি, তার ওপর যা-সব ঝড়ঝাপটা গেল, তাতে একদম খিদে নেই আমার। আপনি বরং আমাকে ওপরের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসুন।"

boiRboi.blogspot.in

পুণ্ডরীককাকা বললেন, "না না। ও-বাড়িতে একদম নয়। তুমি এখানেই শুয়ে পড়ো।"

"তা হয় না কাকাবাবু। আমাদের কয়েকটা দামি জিনিস ওপরের ঘরে রয়ে গেছে। ঘরটাকে পাহারা দিতে হবে না? তা ছাড়া আমি জানলা-দরজা বন্ধ করে ঘরের ভেতর থাকব। সেরকম বিপদ কিছু বুঝলে ঘর থেকে না বেরিয়ে চেঁচাতে তো পারব। আপনারা বরং একটু সজাগ থাকবেন। আপনি শুধু বিল্টুর টর্চটা ব্যাগ থেকে বের করে আমার হাতে দিন।"

পুণ্ডরীককাকা তাই করলেন। একটা প্লাস্টিকের জাগে করে খাবার জল নিয়ে টর্চ হাতে শুভঙ্করকে দিতে চললেন ওপরের ঘরে। আলো জ্বালবার জন্য একটা দেশলাই দিতেও ভুললেন না।

ওপরের ঘরে একা থাকার ব্যাপারে শুভঙ্করের ভয় যে করছিল না তা নয়। কিন্তু উপায় নেই। একে তো ওই বহুমূল্য ধাতব বিগ্রহকে পাহারা দেওয়ার ব্যাপার আছে, তার ওপর আছে মউয়ের প্রত্যাশা। মেয়েটা যদি সত্যি-সত্যিই এসে হাজির হয় রাত দুপুরে, তা হলে? ওকে না পেয়ে ফিরে যাবে বেচারি। আর যা বদরাগী মেয়ে ও, তাতে হয়তো ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে পড়বে। তা ছাড়া আজকের এই শোকাচ্ছন্ন পরিস্থিতিতে নীচে থাকা একেবারেই অসম্ভব।

পুণ্ডরীককাকা শুভঙ্করকে ওপরের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আলো জ্বেলে বিদায় নিলেন। ফুলের গন্ধে ঘরের ভেতরটা রমরম করছে। পুণ্ডরীককাকা যাওয়ার আগে বলে গেলেন, "কোনও অসুবিধে হলে চেঁচিয়ে ডেকো। আর দরজায় কেউ ধাক্কা দিলে সাড়া না নিয়ে দরজা খুলো না।"

শুভঙ্কর বলল, "তাই করব।" বলে জানলা বন্ধ করে দরজায় খিল দিল। তারপর ঢকঢক করে খানিকটা জল খেয়ে বালিশের তলায় হাত দিয়েই চমকে উঠল। সর্বনাশ। রিভলভারটা তো এখানেই ছিল। গেল কোথায় সেটা? তবে কি পুলিশের লোকেরা যখন ঘরে ঢোকে তখন ওরাই সার্চ করতে গিয়ে হস্তগত করে? কিন্তু তা যদি হত তা হলে নিশ্চয়ই সে-কথা বলত ওকে। এবং এই রিভলভার কীভাবে ওর হস্তগত হল সে-প্রসঙ্গে কিছু-না-কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করত। তা হলে? তা হলে পুলিশ ছাড়া কি দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তির পদার্পণ ঘটেছিল এই ঘরে? শুধু যে রিভলভারটা খোয়া গেছে তা নয়। সেইসঙ্গে আবার গায়েব হয়েছে দাদুর ডায়েরিটা। ওটা তো সযত্নে টেবিলের ওপর রাখা ছিল। কে নিল? শুভঙ্করের চোখে যেন জল এল। শিকারিবাজের লোকেরা যে ওদের অনুপস্থিতিতে এ-ঘরে এসেছে এবং তারাই যে নিয়ে গেছে ওগুলো, তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। ক্ষোভে-দুঃখে এবং ভয়ঙ্কর রাগে অস্থির হয়ে বিছানার ওপর শুয়ে দু'হাতে বালিশটাকে টিপে ধরে তাতে মুখ গুঁজল শুভঙ্কর। ও ঠিক করল রাতে মউ যদি সত্যিই ফিরে আসে, তা হলে ওর সঙ্গে আলোচনা করে এবং কালকের মধ্যে বিল্টু ও তিন্নিকে পাওয়া না গেলে সোজা বাড়ি ফিরে যাবে ও। তারপর বাবার কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলে বাবার হস্তক্ষেপ চাইবে। সোনার গণপতি উদ্ধার হোক না হোক, তাতে ওর কিছু আসে-যায় না। বিল্টু আর তিন্নিকে উদ্ধার করাটাই ওর একমাত্র কাজ। তার পরের কাজ হল শিকারিবাজকে দলবল সমেত গ্রেফতার করানো।

সোনার গণপতির কথা মনে হতেই একটা অন্য আশঙ্কা দেখা দিল ওর মনের মধ্যে। দুর্বৃত্তরা দাদুর ছবিটা খুলে পেছনের সঙ্কেত দেখে ফেলেনি তো ? অথবা ওখান থেকে উদ্ধার করেনি তো গণপতি বিগ্রহকে ? মনে হওয়া মাত্রই ছবির কাছে ছুটে গেল শুভঙ্কর। গিয়ে দেখল, না। ওর আশঙ্কা অমূলক। ছবিটা সরিয়ে সেই সাঙ্কেতিক চিহ্নও দেখতে পেল। ফুলের মালাগুলো মেঝেয় পড়ে ছিল। সেখান থেকে তুলে টেবিলের ওপর রাখল ও। হঠাৎই ওর মনে হল, একা ঘরে সময় তো ওর কাটবে না। এইবেলা দেওয়াল ভেঙে মূর্তিটাকে বের করে রাখলে কেমন হয় ? শিকারিবাজের আজ রাতে পুনরাবির্ভাবের আর কোনও আশঙ্কা আছে বলে মনে হয় না। যদিও আসে ওরা, এ-দরজা শুভঙ্কর খুলবে না কিছুতেই। কাজেই আজ রাতে মূর্তি আবিষ্কার হলেও শিকারিবাজের হাতে পড়ার কোনও আশঙ্কাও নেই।

শুভঙ্কর এক-পা দু'-পা করে ছবির কাছে এগোল। ছবিটা দেওয়াল থেকে খুলে নামিয়ে একপাশে রাখল। তারপর বাশুলিটা হাতে নিয়ে দেওয়ালের কাছে যেতেই এক অজানা ভয়ে বুকটা কেঁপে উঠল ওর। ছবিটা আবার যথাস্থানে রেখে বিছানায় এসে বসল। তারপর বালিশে মাথা রেখে অনন্ত প্রতীক্ষা করল মউয়ের জন্য। এক সময় ঘুমে দু' চোখ বুজে এল ওর। সে কী গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ল শুভঙ্কর,তা ও নিজেও টের পেল না।

ঘুম যখন ভাঙল তখন সকাল হয়ে গেছে। কাক ডাকছে। পাখি ডাকছে। কিন্তু মউ ? মউ কোথায় ? মউ তো এল না। তবে কি ওর কোনও বিপদ হয়েছে ? ঘরে তালা দিয়ে নীচে এল শুভঙ্কর।

পুণ্ডরীককাকা রাতজাগা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, "শশিমাস্টারের মেয়ের খবর শুনেছ ?"

শুভঙ্কর ভয়ে-ভয়ে বলল, "না। আমি তো এই সবে নীচে নামছি।"

"কাল রাতে ও একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসে আছে।"

"তাই নাকি ?"

"সুবর্ণরেখা নদীর ধারে মুখ থুবড়ে পড়ে ছিল ও। সারা শরীর কেটেকুটে একশা হয়েছে। মাথাটাও ফেটেছে বুঝি। ওইটুকু মেয়ে অতখানি একটা ভারী জিনিস সামলাতে পারে কখনও ?"

"তারপর ?"

"তারপর আর কী ? ভাগ্যিস পুলিশের গাড়ি টহল দিচ্ছিল তাই রক্ষে। ধরাধরি করে নিয়ে এসেছে বাড়িতে।"

"বাইকটা ঠিক আছে ?"

"হয়তো আছে। অত আর জিজ্ঞেস করিনি কাউকে।"

"আমি একবার ওর সঙ্গে দেখা করতে চাই কাকাবাবু।"

"বেশ তো, যাও। বেশি দূরে নয়। সোজা গিয়ে বাঁ-হাতি কয়েকটা বাড়ির পরেই যাকে জিজ্ঞেস করবে সে-ই বলে দেবে।"

শুভঙ্কর যাচ্ছিল।

পুণ্ডরীককাকা ডাকলেন, "শোনো !"

ফিরে তাকাল শুভঙ্কর। কাছে এসে বলল, "বলুন।"

pathagar.net

"যদি কিছু মনে না করো, তোমাকে একটা কথা বলব আমি।"

"কিচ্ছু মনে করব না। বলুন আপনি।"

"এই তো দেখছ তুমি এখানকার অবস্থা। তোমার কোনওরকম আদর-যত্ন আমরা করতে পারছি না। তাই বলি কি বাবা, তুমি বরং দুপুরের ট্রেনে বাড়ি ফিরে যাও। না হলে এখানকার যা পরিস্থিতি, তাতে যে-কোনও মুহূর্তে তোমারও একটা ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তুমি বরং ফিরে গিয়ে বিল্টুর বাড়িতে একটা খবর দাও। আর পারো তো তোমার বাবাকেও সব কথা খুলে বোলো। যদিও এই এলাকা তাঁর আওতার বাইরে, তবুও তিনি একজন পদস্থ অফিসার তো। তাঁর সুপারিশের জোরেও হয়তো অনেক কিছু হতে পারে।"

"ও-ব্যাপারে আমিও মনে-মনে ভেবে রেখেছি। অবশ্য আজই আমার যাওয়া হবে কিনা জানি না, তবে আজ না হলে কাল আমি যাচ্ছিই। বিল্টু আর তিন্নির ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। ওদের আমি উদ্ধার করবই।"

"পারবে তো?"

"আজকের দিনটা দেখি, এখানকার পুলিশ কী করে। তারপর কাল আমি বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করে যা হোক একটা ব্যবস্থা করব।"

"নিশ্চিন্ত হলাম। ওই আমার একটিমাত্র মেয়ে। ওকে আমার বুকে আবার ফিরিয়ে এনে দাও বাবা।"

শুভঙ্কর দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হল। তারপর একা-একাই মউদের বাড়িতে এসে হাজির হল ও।

মউ তখন ওদের ঘরের ভেতর তক্তপোশের বিছানায় চুপচাপ বসে আছে। ওর হাতে, পায়ে, কাঁধে লাল ওষুধের দাগ। মাথায় ব্যাণ্ডেজ। দু-একজন প্রতিবেশী খুব বকাবকি করছেন মউকে।

শুভঙ্কর ওদের ঘরে গিয়ে ওর ওই অবস্থা দেখেই বলল, "কী ব্যাপার মউ! খুব জোর অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়েছ শুনলাম?"

মউ হেসে বলল, "খুব জোর আবার কোথায়? সেরকম হলে তো হাসপাতালে থাকতাম।"

মা বললেন, "ছেলেটি কে?"

শুভঙ্কর। তুমি চিনবে না।"

"ও, বুঝেছি। বিল্টুর সঙ্গে যে এসেছে?" বলেই শুভঙ্করকে চেয়ার এগিয়ে দিলেন, "বোসো বাবা।"

শুভঙ্কর বসল। তারপর বলল, "কীভাবে দুর্ঘটনাটা ঘটল শুনি?"

মউ বলল, "আসলে অন্ধকারে একটু উঁচু-নিচু জায়গায় টাল সামলাতে না পেরে উলটে গেছি। তবে আমার এইসব ব্যাণ্ডেজ-ফ্যাণ্ডেজ দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সামান্য একটু কেটে-ছিঁড়ে গেছে। শুধু কপালটায় জোর লেগেছে। মাথা ফাটেনি কী ভাগ্যি। একটু ডিপ হয়ে কেটে গেছে এই যা। ইনজেকশান নিয়েছি। ওষুধ খাব। সব ঠিক হয়ে যাবে। এসব আমার কাছে নতুন কিছু নয়।"

শুভঙ্কর বলল, "মোটরবাইকটা? সেটা ঠিক আছে তো?"

"আছে। তবে বুদ্ধুটার কাছে আমি মুখ দেখাতে পারব না। নতুন বাইক

ওর। কিছুতেই দেবে না। কীভাবে ওর কাছ থেকে চেয়ে এনেছি তুমি তো জানো ?"

"বাইকটা কোথায় ?"

"খবর পেয়ে বুদ্ধুই এসে নিয়ে গেছে।"

"রাগ করেনি তো ?"

"করলেই বা কী করা যাবে ? এবার বলো দেখি তুমি আমার ওপর রাগ করেছ কি না ? কাল রাতে আসব বলে এলাম না। সারারাত তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করেছ নিশ্চয়ই ?"

"হ্যাঁ ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে অপেক্ষা করেছিলাম।"

মউ হেসে বলল, "বেশ করেছ।" তারপর বলল, "ও-বাড়িতে চা-টা তো কিছু খাওয়া হয়নি ?"

"না, তা হয়নি। তবে খাবার ইচ্ছেও নেই।"

"বাজে কথা ছাড়ো। সকালবেলা একটু চা না খেলে হয় ?" বলে মাকে শুভঙ্করের জন্য একটু চা করতে বলল মউ। তারপর বলল, "জানো তো মা, শুভঙ্করের বাবা পুলিশের একজন বড় অফিসার। এরা এখানে কিছু করতে না পারলে আমি ওর বাবার সঙ্গে দেখা করব। এই শয়তান শিকারিবাজকে ফাঁসির মঞ্চে আমি তুলবই।"

মা সে-কথার উত্তর না দিয়ে নীরবে চোখের জল মুছে চা করতে বসলেন।

মউ বলল, "আমি দুপুরবেলা তোমার ওখানে যাব। কয়েকটা বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করতে হবে। আর ওদের ফিরে আসার অপেক্ষা না করে আসল জিনিসটাকে ওখান থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।"

"আমিও তাই ভাবছিলাম। কাল সন্ধের পর ঘর খোলা রেখে আমি যখন তোমার সঙ্গে বেরিয়েছিলাম, সেই ফাঁকে ওরা এসে দাদুর ডায়েরি এবং রিভলভারটা চুরি করে নিয়ে গেছে।"

মউ যেন শিউরে উঠল কথাটা শুনে, "সে কী !"

"হ্যাঁ। কাজেই ওই মূর্তির ব্যাপারে আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে এবার।"

মা এসে চা দিলেন।

চা খেতে-খেতে আরও কিছুক্ষণ মউয়ের সঙ্গে গল্প করল শুভঙ্কর। ওর মায়ের সঙ্গেও দু-চারটে কথা বলল। খুবই নিরীহ প্রকৃতির ভদ্রমহিলা। কিন্তু তাঁর মেয়ে যে কী করে এত ডানপিটে হল তা যেন ভাবা যায় না।

মউদের বাড়ি থেকে ফিরে শুভঙ্কর আপন মনেই ঘুরে বেড়াতে লাগল চারদিকে। শালবনের ভেতর ঢুকে আদিবাসী মেয়েদের শালবীজ সংগ্রহ দেখল। কেউ-বা পাতা কেটে গোছ করছে। দোকানে-দোকানে যাবে এগুলো। ও তাদের সঙ্গে আলাপ করে মনের কোণে জমে থাকা অনেক প্রশ্নের উত্তর নিল। তারপর উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে-ঘুরতে অনেক দূরে গিয়ে দূরের পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। তিন্নি ওকে পাহাড় দেখাবে বলেছিল। বাসাডেরা বুরুডিপাস হয়ে নিয়ে যাবে বলেছিল ধারাগিরিতে ঝরনা দেখাতে। সেই তিন্নি এখন কোথায় কী করছে কে জানে ? আর বিল্টু ! সে কি বেঁচে

আছে ? এইসব মনে হতেই মনে-মনে খুব ভয় পেল শুভঙ্কর। ও জঙ্গলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে ঘরের দিকে চলল।

চারদিকে ঘুরে অনেক বেলায় এসে স্নান-খাওয়া সেরে শুভঙ্কর যখন ওপরের ঘরে ঢুকল দুপুর তখন দুটো। দরজায় খিল দিয়ে টেবিলের ওপর রাখা বাসী ফুলের মালাগুলো হাতে নিয়ে একটু গন্ধ শুঁকে সেগুলো দাদুর ছবির গলায় পরিয়ে বিছানায় এসে শুল।

সবে একটু তন্দ্রা-মতন এসেছে এমন সময় দরজায় ঠকঠক শব্দ। কে ? কে ডাকে ?

শুভঙ্কর উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই অবাক। মউ দাঁড়িয়ে আছে।

শুভঙ্কর একগাল হেসে বলল, "আরে তুমি ! আমি ভাবি কে না কে ?"

মউ গম্ভীর মুখে বলল, "তুমিই ডোবাবে। কী যে আছে কপালে তা ভগবান জানেন। তোমাকে নিয়ে কিছু করতে যাওয়াও যা, অথৈ জলে তলিয়ে যাওয়াও তাই।"

"কেন ? এ-কথা বলছ কেন ?"

"কেন বলছি সে-কথা বললেই তো রাগ হয়ে যাবে তোমার। তোমাকে না হাজারবার বলেছি কেউ দরজায় টোকা দিলে সাড়া না দিয়ে দরজা খুলবে না।"

"আরে সে তো রাতের বেলায়। এখন কী ?"

"কোনও সময়েই না। সাবধানের মার নেই এ-কথা জানো না বুঝি ?"

"এসো, ভেতরে এসো।"

মউ ভেতরে ঢুকেই বলল, "শোনো, আজ এক্ষুনি আমাদের মূর্তি উদ্ধারের কাজে লেগে পড়তে হবে। তারপর প্রথম কাজ হবে বিল্টু ও তিন্নিকে খুঁজে বের করা। কাল আমি নদীর ধারে গিয়েছিলাম শুধুমাত্র ভিজে মাটির বুকে মোটরের চাকার দাগ দেখে। আমার মনে হয় ওরা ধরা পড়বার ভয়ে সড়ক পথে না গিয়ে জলপথে পাচার করেছে ওদের। আমি আরও খোঁজ নিতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পড়ে গিয়ে মাথায় এমনই চোট পাই যে, কেমন যেন হয়ে যাই।" বলেই দরজায় খিল দিতে গেল।

শুভঙ্কর বলল, "খিল দেওয়ার দরকার নেই। নীচের দরজাটা কি খোলা আছে ?"

"হ্যাঁ।"

"আগে ওটাকে বন্ধ করে দিয়ে এসো। না হলে হঠাৎ করে যদি কাকা-কাকিমা কেউ এসে পড়েন, তা হলে কিন্তু মুশকিল হয়ে যাবে।"

শুভঙ্করের বলা কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই দরজা খুলে দু'জন লোক ঘরে ঢুকে পড়ল। ঢুকেই বলল, "একদম চেঁচাবে না। নীচের দরজা আমরা বন্ধ করে দিয়ে এসেছি। কাজেই কেউ আর ওপরে উঠবে না। এখন ভালয়-ভালয় লক্ষ্মী ছেলের মতো বলো দিকি, জিনিসটি কোথায় আছে ?"

শুভঙ্কর ওদের দু'জনকেই চিনতে পারল। ওরাই তো সেই কুখ্যাত শিকারি বাজের দলের লোক। ট্রেনের কামরায় যারা ছোরা হাতে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। বলল, "কী জিনিস ?"

"আরে ! তুমি একজন পুলিশ অফিসারের ছেলে হয়ে কি না এইরকম বোকার মতো প্রশ্ন করছ, কী জিনিস ? যে জিনিসটি উদ্ধারের জন্য তোমরা এখানে এসেছ, সেই জিনিস। ওই সোনার গণপতি। যাঁর চোখ দুটো নাকি হিরের। দুর্লভ সামগ্রী। কী বলো ?"

"সে-জিনিস কোথায় তা আমরা কী করে জানব ?'

"ওই ডায়েরির লেখা পড়ে আমরা কিন্তু সব কিছু জেনে ফেলেছি। অতএব আমাদের কাছে লুকিয়ে কোনও লাভ নেই।"

শুভঙ্কর হেসে বলল, "আরে ! কী বোকা তোমরা। ওটা তো পুরনো ডায়েরি। ও জিনিস কবেই উদ্ধার হয়ে গেছে। তোমরা ওই জিনিসের লোভে এসছ নাকি ?"

"বাজে কথা একদম বলবে না। যদি তোমরা সত্যিই ওই জিনিসের ধান্দায় না এসে থাকো তা হলে কাল সারাটা দুপুর ধরে পাশের ঘরের প্লাস্টারগুলো খসালে কেন শুনি ?"

শুভঙ্কর ও মউ এ-কথার কোনও উত্তরই দিতে পারল না। এই শয়তান লোকগুলো যে ওদের এইভাবে ফলো করবে তা ওরা ভাবতেও পারেনি। ঘরের ভেতর চার দেওয়ালের মধ্যেই ওরা নিজেদের নিরাপদ মনে করেছিল। এখন ওরা পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকাল। তারপর তাকিয়ে দেখল সেই লোক দুটোর দিকে। কী ভয়ানক চেহারা তাদের ! একেবারে জহ্লাদের মতো না হলেও ভয়ানক। দুর্ধর্ষ এবং বলবান। বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের বেশি নয়। ওদের দু'জনের হাতেই রিভলভার। তারই নল দুটো ওদের বুকে ঠেকিয়ে বলল, "কোনওরকম ছল-চাতুরি না করে বলে ফ্যালো দেখি বাছাধনরা, আসল জিনিসটি কোথায় আছে ? না হলে কিন্তু বিপদ হবে। আমরা হয় সোনার গণপতি নিয়ে যাব, না হলে নিয়ে যাব তোমাদের দুটি তাজা প্রাণ। কিন্তু আমরা চাই না যে তোমাদের এমন সুন্দর চেহারা দুটি এত তাড়াতাড়ি চিতার আগুনে ঝলসে যাক।"

শুভঙ্কর বলল, "তোমরা বিশ্বাস ক'রো, আমরা সত্যিই জানি না ও-জিনিস কোথায় আছে।"

"তা যদি না-ই জানো তা হলে এই ঘরের ভেতর শাবল, বাশুলা এগুলো এনেছ কেন ?"

"আসলে ওই ডায়েরির লেখা পড়ে আমরাও ওগুলো খুঁজছি। তাই তো পাশের ঘরের প্লাস্টার খসিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি চারদিক। কিন্তু ও জিনিস যে আমরা পাইনি তা নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পেরেছ।"

"পেরেছি। এখন তা হলে ওই ঘর ভেঙেচুরে এই ঘরে হাত দিতে চলেছ তোমরা। ঠিক আছে। এ-ঘরের প্লাস্টার আমরাই ছাড়াব।"

এমন সময় নীচের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল। সেইসঙ্গে শোনা গেল পুণ্ডরীককাকার গলা, "শুভঙ্কর ! শুভঙ্কর ! দরজা খোলো।"

ঘরের ভেতর যারা ছিল তারা শুভঙ্কর ও মউকে বলল, "খুব সাবধান। চেঁচিয়েছ কি মরেছ।"

শুভঙ্কর বলল, "কিন্তু সাড়া না দিলে উনি যে অন্যরকম ভাববেন।"

pathagar.net

একজন বলল, "ঠিক আছে। তুমি সাড়া দাও। জিজ্ঞেস করো, কী চাই ?"

শুভঙ্কর ওখান থেকে চেঁচিয়ে বলল, "আমাকে ডাকছেন কাকাবাবু ?"

"হ্যাঁ। একবার নীচে এসো।"

"কী দরকার বলুন না ?"

"তুমি নীচের দরজায় খিল দিয়েছ কেন ? দারোগাবাবু এসেছেন। একবার দেখা করতে চান তোমার সঙ্গে।"

আগন্তুকদের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল এবার। তবুও সাহস করে একজন বলল, "যাও। দেখা করে এসো। তবে সাবধান। ভুলেও যেন আমাদের কথা পুলিশকে বলবে না। তা হলে এখনকার মতো তুমি বাঁচলেও তোমার এই সঙ্গীনিকে কিন্তু আমরা মেরে রেখে যাব। বরং চেষ্টা করবে যাতে ওরা ওপরে না ওঠে।" বলেই অপর সঙ্গীকে বলল, "তুই এই মেয়েটাকে নিয়ে ছাদে চলে যা ভচু। গিয়ে শিকল তুলে দিবি। বাঁ দিকের আলসের সঙ্গে একটা নাইলনের ফিতে বাঁধা আছে। বেগতিক বুঝলে মেয়েটাকে গুলি করেই পালাবি।" বলে শুভঙ্করকে বলল, "আমাদের সঙ্গে কোনওরকম চালাকি করবার চেষ্টা করবে না। যদি করো তা হলে দিনের আলোর মতো এই সত্যটুকু জেনে রেখো, তোমাদের দু'জন একটিমাত্র বুলেটের কৃপায় এক লহমায় একজন হয়ে যাবে। কেননা, পুলিশ যদি জানতে পারে আমরা এখানে আছি তা হলে ধরা আমরা পড়বই। আর ধরা যদি পড়ি তা হলে অপরাধ না করে ধরা পড়ব না।"

পুণ্ডরীককাকা আবার ডাকলেন, "শুভঙ্কর ! একটু তাড়াতাড়ি এসো। এত দেরি করছ কেন ? দারোগাবাবু অপেক্ষা করছেন।"

শুভঙ্কর বলল, "আজ্ঞে যাই।" বলে তরতরিয়ে নীচে নেমে গেল।

ভচু তখন মউকে টানতে-টানতে নিয়ে চলল ওপরের ছাদে। পাছে শুভঙ্করের ক্ষতি হয় সেজন্য মউ কোনওরকম বাধা দেওয়ার চেষ্টা করল না। ভচু যাওয়ার সময় তার সঙ্গীকে বলে গেল, "তুই ছেলেটার দিকে একটু নজর রাখ কড়ি। যদি উলটোপালটা কিছু বলে তা হলে দিবি ডিসুম করে। তারপর যা হয় হবে।"

কড়ি বলল, "ওর ব্যাপারটা আমি দেখছি।" বলে শুভঙ্করের পিছু-পিছু এসে রিভলভার রেডি রেখে কান খাড়া করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল দরজার আড়ালে। তারই ফাঁকে পালাবার পথটাও বেছে নিল। অর্থাৎ গুলি করেই দরজায় খিল দিয়ে উঠে যাবে ছাদে। তারপর ছাদের ওপর আর-একটা গুলি খরচা করে নাইলনের ফিতের সাহায্যে নেমে যাবে নীচে। পুলিশ যখন দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করবে ওরা তখন শালবনের আগাছার ঝোপে লুকিয়ে রাখা বাইকটা নিয়ে পৌঁছে যাবে অনেক দূরে।

শুভঙ্কর নীচে নেমে বাইরে আসতেই দেখল একজন কনস্টেবলসহ দারোগাবাবু দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে। অনেকটা দূরে ঘেরা-পাঁচিলের দরজার কাছে অপেক্ষা করছে একজন ড্রাইভার, পুলিশের একটি জিপ নিয়ে। দারোগাবাবু বললেন, "কী ব্যাপার ! এত দেরি হল কেন ? কী করছিলে ওপরের ঘরে ?"

শুভঙ্কর বলল, "কিছু না। আসলে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম একটু।"

"যাক, ভাল কথা। তোমার বাবার সঙ্গে আমরা ফোনে যোগাযোগ করেছি। উনি সব শুনে তোমাকে বাড়ি চলে যেতে বলেছেন। তুমি এক্ষুনি আমার সঙ্গে চলে এসো। সন্ধেবেলা ঘাটশিলা থেকে ডাউন ইস্পাত এক্সপ্রেসটা ধরিয়ে দেব তোমাকে। আমাদের একজন লোকও তোমার সঙ্গে যাবে।"

"কিন্তু।"

"কোনও কিন্তু নয়। হাওড়া স্টেশনে পুলিশের গাড়ি থাকবে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবার জন্য। তোমার জিনিসপত্র কী আছে নিয়ে এসো।"

শুভঙ্কর বলল, "কিন্তু আমার পক্ষে তো এখন এই মুহূর্তে চলে যাওয়া সম্ভব নয়। আসলে আমি বড় ক্লান্ত। আজকের রাত্রিটুকু আমি এখানে বিশ্রাম নিই। তারপর কাল সকালে আমাকে যেখানে যেতে বলবেন যাব।"

"তা হলে শোনো, তোমার যাওয়া-না-যাওয়ার ব্যাপারটা এখন আর আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। ওপরওয়ালার হুকুম। আমরা পালন করছি মাত্র। তা ছাড়া এই পরিবেশে আর একটি রাতও তোমার একা থাকা ঠিক নয়। কিছু হলে আমরা অভিযুক্ত হব। অতএব...।"

"অতএব আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে যেতে হবে। এই তো?"

"ঠিক তাই।"

শুভঙ্কর এই মুহূর্তে কী যে করবে কিছু ভেবে পেল না। এখন ওর চলে যাওয়া মানেই মউটাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে যাওয়া। অথচ পুলিশকে আসল সত্য বলতে যাওয়াও বিপদ। শিয়রে শমন রিভলভারে গুলি পুরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

শুভঙ্কর ভেবে পেল না পুলিশ ওর বাবার সন্ধান কী করে পেল। ও তো একবারও ওর বাবার পোস্টিং কোথায় তা জানায়নি কাউকে। শুধু নামটুকুই যা বলেছিল। তাতেই এই? তা হলে এই পুলিশরা চোর-ডাকাত ধরতে এত ব্যর্থ কেন?

দারোগাবাবু বললেন, "তাড়াতাড়ি করো। আমার হাতে বেশি সময় নেই। তোমাকে ট্রেনে চাপিয়ে আমাকে একবার গালুডি যেতে হবে।"

"গালুডি কী?"

"সে একটা জায়গার নাম। ওখানে সাতগুড়ুম নদীর ধারে একটা লাশ পাওয়া গেছে। সেটার ব্যাপারে...।"

শুভঙ্কর কথা না বাড়িয়ে নীরবে মাথা হেঁট করে ঘরে ঢুকল। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠার সময় বেশ বুঝতে পারল দরজার আড়ালে ওত পেতে থাকা কড়ি নামের সেই দুর্বৃত্ত রিভলভার বাগিয়ে নিঃশব্দে ওর পিছু-পিছু আসছে।

শুভঙ্কর ওপরে উঠেই বলল, "পুলিশকে তোমাদের কথা আমি কিছুই বলিনি।"

"শুনেছি। আমার মনে হয় এইটাই ভাল হল। এবারের ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। তবে সাবধান। এখান থেকে চলে গিয়ে রাস্তার মাঝখানে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে পুলিশকে যেন এখানকার কথা ফাঁস করে দিও না।"

"জানি। তা হলে [illegible]য়ার জন্য মউকে তোমরা বাঁচিয়ে রাখবে না

pathagar.net

এই তো ?"

"ঠিক তাই। আজ সারারাত ধরে আমরা এই ঘর ভেঙেচুরে দেখব কোথায় লুকনো আছে সেই অমূল্য ধন।"

"মেয়েটার ব্যবস্থা কী করবে ?"

"ওর ক্ষতি করার কোনও নির্দেশ আপাতত আমাদের ওপর নেই। ও যদি কোনও গোলমাল না করে তা হলে কাজ শেষ হলেই মুক্তি দেব ওকে।"

শুভঙ্কর বলল, "আচ্ছা, আমাদের সেই ছেলেমেয়ে দুটির খবর কী ? ওরা কোথায় আছে ? ওদের তোমরা নিয়ে গেলে কেন ?"

"শিকারিবাজের হুকুম। তাই নিয়ে গেছি। এখানে আমাদের ইচ্ছেয় কিছু হয় না। উনি যা বলেন আমরা সেইমতো কাজ করি।"

শুভঙ্কর বলল, "কিন্তু কেন ? কেন তোমরা ওর কথায় ওঠো-বসো ?"

"সেটা কিন্তু আমরাও জানি না। তবে হুকুম মানতে-মানতে কখন যে আমরা ওর আজ্ঞাবহ হয়ে গেছি নিজেরাও টের পাইনি তা।"

শুভঙ্কর বলল, "আমি তো দেখেছি শিকারিবাজকে। তোমাদেরও দেখছি। তখনও দেখেছি। এখনও দেখছি। ওর চেয়ে ঢের বেশি শক্তিমান তোমরা। আর শিকারিবাজ ? সে তোমাদের চেয়ে অনেক দুর্বল।"

কড়ি হাঁ করে শুভঙ্করের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

শুভঙ্কর বলল, "তবু ওর পায়ে দাসখত লিখে দিতে তোমাদের বিবেকে বাধছে না ?"

কড়ি বলল, "বাধে। তবে কী জানো, শিকারিবাজ এককভাবে আমাদের কাছে কিছু নয় যদিও, তবুও ও একটা ক্রিমিনাল। আমরাও তাই। তবে ওর লোকবল বেশি। কোথায় যে ছদ্মবেশে ওর কোন বন্ধু আত্মগোপন করে আছে তা তো জানি না। তাই আমরা ওকে ভয়ে ভক্তি করি।"

শুভঙ্কর বলল, "যদি আমার কথা শোনো তা হলে বলি, ওই সোনার গণপতি সত্যিই যদি ইতিমধ্যে তোমাদের হস্তগত হয় তা হলে ডায়েরির নির্দেশ অনুযায়ী ওকে তোমরা যথাস্থানে দিয়ে এসো। কেননা, অভিশাপের বোঝা আর বাড়িও না। পারো তো যাওয়ার আগে একটি বুলেট খরচা করো ওই নরহন্তা শিকারিবাজের জন্য। এতে তোমাদের মঙ্গল হবে।"

কড়ি বলল, "তুমি বেশ ভাল কথা বলো তো ভাইটি। তুমি প্রকৃতই বুদ্ধিমান। তবে শোনো, ওই সোনার গণপতি সত্যিই যদি আমরা উদ্ধার করতে পারি তা হলে রাবণ হ্রদে নয়, রাবণ হ্রদ ডিঙিয়েও আরও দূরে-দূরান্তরে চলে যাব আমরা। যেখানে শুধু শিকারিবাজ কেন, ওর মৃত বাবাও আমাদের নাগাল পাবে না।"

শুভঙ্কর বলল, "গণপতি তোমাদের সুবুদ্ধি দিন। কিন্তু ওই শয়তান শিকারিবাজের কী হবে ?"

"মৃত্যু। যাওয়ার আগে আমরাই ওর গোপন ঘাঁটির কথা পুলিশকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে যাব। তা হলে হবে কি, পুলিশ আমাদের পিছু নেওয়ার বদলে ওকে খুঁজে বের করার দিকেই নজর দেবে বেশি। আর সেই সুযোগে আমরাও যেদিকে দু'চোখ যায় পালিয়ে যাব।"

pathagar.net

শুভঙ্কর বলল, "সত্যিই যদি তোমরা সে-কাজ করতে পারো, তা হলে জানব, তোমরা আমাদের শত্রু নও। অন্তত তোমরা দু'জন। তার কারণ, আমরা চাই শিকারিবাজ ধ্বংস হোক। কাজেই, যে-লোক তার সর্বনাশের কথা চিন্তা করবে, যে-লোক তার ক্ষতি করতে এগিয়ে আসবে, সে কখনও আমাদের বন্ধু ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।"

"তা হলে এইবার বন্ধুর মতো বলে ফ্যালো দেখি ওই সোনার গণপতি কোথায় আছে?"

"এখনও তোমার অবিশ্বাস? বললাম তো জানি না। তোমাদের মতো আমরাও খুঁজছি। তোমরা ভাল করে খোঁজো, ঠিক পেয়ে যাবে। তবে বন্ধু! একবার শুধু বলো, আমার বন্ধু বিল্টু আর তিন্নি কোথায়?"

কড়ি একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "সে-কথা জেনে লাভ কী বলো? তোমার বন্ধু বিল্টুকে শিকারিবাজ চিলকিগড়ের জঙ্গলে বন্দী করে রেখেছে। সোনার গণপতি ওর হাতে এলেই কনকদুর্গার মন্দিরে বলি দেবে ওকে।"

"সে কী! তিন্নি! তিন্নির কী হবে তা হলে?"

"তা তো বলতে পারছি না। এমনকী তাকে যে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে ওরা, তাও জানি না। তবে এটুকু জেনে রেখো, সোনার গণপতি কোথায় আছে তা জানবার জন্য অকথ্য অত্যাচার হচ্ছে ওদের ওপর।"

শুভঙ্কর বলল, "ওদের খবর দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। আমি কালই আমার বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করে যেভাবেই হোক, উদ্ধার করব ওদের। তোমরাও আজ রাতের মধ্যে যা করবার তা করে নাও।"

এমন সময় নীচে থেকে দারোগাবাবুর গলা শোনা গেল, "কী হল শুভঙ্কর! এত দেরি করছ কেন? বেশি দেরি হলে ট্রেন ফেল হয়ে যাবে কিন্তু।"

শুভঙ্কর বলল, "আমার ডাক পড়েছে। আমাকে যেতে হবে। দোহাই বন্ধু! তোমরা মউয়ের ক্ষতি কোরো না। ওকে কোনও কষ্ট দিও না।"

"তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।"

"তোমার কথা বিশ্বাস করলাম। কিন্তু আমি কি একবার ওর সঙ্গে দেখা করতে পারি?"

"না। তাতে দেরি হয়ে যাবে। তা ছাড়া আমার সঙ্গী ভচুও হয়তো এ-ব্যাপারটা খুব একটা ভালভাবে মেনে নেবে না।"

"তা হলে ওকে বলে দিও পুলিশ জোর করে আমাকে নিয়ে গেছে। না হলে ও হয়তো আমাকে ভুল বুঝবে।"

"ঠিক আছে, যাও।"

শুভঙ্কর আর একটুও দেরি না করে নীচে নেমে এল। পুলিশের গাড়ি অপেক্ষা করছিল ওর জন্য। ও পুণ্ডরীককাকা ও কাকিমাকে প্রণাম করে বলল, "আপনারা কিছু ভাববেন না। আমি বাবাকে নিয়ে শিগগির ফিরে আসছি। বাবা যদি এই খবর পেয়ে বাড়ি এসে থাকেন, তা হলে কালই সকালের ট্রেনে আবার আমি ফিরে আসব।"

পুণ্ডরীককাকা ও কাকিমা শুভঙ্করকে চোখের জলে বিদায় দিয়ে বললেন, "তাই এসো বাবা।"

pathagar.net

পুলিশের গাড়ি গ্রামের পথ ছেড়ে বম্বে রোডে এসে পড়ল।

শুভঙ্করের মানসিক অবস্থাটা তখন এমনই যে, তা কাউকে বলে বোঝানো যাবে না। কেননা, মউকে ওইভাবে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে স্বার্থপরের মতো চলে যেতে কী কষ্ট যে হচ্ছিল ওর তা একমাত্র ভগবানই জানেন। ওর বুকের মধ্যে একটা অসহ্য ছটফটানি ওকে যেন অস্থির করে তুলল। অথচ মজাটা এই, এসব কথা পুলিশকে বলা যাবে না। বললে হয়তো ভচু আর কড়ি নামের দুই শয়তানকে এক্ষুনি হাতেনাতে ধরে ফেলা যাবে কিন্তু পরিণামে পাওয়া যাবে প্রাণচঞ্চল মউয়ের রক্তাক্ত মৃতদেহ। ওরা শুধু একবার নয়, একাধিকবার বলেছে বিশ্বাসঘাতকতা করলে ওদের পিস্তল থেকে একটিমাত্র গুলি খরচ করতে এতটুকুও কার্পণ্য করবে না ওরা। শুভঙ্করের মাথার ভেতরে যেন ঝিমঝিম করতে লাগল। এত স্বপ্নের, এত আশার সোনার গণপতি, সে যে কার ভাগ্যে আছে তা কে জানে? এত কাণ্ডের পর সত্যিই কি সেটা বেহাত হয়ে যাবে? ওদের মনে তো কোনও কুমতলব নেই। তা হলে? তা হলে কেন ওই অভিশপ্ত বিগ্রহ ওদের ধরা দিচ্ছেন না? তিনি সিদ্ধিদাতা। তাঁর তো উচিত ওদের মনোবাসনা সিদ্ধ করা। কিন্তু ওই দুষ্কৃতীরা! ওরা যদি একবার ওই জিনিস হাতে পায় তা হলে ভেঙেচুরে খুবলেখাবলে কী যে অবস্থা করবে ওরা তা কে জানে? আর ওই চিলকিগড়ের জঙ্গল? তাই বা কত দূরে? ওর তো মানচিত্র-জ্ঞান নেই এই অঞ্চলের। সেই জঙ্গলে কোথায় যে কনকদুর্গার মন্দির তা কে জানে? যূপকাষ্ঠে বলির পশুর মতো মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে যে বিল্টু, তাকেই-বা ও উদ্ধার করবে কী করে? ও যদি পুলিশকে বলেও ফ্যালে সে-কথা, তা হলেই কি পুলিশ বিশ্বাস করবে? বরং চাপের পর চাপ দিয়ে বারবার জানতে চাইবে কোথা থেকে এবং কীভাবে এই কথা জানতে পারল শুভঙ্কর। আর তখনই ফাঁস হয়ে যাবে সব কিছু। তখনই গুলিবিদ্ধ মউয়ের বুক থেকে রক্ত ঝরবে ঝরঝর করে। তারপর···। আর ভাবতে পারে না শুভঙ্কর।

ওদের জিপটা হাওয়ার গতিতে উড়ে চলেছে ঘাটশিলার দিকে। যেতে-যেতে হঠাৎই দেখল শুভঙ্কর দূরে বহু দূরে আকাশ, পাহাড় ও শালবন যেখানে এক হয়ে গেছে, সেইখানে এক উচ্চস্থানে হিল কার্টের রুপোলি ফিতের মতো ঢালু পথ বেয়ে লাল রঙের একটা বাইক নিয়ে কে যেন দুরন্ত গতিতে এগিয়ে আসছে। খুব ভাল করে তাকে লক্ষ করল শুভঙ্কর। একটু পরেই সে আরও কাছে এগিয়ে আসতেই দেখতে পেল তাকে। ও তো বুদ্ধু! বুদ্ধুদা। ওই তো অমন বেপরোয়ার মতো বাইক নিয়ে ছুটে আসছে। ওকে দেখেই যেন একটু আশার আলো দেখতে পেল শুভঙ্কর। দারোগাবাবুকে বলল, "সার! অনুগ্রহ করে ওই বাইকটাকে থামাবেন? ওই লোকটিকে আমার ভীষণ দরকার। একবার ওর সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দিন।"

"কে ও?"

"আপনি চিনবেন না। খুব ভাল ছেলে। ওর নাম বুদ্ধু।"

"কাল শশিমাস্টারের মেয়ে ওরই মোটরবাইক নিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল না?"

pathagar.net

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বুঝেছি। এ তো তামুকপালের ফ্যাক্টরিতে কাজ করে। সেখান থেকেই আসছে বোধহয়। সাট্টা আর জুয়া ছাড়া কিছুই বোঝে না বাছাধন। রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত গ্যাঙকুলিগুলোর সঙ্গে তাসের জুয়া খেলে।"

"যে যা করে করুক। ওকে আমার চাই। খুব দরকার। একবার ওকে থামান।"

পুলিশ সঙ্গে-সঙ্গে হাত দেখিয়ে গতি রোধ করল বুদ্ধুর। বুদ্ধু একটা ঝাঁকানি দিয়ে বাইকটা থামাল। ওর গা বেয়ে তখন দরদর করে ঘাম ঝরছে। লাল বাইকের সিটে গোল কালো চেহারার বুদ্ধুকে দেখাচ্ছে মন্দ না। ভয়ে ওর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

শুভঙ্কর জিপ থেকে লাফিয়ে নেমেই ছুটে গেল ওর কাছে। তারপর ওর হাত ধরে ওকে একটু দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল, "তুমি এদিকে কোথায় গিয়েছিলে বুদ্ধুদা?"

"কাজে গিয়েছিলাম। তামুকপালে।"

"এদিকে যে সর্বনাশ হয়ে গেছে।"

"কেন! কী হল?"

"মউয়ের খুব বিপদ।"

"সে কী!"

দারোগাবাবু বললেন, "শুভঙ্কর! তুমি কিন্তু নানা অছিলায় খুব দেরি করছ। যাওয়ার ব্যাপারে তোমার দেখছি একদম গা নেই। এর পরে ট্রেন না পেলে কিন্তু যাচ্ছেতাই ব্যাপার হয়ে যাবে একটা।"

শুভঙ্কর বলল, "কিচ্ছু হবে না।"

"তুমি তো এক কথায় বলে দিলে কিচ্ছু হবে না। কিন্তু আমি কি কৈফিয়ত দেব?"

শুভঙ্কর বলল, "ধরুন, যে-সময় আপনি আমার খোঁজে গেলেন ঠিক সেই সময় আমি যদি বাড়িতে না থাকতাম? তা হলে কী করে আমাকে নিয়ে যেতেন আপনি?"

"তুমি দেখছি কথার মাস্টার। নাও, তোমার কথাবার্তা যা বলবার একটু তাড়াতাড়ি সেরে নাও।"

শুভঙ্কর বুদ্ধুকে আরও একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বলল, "বুদ্ধুদা, এরা আমাকে জোর করে এক্ষুনি কলকাতায় পাঠিয়ে দিচ্ছে। অথচ আমি যদি এই মুহূর্তে চলে যাই, তা হলে মউকে হয়তো আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। দারুণ বিপদে পড়ে যাবে ও। এদিকে বিল্টু আর তিন্নির কোনও খোঁজ নেই। তবে একটা কথা আমার কানে এসেছে, শিকারিবাজ বিল্টুকে নাকি কনকদুর্গার মন্দিরে লুকিয়ে রেখেছে।"

"বলো কী! কনকদুর্গার মন্দির তো এখান থেকে অনেক দূরে। গভীর জঙ্গলের ভেতর। দিনের বেলাতেও গা-ছমছম করে।"

"সেইজন্যই তো বলছি বুদ্ধুদা, তুমি একটা উপায় বের করো।"

"কী উপায় বের করব বলো? শিকারির সঙ্গে আমি পেরে উঠব না। ওর

pathagar.net

মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিতে গেলে আমাকেই ও মেরে ফেলবে।"

"তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না। তোমার বাইকে আমাকে চাপিয়ে নিয়ে এই মুহূর্তে তুমি পালিয়ে চলো এখান থেকে।"

"তোমার কী মাথা খারাপ হয়েছে? ও কাজ করলে পুলিশ আমাকে রক্ষে রাখবে? তা ছাড়া পুলিশের জিপও তো পিছু নেবে আমাদের। আর আঁকাবাঁকা পথেই যে পালাব তাতেই বা পার কোথায়? ধরা যখন পড়ব তখন পিটিয়ে লাশ বানিয়ে দেবে। এর ভেতরে আমি নেই ভাই। পুলিশের সঙ্গে শত্রুতা আমি চাই না।"

শুভঙ্কর বুদ্ধুর হাত দুটো ধরে বলল, "তোমার কোনও ভয় নেই। কাল সকাল পর্যন্ত তুমি একটু গা-ঢাকা দিয়ে থেকো। তারপর আমি বাবাকে বলে পুলিশ যাতে তোমাকে কিছু না বলে সে-ব্যবস্থা করে দেব। কেননা, এই মুহূর্তে আমি যদি কলকাতায় চলে যাই তা হলে কী যে হতে পারে তা আমিও ভেবে পাচ্ছি না। অবশ্য আমি থেকেও যে খুব একটা কিছু করতে পারব তা নয়। তবে সত্যি বলতে কি, মনের দিক থেকে আমি বড় একা এবং অসহায় হয়ে যাব।"

"তুমি কী বলতে চাইছ বা কেন যে এত ছটফট করছ আমি কিন্তু তার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারছি না।"

"এখনই সেসব কথা তোমাকে বলা যাবে না। তা হলে তো পুলিশকেই বলতাম। পরে অবশ্য তোমাকে সব বলব। প্লিজ, একটু চেষ্টা করো।"

বুদ্ধু এবার গম্ভীর হয়ে একটু কী যেন ভাবল! তারপর বলল, "দ্যাখো, এই পুলিশদের চেয়ে তোমার বাবা উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার, তা আমি জানি। কাজেই তোমার অনুরোধ রক্ষা করতে আমি ভয় পাই না। তবে কী জানো, তোমাকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পর যদি তোমার কোনও বিপদ ঘটে তখন আমি যে তোমার ইচ্ছায় তোমাকে নিয়ে গেছি এ-কথা বোঝাব কাকে? সেই সময় আমার অবস্থাটা কী হবে একবার চিন্তা করে দ্যাখো তো? তবে একটা উপায় আছে।"

"কী উপায়?"

"কোন গাড়িতে যাচ্ছ তুমি?"

"ইস্পাত এক্সপ্রেসে।"

"ঠিক আছে, চলে যাও।" বলে খুব চাপা গলায় শুভঙ্করের কানের কাছে মুখ এনে কী যেন বলল বুদ্ধু।

কথাটা মনঃপূত হল শুভঙ্করের। তাই খুশির আলোকে ভরে উঠল ওর মুখ। বলল, "ঠিক তো?"

"কথা দিলাম। তোমার জন্য এইটুকু আমি করতে পারি। তবে সাবধান। এ-কথা কখনও যেন ফাঁস না হয়।"

পুলিশের জিপ তখন ঘনঘন হর্ন দিচ্ছে।

শুভঙ্কর বুদ্ধুর কাছে বিদায় নিয়ে জিপে উঠল। জিপ ঝড়ের গতিতে তামুকপালের ওপর দিয়ে কাশিদা পার হয়ে রঙ্কিণী মন্দিরের গায়ে ঘাটশিলা থানায় এসে থামল। তখন বিকেল গড়িয়ে গেছে। কিন্তু আকাশের পট থেকে

pathagar.net

দিনের আলো একেবারেই মুছে যায়নি।

॥ ৮ ॥

শুভঙ্করের মন ধলভূমগড়ে পড়ে থাকলেও ঘাটশিলার পরিবেশ কিন্তু ওকে মুগ্ধ করল। চারদিকে পাহাড়ের পাঁচিল, তারই মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে সোনার নদী সুবর্ণরেখা। থানার সামনে একটি দিঘির ধারে খোলা মাঠে আদিবাসীদের হাট বসেছে। আর-এক পাশে চূড়াবিহীন ঘরের মতো মন্দিরে রয়েছেন রঙ্কিণী। এই রঙ্কিণীদেবীর গল্প ওর বাবার মুখে শুনেছে অনেকবার। তাই এই অপূর্ব যোগাযোগে সেই বহুশ্রুত মন্দিরের পাশেই যে থানার মধ্যে ওকে একদিন বসে থাকতে হবে তা ও স্বপ্নেও ভাবেনি।

দারোগাবাবু ঘড়ি দেখে বললেন, "এখনও কুড়ি মিনিট সময় আছে। অবশ্য যদি ঠিক সময়েই গাড়ি আসে। লেট করলে আরও অপেক্ষা করতে হবে।" বলেই টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন, "হ্যালো, ঘাটশিলা স্টেশন! থানা থেকে বলছি...।"

"হ্যাল্লো... হ্যাল্লো...।"

"ডাউন ইস্পাত ট্রেনের ব্যাপারে একটু জানতে চাই।... কী বললেন? আধ ঘণ্টা লেট? ...হ্যাঁ। আচ্ছা। ...না না, আমি নয়, মানে একজন ডি. এস. পি'র ছেলেকে কলকাতায় পাঠানো হচ্ছে।... আচ্ছা-আচ্ছা, পাঠিয়ে দিচ্ছি।" বলে রিসিভার নামিয়ে রেখে টেবিলের ওপর রাখা বেল বাজালেন।

একজন পিওন ঘরে ঢুকল।

"শ্যামলালকো বোলাও।"

পিওন চলে গেলে আলকাতরা দিয়ে বার্নিশ করা বেঁটেখাটো এক যুবক ঘরে ঢুকল, "বলুন সার?"

"শোনো শ্যামলাল, তোমাকে আজই এক্ষুনি একবার কলকাতায় যেতে হবে।"

"সে-খবর আমি অনেক আগেই পেয়ে গেছি।"

"তার মানে তুমি রেডিই আছ। আর শোনো, এইমাত্র স্টেশনমাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে কথা হল। আজ সিনিতে ব্লক ছিল। বি. আর. আই. মিঃ মাথুর সিনি থেকে মউভাণ্ডারে তাঁর মেয়ের বাড়ি এসেছিলেন। উনিও ফিরছেন এই গাড়িতে। তুমি ছেলেটার একটা ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কেটে ওকে মাথুর সাহেবের কাছে বসিয়ে দেবে। আর ওঁর অ্যাটেনডেন্ট পাসটা তুমি ব্যবহার করতে পারবে।"

শ্যামলাল বলল, "তা না হয় করলাম। কিন্তু তাতে লাভটা কী? অ্যাটেনডেন্ট পাসে আমি তো ফার্স্ট ক্লাসে যেতে পারব না। আমাকে বসতে হবে আলাদা বগিতে, দ্বিতীয় শ্রেণীতে।"

"তাই বসবে।"

"তাই যদি হয় তো আমার আর ওর বডিগার্ড হয়ে অতদূর যাওয়ার দরকার কী? ও তো একাই চলে যেতে পারে।"

pathagar.net

দারোগাবাবু এক হাতে কপালের ঘাম মুছে বললেন, "ও মাই গড। ঠিক বলেছ তুমি। আসলে আমার মাথাটাই গেছে গোলমাল হয়ে! তুমি ওকে নিয়ে টিকিট কেটে সেকেন্ড ক্লাসেই যাও। আর দেরি কোরো না। রাতটা ওদের বাড়িতে কাটিয়ে কাল সকালের গাড়িতে ফিরে আসবে কিন্তু। যাও, স্টেশনে চলে যাও।"

শুভঙ্কর শ্যামলালের সঙ্গে থানার বাইরে এল। এসে বলল, "যদি কিছু মনে না করেন, রঙ্কিণী দেবীকে একবার প্রণাম করে যেতে পারি কী?"

"নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই। অতি অবশ্যই। বড় জাগ্রত দেবী। যাও, প্রণাম করে এসো।"

শুভঙ্কর মন্দিরের ভেতরে ঢুকল।

নাটমন্দির পার হয়ে একেবারে ভেতরে ঢুকে দেবী রঙ্কিণীকে প্রণাম করল শুভঙ্কর। তারপর জোড়হাতে প্রার্থনা করল, "মা, মাগো! আমাদের বিপদ কাটিয়ে দাও মা। বিল্টু, তিন্নি আর মউয়ের যেন কোনও ক্ষতি না হয়। আর সোনার গণপতি যেন আমরাই উদ্ধার করতে পারি।"

রঙ্কিণী ওর ডাক শুনতে পেলেন কি না কে জানে, তবে পূজারী ব্রাহ্মণ এগিয়ে এসে ওর ভক্তি দেখে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "কী নাম তোমার?"

"আমার নাম শুভঙ্কর।"

"কোথায় থাকো? এখানে দেখিনি তো কখনও?"

"আমি থাকি কলকাতার কাছে। হাওড়ায়। আমাকে একটু চরণামৃত দিন।"

ব্রাহ্মণ শুভঙ্করকে চরণামৃত দিলেন। সেইসঙ্গে দেবীর প্রসাদী ফুলও একটু। শুভঙ্কর ফুলটা পকেটে রেখে চরণামৃত খেয়ে মাথায় হাত মুছে মন্দিরের বাইরে এল। সেখানে বিশাল হাড়িকাঠে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। শুভঙ্কর বাবার মুখে আগেই শুনেছে এখানে প্রতিবছর মহানবনীর দিন মহিষ বলি হয়। প্রণাম-পর্ব শেষ করে শুভঙ্কর শ্যামলালকে বলল, "চলুন।"

শ্যামলাল একটা গাড়িতে উঠে কোনও দরদাম না করেই বলল, "স্টেশন।"

গাড়ি এগিয়ে চলল।

এখান থেকে ঘাটশিলা স্টেশন খুব একটা বেশি দূরে নয়। স্টেশনে চলে এল ওরা।

শ্যামলাল কাউন্টারে গিয়ে দুটো টিকিট কাটল। তারপর বলল, "এখনও হাতে একটু সময় আছে। যদি খিদে পেয়ে থাকে তো বলো। তোমাকে জলযোগ করিয়ে আনি।"

শুভঙ্কর বলল, "কোনও দরকার নেই। আগে ট্রেনে তো উঠি। পরে খিদে পেলে বলব। গাড়িতে তো সব কিছুই পাওয়া যায়।"

"তা যায়। ঝাড়গ্রাম, চাকুলিয়া, খড়্গপুর এখনও তিন জায়গায় থামবে ট্রেন। সব জায়গাতেই কিছু-না-কিছু পাওয়া যাবে।"

ওরা ওভারব্রিজ টপকে ডাউন প্ল্যাটফরমে চলে এল। এখানে চারদিকেই কাছে-দূরে শুধু পাহাড় আর পাহাড়।

pathagar.net

শুভঙ্কর শ্যামলালকে বলল, "আপনাদের এখানে এলাম বটে, কিন্তু এমন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়লাম যে কিছুই আর দেখা হল না।"

"তুমি কপার মাইনস্ দ্যাখোনি ? মউভাণ্ডার, মুসাবনি !"

"কিছু না। কত পাহাড়ে ওঠার শখ ছিল, তাও হল না।"

"সে কী ! অন্তত ফুলডুংরিতেও তো উঠতে পারতে !"

"সময় পেলাম কই ?"

"এই দ্যাখো ফুলডুংরি।"

"ওই লালমতো ঢিবিটা ?"

"এখন গাছপালা কেটে নেওয়ায় ওটাকে ঢিবি বলে মনে হচ্ছে। এক সময় ওই ঢিবিই ছিল ঘাটশিলার আকর্ষণ। কত গাছপালা, লতাগুল্ম যে ছিল ওখানে তা ধারণাও করতে পারবে না। শুধু চিহড় লতাতেই ছায়াময় অন্ধকার করে রাখত পাহাড়টাকে। পাহাড় অবশ্য ঠিক নয়, এটাকে টিলা বলাই উচিত।"

শুভঙ্কর এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ফুলডুংরির দিকে।

এমন সময় হঠাৎ কিছু লোককে চঞ্চল হয়ে উঠতে দেখা গেল। তার মানে ট্রেন আসছে। সেইসঙ্গে নেমে আসছে সন্ধের অন্ধকার।

শ্যামলাল বলল, "ট্রেন আসছে।"

শুভঙ্কর দেখল বহুদূর দিগন্তে ছোট্ট একটি কালো বিন্দু। সম্ভবত এঞ্জিনের মুখ ওটা। স্টেশনে ট্রেন আসার ঘণ্টি পড়ল। শ্যামলাল বলল, "খুব একটা ভিড় নেই দেখছি আজ। আর মনে হয় লেটটাও একটু মেকআপ করেছে।"

ট্রেন থামল ঘাটশিলা স্টেশনে।

ওরা উঠে পড়ল একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায়। গাড়িতেও ভিড় খুব-একটা ছিল না। ওরা বেশ ভালভাবেই বসবার জায়গা পেয়ে গেল।

ট্রেন ছাড়ল। মাত্র দু' মিনিটের স্টপ। তাই থেমেই ছাড়ল।

একজন কফিওয়ালা কফি নিয়ে এল।

শ্যামলাল বলল, "কফি খাবে তুমি ?"

"না। আপনি খান। আমি একবার বাথরুম থেকে আসি।"

"ঠিক আছে যাও।" বলে শ্যামলাল কফিওয়ালার কাছ থেকে কফি নিয়ে মৌজ করে কফি খেতে লাগল।

আর শুভঙ্কর দুরুদুরু বুকে বাথরুমে যাওয়ার নাম করে এগিয়ে এল গেটের কাছে। বুদ্ধুদা ওর কথামতো কাজ করবে তো ? না করলে কিন্তু সব ভেস্তে যাবে। যদিও পুলিশকে ধোঁকা দেওয়াটা মস্ত অপরাধ, তবুও এই মুহূর্তে এ ছাড়া আর কোনও উপায়ই নেই। ট্রেন ঘাটশিলা ছেড়েই ঝড়ের গতি নিয়েছে। ওর বুক কাঁপছে। তা হলে কি বুদ্ধুদা কথা রাখল না ?

এক অবাঙালি যাত্রী সতর্ক করে দিলেন শুভঙ্করকে, "আরে ভাই, দরোয়াজা বন্ধ করো। এ ক্যা কর রহে হো তুম। গির যাওগে।"

শুভঙ্কর একবার তাকিয়ে দেখল যাত্রীটির দিকে। তারপর একটু পিছিয়ে এসে দাঁড়াল। এমন সময় হঠাৎ দেখতে পেল ট্রেনের গতি কমে আসছে। খুশিতে ভরে উঠল বুক। বুদ্ধুদা তা হলে কথা রেখেছে। জয় মা কালী। ট্রেনের গতি হ্রাস পেতেই এক জায়গায় টুক করে চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে

pathagar.net

নামল শুভঙ্কর। ট্রেনটা একটু দূরে গিয়ে থামল। তারপর সিগন্যালে সবুজ সঙ্কেত পেয়ে আবার ছুটতে লাগল হুহু করে।

শুভঙ্কর তো নেমে পড়ল। কিন্তু সেই অন্ধকার নির্জনে নেমে পড়েও ও কিন্তু ভয় পেল না। বরং খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসা পাখির মতো মুক্তির আনন্দে উচ্ছ্বসিত হল। তবে এটাও ঠিক যে, শ্যামলালকে মিথ্যে করে বলে এইভাবে পালিয়ে আসার জন্য বিবেকের কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হল খুব। কিন্তু এই সময়টা এমনই এক সময় যে, এখন ওইসব দেখতে গেলে দুটি মেয়ে এবং একটি ছেলের জীবনে চরম সর্বনাশ ঘনিয়ে আসবে।

ও লাইন ধরে সোজা স্টেশনের দিকে এগিয়ে চলল। একটু পরেই দেখতে পেল কে যেন সেই ছায়ান্ধকারে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। ছায়ামূর্তি কাছে আসতেই শুভঙ্কর বলল, "কে, বুদ্ধুদা ?"

"হ্যাঁ, আমি। তোমার নামতে কোনও অসুবিধে হয়নি তো ?"

"না। ঠিক জায়গা মতো নেমে গেছি।"

"আমি অনেক কষ্টে কেবিনম্যানকে বুঝিয়ে রাজি করিয়েছি। ও সিগন্যাল রেড করে রেখেছিল। তবে এ-কথা কেউ কখনও যেন জানতে না পারে। তা হলে ও আমি দু'জনেই অসুবিধেই পড়ে যাব কিন্তু।"

"ও-ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। তবে তোমাকে কিন্তু আমার জন্য আর-একটা কাজ করতে হবে।"

"আবার কী কাজ ?"

"লক্ষ্মীটি, তুমি নিজে বা অপর কাউকে দিয়ে এখানকার স্টেশনমাস্টারের কাছে এক্ষুনি একটা খবর পাঠিয়ে দাও, ডাউন ইস্পাত এক্সপ্রেসের 'ফোর জিরো টু জিরো ওয়ান' বগিতে শ্যামলাল নামে পুলিশের যে-লোক হাওড়ায় যাচ্ছেন তিনি যেন পরবর্তী কোনও স্টেশনে নেমে আবার ঘাটশিলায় ফিরে আসেন।এটা করতেই হবে।"

"অসম্ভব। আমি এখানকার ছেলে। সবাই আমাকে চেনে। স্টেশনমাস্টার আমার বিশেষ পরিচিত। তা ছাড়া তুমি তো জানো না, বছর চারেক আগে আমি এখানে ক্যাজুয়েল লেবার হিসেবে কাজও করে গেছি। শুধু মাঝে-মধ্যে ক্যাশ থেকে টাকা চুরি করতুম বলে একবার ধরা পড়ে গিয়ে চাকরিটা খুইয়েছি। কাজেই আমি স্টেশনমাস্টারের কাছে এই কথা বলতে গেলেই সব জানাজানি হয়ে যাবে। পুলিশে খবর চলে যাবে। ওর ভেতরে আমি নেই। তার চেয়ে তুমি চলে যাও। তোমাকে কেউ চেনে না।"

অগত্যা শুভঙ্কর নিজেই চলে গেল। এবং স্টেশনমাস্টারকে সব খুলে বলল। সব শুনে অবাঙালি এ. এস. এম. প্রথমেই শুভঙ্করকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুম কৌন হো।"

শুভঙ্কর মিথ্যা পরিচয় দিয়ে বলল, "ধলভূমগড়ে গাড়িটা ঢোকার আগে সিগন্যাল না পেয়ে একবার কয়েক সেকেন্ডের জন্য দাঁড়িয়ে যায়। সেই সময় আমি নেমে পড়ি আর ট্রেনও ছেড়ে দেয়। চলন্ত গাড়িতে উঠতে সাহস হল না বলে থেকে যাই। এখন খবর না পাঠালে উনি চিন্তা করবেন। হয়তো হাওড়া পর্যন্ত চলে যাবেন।"

"লেকিন ট্রেন সে কাহে কো উতরায়া তুম ?"

"আসলে লাইনের ধারে একটা ঝকঝকে পিস্তল পড়ে থাকতে দেখে আমি নেমে পড়ি। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে দেখি ওটা একটা খেলনা পিস্তল।"

"বহুত বুরা কাম কিয়া।" বলেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চাকুলিয়ার স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে টেলি যোগাযোগ করলেন। টরেটক্কায় কথা হল।

উনি যখন কথা বলতে ব্যস্ত শুভঙ্কর তখন হাওয়া। ওর দায়িত্ব শেষ। অযথা আর বিবেকের দংশনটা খেতে হবে না। শ্যামলালকে শুধু-শুধু হাওড়া পর্যন্ত পাঠানোর কোনও মানে হয় না। তা ছাড়া ওকে দেখতে না পেয়ে ছটফট করবে বেচারি। অবশ্য ট্রেনের সহযাত্রী সেই অবাঙালি ভদ্রলোক যদি হইচই শুনে শ্যামলালকে ওর নেমে যাওয়ার কথা বলে দেন, তা হলে ঠিক আছে। না হলে শ্যামলাল হাওড়ায় যাবে। ওর বাড়ি জানে না, তাই বাড়িতেও খবর দিতে পারবে না। হাওড়া স্টেশনে সারারাত ছটফট করবে বেচারি। তার ওপর কর্তব্যে অবহেলার জন্য ওপরওয়ালার কাছে বকুনি খাবে। এমনকী, চাকরি থেকে সাসপেন্ডও হয়ে যেতে পারে। এখন তবু কিছুটা নিশ্চিন্ত।

যাই হোক, স্টেশন থেকে ফিরে শুভঙ্কর ধীরে-ধীরে অন্ধকার মাড়িয়ে বিল্টুদের বাড়ির পেছনে এসে দাঁড়াল। নীচের দরজা তো ভেতর থেকেই বন্ধ। তাই বাড়ির পেছন দিকে চলে গেল। কড়ি ভচুকে বলেছিল ছাদের আলসের সঙ্গে একটা নাইলনের ফিতে নীচের দিকে ঝুলছে। সেটা এখনও ঝুলছে কী ? যদি ঝুলে থাকে তবে তাই ধরেই ওপরে উঠবে শুভঙ্কর।

ও তীক্ষ্ণ চোখে দেওয়ালে হাত বুলিয়ে অন্ধকার হাতড়ে এগোল। এত অন্ধকার হত না এখানে, আসলে চারদিকে গাছপালা এত ঘন যে, তারই ছায়ায় অন্ধকার যেন কুটিল হয়ে উঠেছে। অবশ্য এই অন্ধকার থাকবে না বেশিক্ষণ। পূর্ণিমা এগিয়ে আসছে। তাই খানিক বাদেই জ্যোৎস্না ফুটবে। দেওয়াল হাতড়ে যেতে-যেতে এক জায়গায় হঠাৎই একটা কী যেন হাতে লাগল ওর। আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল শুভঙ্কর। এই তো ঝুলছে ফিতেটা। ও হাত দিয়ে ফিতেটা ধরে বেশ দু-একবার গায়ের জোরে টেনে দেখল। না, বাঁধন আলগা নয়। বেশ শক্তই আছে। তাই আর দেরি না করে সেটাকে ধরে একটু-একটু করে দেওয়াল বেয়ে উঠতে লাগল ওপরে। বেশ খানিকটা উঠেছে এমন সময় ভাঙা দেওয়ালের একটা খোপের ভেতর থেকে 'ক্যাঁ-ক্যাঁ' শব্দে প্রচণ্ড চিৎকার করে কী যেন একটা উড়ে গেল ডানা ঝাপটে। আর-একটু হলেই হয়েছিল আর কি! হাত ফসকে পড়ে যেন একদম নীচে। ওর সর্বাঙ্গ থরথর করে কাঁপতে লাগল ভয়ে। একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল পিঠের শিরদাঁড়া বেয়ে। বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করছে। একটুক্ষণ থেমে থেকে এই আকস্মিক ব্যাপারটা সামলে নিয়ে আবার ওঠা শুরু করল। একেবারে শেষ সীমায় পৌঁছে ঘেরা-ছাদের আলসেটা টপকেই দেখল, হাত, পা ও মুখ বাঁধা অবস্থায় মউ পড়ে আছে ছাদের ওপর। কী নির্দয়ভাবে মেয়েটাকে বেঁধে রেখেছে ওরা। হাত দুটো পিছমোড়া করে দুটো পায়ের সঙ্গে নাইলনের ফিতে দিয়ে বেঁধেছে। মুখের ভেতর কাপড় গুঁজে সে-মুখও বাঁধা। এমনকী, গড়িয়ে-গড়িয়েও মেয়েটা যাতে চলে যেতে না পারে সেজন্য সারা গায়ে ফিতে জড়িয়ে ছাদের

আলসের ঘেরের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে মজবুত বাঁধনে। ।

শুভঙ্কর মউয়ের অবস্থাটা দেখেই ধীরে-ধীরে সিঁড়ির দরজার কাছে গেল। অল্প একটু চাপ দিয়ে ঠেলে দেখল সেটা বন্ধ কি না। কিন্তু না, খোলাই ছিল সেটা। আসলে এ-দিকটা নিরাপদ তো। তাই তাড়াতাড়ি পালাবার সুবিধের জন্য খোলা রেখেছে দরজাটা। শুভঙ্কর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সেই খোলা দরজায় শিকল দিল। তারপর পা টিপে-টিপে এগিয়ে গেল মউয়ের কাছে। জোরে গেল না এই কারণে, যদি পায়ের শব্দে ওরা কিছু টের পায়।

শুভঙ্কর মউয়ের কাছে গিয়ে দেখল ওর দু' চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। এখানে তত অন্ধকার নেই। তার ওপর আকাশের ভরন্ত চাঁদের গা বেয়ে জ্যোৎস্না ঝরে-ঝরে পড়ছে।

মউ দেখল শুভঙ্করকে। বাঁচার আশায়, মুক্তির আনন্দে ওর চোখে-মুখে নিমেষে ভাবান্তর ঘটে গেল। মুখে তো কিছু বলতে পারল না। শুধু একটা গোঁ-গোঁ শব্দ বেরোল মুখ থেকে। শুভঙ্কর প্রথমেই ওর মুখের বাঁধন খুলে ফেলল।

বিস্মিত মউ ওর দিকে তাকিয়েই বলল, "তবে যে শুনলাম পুলিশের গাড়ি এসে তোমাকে নিয়ে গেছে?"

"ঠিক শুনেছ। কিন্তু তোমাকে এই শত্রুপুরীতে এই অবস্থায় ফেলে রেখে আমি কী করে যাই বলো?"

"কিন্তু পুলিশের খপ্পর থেকে ছাড়া পেয়ে এখানে তুমি এলে কী ভাবে?"

"অন্যায়ভাবে। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে এসেছি আমি। যাকগে, এখন এসব কথা বলার সময় নয়। শুধু তোমার ক্ষতি হবে ভেবেই পুলিশকে এদের কথা বলিনি কিছু।"

"আমিও ঠিক সেই কারণেই আমার প্যান্টের পকেটে ছুরি থাকা সত্ত্বেও বাধা দিইনি ওদের। কেননা, পাল্টা প্রতিশোধ নিতে যদি ওরা তোমাকে মেরে ফেলে তাই।"

শুভঙ্কর হেসে বলল, "কিন্তু কিসের জন্য মউ? আমি তোমার কে?"

"আমার সত্যিকারের বন্ধু। আমি অনেকদিন ধরে তোমার মতো সহজ সরল একটি ভাল ছেলেকে আমার বন্ধু হিসেবে পেতে চেয়েছিলাম। এতদিনে পেয়েছি।"

"সে কী? আমি তো জানি তোমার চোখে আমি একটা বোকা-হাবা হাঁদারাম।"

"সেটা আগে ছিলে, এখন আর নও। তুমি যদি তাই হতে, তা হলে কি এইভাবে বীরের মতো পুলিশের খপ্পর থেকে পালিয়ে এসে আমাকে উদ্ধার করতে পারতে? যাক এখন কথা না বাড়িয়ে আমার প্যান্টের পকেট থেকে ছুরিটা বের করে বাঁধনগুলো কেটে দাও। অনেকক্ষণ এইভাবে পড়ে আছি। কষ্ট হচ্ছে খুব।"

শুভঙ্কর একটুও দেরি না করে মউয়ের পকেটে হাত দিয়ে ছুরিটা বের করল। ভাগ্যিস, জিন্সের প্যান্টটা পরে ছিল মউ। তাই পেছন দিকের পকেটে বেশ ভালভাবেই গুঁজে রাখতে পেরেছিল ছুরিটা। ছুরি বের করেই কাটতে

boiRboi.blogspot.in

লাগল ফিতেগুলো। ফিতে কাটা শেষ হলে ওকে বহুকষ্টে দু'হাতে ধরে তুলে দাঁড় করাল শুভঙ্কর। অনেকক্ষণ উলটো-পাকে বাঁধা থাকার ফলে হাত-পাগুলো কিছুতেই সোজা হতে চাইছিল না। এবার উঠে দাঁড়িয়ে হাত-পা টান করে সামান্য একটু ম্যাসাজ করে ঠিকঠাক করে নিল। তবু কী ব্যথা-ব্যথা করছে। বুক ভরে কয়েকটা শ্বাস নিয়ে মউ বলল, "এই সময় একটু জল পেলে ভাল হত। যা তেষ্টা পেয়েছে।"

"জল তো এখন পাওয়াই মুশকিল।"

"সে জানি। এখন চলো, চুপিচুপি গিয়ে দেখি ওরা কী করছে।"

ছুরিটা শুভঙ্করের হাতেই ছিল। সেটাকে কায়দা মাফিক ধরে মউকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলার দালানে এল। যে-ঘরে অপারেশন সে-ঘরের জানলা-দরজা ভেতর থেকেই বন্ধ ছিল। ওরা চুপিচুপি এসে দরজার দু'পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। দু'জনেই কান খাড়া করে শোনবার চেষ্টা করল ওদের কোনও কথাবার্তা অথবা খুটখাট ঠুকঠাক শব্দ কিছু শুনতে পায় কি না। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও কিছুই শুনতে পেল না ওরা। শুভঙ্কর তখন আঙুলের ডগা দিয়ে আলতো করে একটু চাপ দিল দরজায়। দরজাটা খুলে গেল। ঘরের ভেতর চিমনি লণ্ঠনটা জ্বলছিল। তারই আলোয় যা দেখল, তাতে সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল ওদের।

শুভঙ্কর ও মউ দেখল ঘরের মেঝেয় কড়ির প্রাণহীন দেহটা লুটিয়ে পড়ে আছে।

আর কী দেখল ?

আর দেখল দাদুর ছবিটা দেওয়ালের হুকে টাঙানো নেই। সেখানে চোরকুঠরির গহ্বরটা হাঁ হয়ে আছে। সোনার গণপতির চিহ্নমাত্র নেই। অর্থাৎ গণপতি উধাও হয়েছেন। সেই চোরকুঠরিতে চন্দনকাঠের শূন্য সিংহাসনে ফণা উঁচিয়ে দুলছে একটা কেউটে সাপ।

শুভঙ্কর সাপ চেনে না। মউ ওকে বলল, "এটা জাত কেউটে, এর ছোবল সহ্য করার শক্তি মানুষ কেন,দানবেরও নেই।"

মউ দু'বার হাতে তালি দিতেই সাপটা ফাটলের গর্তে ঢুকে গেল।

শুভঙ্কর ও মউ দারুণ রকমের আশাহত হয়ে কী যে করবে কিছু ঠিক করতে পারল না। ওরা কড়ির মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখল ওর কপালের ওপর ছোবলের দাগ। পাশাপাশি দুটি ক্ষত। ওর মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠছে। প্রাণহীন নিথর দেহ।

শুভঙ্কর বলল, "এই দম-বন্ধ-করা চোরকুঠরিতে ওই সাপটা কী করে এল ?"

মউ বলল, "এতে আর অবাক হওয়ার কী আছে ? দীর্ঘদিনের পুরনো বাড়ির ফাটলের মধ্যে ওই চোরকুঠরিতে সাপ ছাড়া অন্য কিসেরই বা বাসা হবে ? তার ওপর চন্দন কাঠের সিংহাসনের গন্ধ। একদিকে অবশ্য ভালই হয়েছে। এই দুষ্কৃতীগুলো যদি না আসত, আর তুমি-আমি দু'জনে এই কাজ যদি করতে যেতাম তা হলে কী যে হত তা একবার চিন্তা করে দেখেছ কি ? হয় তুমি, না হয় আমি দু'জনের একজন মরতামই।"

"তা অবশ্য ঠিক। সোনার গণপতিকে আমরা উদ্ধার করতে না পারলেও

pathagar.net

তিনি কিন্তু অলক্ষ্য হতে আমাদের অতি সুন্দরভাবে রক্ষা করে চলেছেন ?"

"এবং এর দ্বারাই মনে হয় দুই আর দুইয়ে যেমন চার, তেমনই সোনার গণপতিও আমাদের । আজ হোক কাল হোক, ও-মূর্তি আমাদের হাতে আসবেই আসবে। তার কারণ আমাদের মধ্যে কোনওরকম তঞ্চকতার প্রবৃত্তি নেই। আমাদের উদ্দেশ্য মহৎ। আমরা গণপতির আর্থিক মূল্য নয়, তাঁর কৃপা চাই। আমরা তাঁর ইচ্ছাপূরণে ব্রতী।"

শুভঙ্কর বলল, "তা না হয় হল। কিন্তু ওই ভচু। তার নাগাল কী করে পাব আমরা ?"

"যেভাবেই হোক পেতে হবে।"

"এখন প্রশ্ন, সোনার গণপতি সত্যিই কি সে পেয়েছে ? শূন্য সিংহাসন দেখে ফিরেও তো যেতে পারে ?"

"পারে। তবে এক্ষেত্রে তা হয়নি। সিংহাসনটা ভাল করে লক্ষ করো, তা হলেই তোমার প্রশ্নের উত্তর পাবে । আমি প্রথমেই যা দেখবার তা দেখে নিয়েছি।"

শুভঙ্কর মউয়ের কথামতো সিংহাসনটা পরীক্ষা করল। সিংহাসনের মাঝখানটায় চারচৌকো একটা সাদা দাগ। সেই দাগের বাইরে চারদিকে পুরু ধুলোর আস্তরণ। এতেই বোঝা যায় সোনার গণপতি এখানেই ছিল। এবং সেটাকে এখান থেকে সারানো হয়েছে।

মউ বলল, "কী দেখলে ?"

"তোমার অনুমানই ঠিক।"

"এ ছাড়া আরও প্রমাণ, সোনার গণপতি যদি পাওয়া না যেত তা হলে ওই দুষ্কৃতী ছাদে উঠে নাইলনের ফিতে ধরেই চুপিচুপি পালাত। কিন্তু যেহেতু ওটা সে হাতে পায় তাই ওই দুর্লভ সামগ্রী হাতে কঠিন পথটি বেছে না নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে সোজা পথেই চলে গেছে।"

শুভঙ্কর ও মউ কড়ির পকেট হাতড়ে কিছু টাকাপয়সা ও দাদুর লেখা সেই ডায়েরিটা উদ্ধার করল। টাকাপয়সাগুলো অপ্রয়োজনীয় বস্তুর মতো ফেলে দিয়ে ডায়েরিটা সযত্নে রক্ষা করল। কড়ির হাতে একটা রিভলভার ছিল। শুভঙ্কর নিয়ে নিল সেটা।

মউ বলল, "গণপতি যা করেন সিদ্ধিলাভের জন্য। আসন্ন সংগ্রামে ওটাই আমাদের হাতিয়ার। ওটাকে সঙ্গে রাখো। কাজে লাগাবে।"

শুভঙ্কর রিভলভার হাতে নিয়ে বলল, "সে-কথা আবার বলতে ? এখন বুঝলে তো গণপতি-রহস্য কীরকম ?"

"কীরকম ?"

"প্রথম আবির্ভাবেই একজনের মৃত্যু। এখনও কে যে মরবে, কখন যে মরবে, তা কে জানে ?

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে শুভঙ্কর বলল, "গণপতি উদ্ধার মাথায় থাকুক এখন। আগে চলো কনকদুর্গার মন্দিরে গিয়ে বিল্টুকে উদ্ধার করি। তারপর তিন্নিকে উদ্ধার করে আলেয়ার পেছনে ছুটব।"

বিস্মিত মউ বলল, "এ তুমি কী বলছ ! বিল্টুকে কনকদুর্গার মন্দিরে, এ-কথা

pathagar.net

তুমি জানলে কী করে ?"

"খুব অবাক হয়ে যাচ্ছ, না ? কড়ি আমাকে যা বলেছে।"

"কী বলেছে সে ?"

শুভঙ্কর এক-এক করে সব কথা খুলে বলল মউকে।

মউ বলল, "তা হলে শোনো, ভচু নামের এই দুর্বৃত্ত সোনার গণপতি নিয়ে পালাতে সক্ষম হলেও সে কখনওই ও জিনিস শিকারিবাজের সাতে তুলে দেবে না।"

"এরকম পরিকল্পনা ওদের তো আগে থেকেই ছিল। তখন ওরা ছিল দু'জন, এখন একজন।"

"তা হলে আমার অনুমান ঠিক। অতএব কনকদুর্গার মন্দিরে, সোনার গণপতির সামনে বিল্টুদাকে বলি দেওয়া ওদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তবে ওরা ওকে ছাড়বে না। অনেক নির্যাতন করবে। শেষ পর্যন্ত মেরেও ফেলবে কেননা, শিকারিবাজের মুখে গরম কফি ছুঁড়ে মারার কথা শিকারিবাজ কি এত সহজে ভুলবে ?"

"তা হলে আর দেরি নয়। এখনই চলো।"

মউ বলল, "যেতে তো হবেই। কিন্তু সে অনেক দূরের পথ। তার ওপর সে পথ এই রাত দুপুরে অনেক বিপদসঙ্কুল। এখন কীভাবে আমরা যাব সেইটাই হচ্ছে চিন্তার বিষয়। কোনও পরিবহণই তো এখন পাব না। আমাদের যেতে হবে কোকপাড়া, চাকুলিয়া, দুটো স্টেশন পার হয়ে গিধনি। গিধনিটা অবশ্য সিংভূমে নয়, বাংলায়। গিধনি থেকে প্রায় আট-দশ কিলোমিটার পথ। পায়ে হেঁটে তবেই চিলকিগড়। চিলকিগড়ের বিশাল রাজবাড়ির পাশ দিয়ে গ্রামে ঢুকে ডাইনে-বাঁয়ে বাঁক নিয়ে ঝোপঝাড় পার হয়ে বর্ষায় স্ফীত দুরন্ত ডুলুং নদী অতিক্রম করতে হবে।"

"ডুলুং নদী ! ভারী চমৎকার নাম তো !"

"অনেকটা তোমার ওই তিন্নির মতো। মিষ্টি নামের যেমন মেয়েটি, মিষ্টি নামের তেমনই নদীটি।"

"তুমিও তো মিষ্টি।" শুভঙ্কর সস্নেহে বলল।

"ওর মতো নয়। তা যাক। সেই দুরন্ত নদী কিন্তু সব সময়ই দুরন্ত নয়। শীতকালে একবার আমরা ওখানে গিয়েছিলাম পিকনিক করতে। সে যে কী আনন্দ তা এ-জীবনে ভোলবার নয়। ছোট্ট মিষ্টি গিরিনদীটি নূপুরের ছন্দে নেচে-নেচে তির-তির করে বইছে। আমি তো থেকে-থেকে আমার স্কার্ট ভিজিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরছিলাম। অমন নদী হয় না। তা সেই নদী পার হলেই ওপারে দুর্ভেদ্য জঙ্গল। আর সেই জঙ্গলের মধ্যেই আছে কনকদুর্গার মন্দির। সেখানে কোনও গ্রাম নেই। তাই মানুষের বসতি নেই। সন্ধের পর নরহন্তা দস্যুদের রাজত্ব সেখানে। মন্দিরের কনকদুর্গা (সোনার) কবেই চুরি হয়ে গেছে। এখন পটের ছবিতে মায়ের পূজা হয়। অনেকটা পুরীর মন্দিরের ধরনে তৈরি এই মন্দিরটি বহু প্রাচীন। তবে এখন কয়েক বছর হল প্রাচীন মন্দিরটি ক্রমশ মাটির নীচে বসে যাওয়ায় একটি নতুন মন্দির তৈরি হয়েছে। পরিবেশটা অতি সুন্দর। দু' পাশে সবুজ অরণ্যের বুক চিরে বয়ে চলা নদী,

তীরে আকর্ষক প্রাকৃতিক পরিবেশে কাঁচা শালপাতায় খিচুড়ির ভোগ খেতে কী ভাল যে লাগে তা বলবার নয়। সেই নির্জন মন্দিরে ডাকাতের ভয়ে সন্ধের পর কেউ থাকে না। অতএব এই রাতদুপুরে ওখানে যাওয়া কি সোজা ব্যাপার ?"

"তা হলে ? তা হলে কী হবে ? দিনের আলোর জন্য অপেক্ষা করতে গেলে ততক্ষণে বিল্টুর যদি ভালমন্দ কিছু হয়ে যায় ?"

"না, না। দিনের আলোর জন্য অপেক্ষা করব কী ? যেতে আমাদের হবেই। তবে যাওয়ার ব্যাপারটা খুব একটা সুগম নয়। বুদ্ধি খাটিয়ে একটা উপায় বের করে যেতে হবে।"

"তা হলে আর দেরি কেন, চলো ?"

"হ্যাঁ চলো। টর্চ আছে তোমার কাছে ?"

"না। বিল্টুর টর্চটা তো ছিল। সেটা ব্যাগের মধ্যেই শ্যামলালের জিম্মায় রয়ে গেছে।"

"ঠিক আছে। তুমি পিস্তলটা সামলে রেখো। ওর পকেট হাতড়ে গোটাকতক গুলি আমি পেয়েছি। সেগুলো আমার প্যান্টের পকেটে রেখে দিয়েছি। দরকার হলে চেয়ে নিও।"

শুভঙ্কর পিস্তলটা পরীক্ষা করে বলল, "এতেও একটা লোড করা আছে।"

দাদুর ডায়েরিটা এই মুহূর্তে ওদের কাজে না লাগলেও মউ সেটাকে ওর প্যান্টের পকেটে গুঁজে রাখল। তারপর শুভঙ্কর আর ও মৃত কড়ির হাত দুটো ধরে টানতে-টানতে নিয়ে এল ঘরের বাইরে। সেখানে তখন ঘুটঘুট্টি অন্ধকার।

শুভঙ্কর বলল, "মউ, তুমি বরং আলোটা নিয়ে এসো ঘর থেকে, আমাকে দেখাও। আমি একাই ওকে টেনে-হিঁচড়ে নামাই।"

"পারবে তো ?"

"না পারবার কী আছে ? কাঁধে করে চাগাতে পারব না, টেনে-হিঁচড়ে নামাতে তো পারব।"

মউ বলল, "আমাদের বোধ হয় ভুল হল। শুনেছি এই ধরনের ডেডবডি নাকি সরাতে নেই। এতে পুলিশের কাজের অসুবিধে হয়। তদন্ত ঠিকমতো করা যায় না।"

"শুনেছ ঠিকই। তবে এখন এইসব ক্ষেত্রে ওসব মানামানির কোনও ব্যাপারই নেই। এখন কত যে এইরকম হবে তার ঠিক কী ? হত্যা, মৃত্যুর এই তো সবে শুরু।"

মউ আলো হাতে ধীরে-ধীরে সিঁড়ি বেয়ে এক-পা এক-পা করে নামতে লাগল। আর মৃত কড়ির হাত দুটো ধরে হিড়হিড় করে টানতে লাগল শুভঙ্কর।

সিঁড়ির একটা বাঁক ঘুরেই নীচের দিকে তাকিয়ে ওরা যা দেখল তাতে শিউরে উঠল ওদের সর্বাঙ্গ।

ওরা দেখল সিঁড়ির ধাপগুলো যেখানে শেষ হয়েছে সেইখানে দরজার কাছে দালানের মেঝের ওপর হাত-পা বাঁধা পুণ্ডরীককাকা অসহায়ভাবে মেঝের ওপর

pathagar.net

পড়ে আছেন। তাঁর মাথার একপাশ দিয়ে চুঁইয়ে-চুঁইয়ে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়ছে। পাশেই পড়ে আছে একটি লোহার রড।

শুভঙ্কর মউয়ের কাছ থেকে ছুরিটা নিয়ে তক্ষুনি বাঁধন-মুক্ত করল। পুণ্ডরীককাকার চোখে-মুখে তখন দারুণ আতঙ্ক।

শুভঙ্কর বলল, "আপনার এইরকম অবস্থা কে করল ?"

পুণ্ডরীককাকা অতিকষ্টে বললেন, "আমি তাকে চিনি না বাবা। এমনকী, দেখিওনি।"

"সে কী !"

"তুমি চলে যাওয়ার পর ওপরের ঘরে তালা দেব বলে যেই না ভেতরে ঢুকেছি অমনই পেছন দিক থেকে মাথায় একটা আঘাত পেলাম। সে কী প্রচণ্ড আঘাত। তাতেই জ্ঞান হারালাম।"

"কিন্তু লোহার রডটা ওরা পেল কোথায় ?"

"এটা এখানেই দরজার পাশে রাখা ছিল। তা সে যাই হোক, সবেমাত্র জ্ঞান ফিরে পেয়েছি। কিন্তু পেলে কী হবে, নড়াচড়ার শক্তি নেই। চেঁচিয়ে কাউকে ডাকতে পারছি না। দেখছ তো আমার কী অবস্থা করেছে ওরা ?"

"তা তো দেখছি। এদিকে মাথাটাও বেশ ভালরকম ফেটেছে। এই বয়সে এত জোরে মাথায় আঘাত পাওয়াটাও ঠিক নয়।"

"তোমরা দু'জনে আমাকে একটু ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে চলো। না হলে আমি কিছুতেই যেতে পারব না। আমার পা কাঁপছে। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। গা-টা কেমন বমি-বমি করছে।"

শুভঙ্কর বলল, "আপনার ব্যবস্থা করছি। তবে আপনার মাথার আঘাতটা যে করেছে তার লাশটা আগে বাইরে বের করি।" বলেই আবার হিড়হিড় করে টেনে নামাল লাশটাকে।

পুণ্ডরীককাকা শিউরে উঠে বললেন, "এ কী ! এ কার লাশ ?"

"যে আপনাকে আঘাত করেছে তার। শিকারিবাজের দলের লোক। গুপ্তধনের লোভে ওপরের ঘরে ভাঙচুর করছিল, সেই সময় ওকে সাপে কামড়েছে। কেউটের ছোবল।"

"কী করে জানলে ?"

"সাপটাকে আমরা চোখে দেখেছি।"

পুণ্ডরীককাকার এতক্ষণে কী যেন মনে পড়তে লাগল, "দাঁড়াও, দাঁড়াও। তুমি না তখন পুলিশের গাড়িতে চলে গেলে ? কিন্তু তারপরে এখানে তুমি এলে কী করে ?"

"সে অনেক কথা কাকাবাবু। আমি অন্যায়ভাবে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে এসেছি। ভাগ্যিস এসেছিলাম, না হলে মউ এবং আপনার কী অবস্থা যে হত তা ভগবানই জানেন। মউকে ঠিক এইভাবে, এর চেয়ে কঠিনভাবে বেঁধে ফেলে রেখেছিল ছাদের ওপর। ভাগ্য ভাল যে, আপনার মতো আঘাত করেনি ওকে। একে তো মোটরবাইক থেকে পড়ে গিয়ে কেটে-ছিঁড়ে একশা হয়েছে বেচারির, এর ওপর মারধর করলে মরে যেত। যাই হোক, আপনি আগে ডাক্তারখানায় গিয়ে মাথাটার ব্যবস্থা করুন। তারপর

থানায় খবর দিন। আর শুনুন, আমি যে সুস্থ শরীরে এখানে ফিরে এসেছি সে-কথাটাও পুলিশকে বলবেন। আমার জন্য ওঁরা যেন অযথা চিন্তা না করেন। একটু পরেই মউকে নিয়ে আমি উধাও হয়ে যাব। হয়তো দু-তিন দিনের মধ্যেও ফিরতে পারব না। পুলিশকে শুধু সেই কথাটাই বলবেন না।"

"এই রাতদুপুরে কোথায় যাবে তোমরা ?"

"আমরা বিল্টু আর তিন্নিকে উদ্ধার করতে যাব।"

পুণ্ডরীককাকা উৎসাহিত হয়ে বললেন, "বলো কী ! ওদের কোনও খবর পেলে নাকি তোমরা ?"

"তিন্নির খবর কিছু পাইনি। তবে বিল্টুর খোঁজ পেয়েছি। আশা করি ওকে পেলে তিন্নিকেও পেয়ে যাব।"

পুণ্ডরীককাকা হতাশ হয়ে বললেন, "আমার মেয়েটারই কোনও খোঁজ পেলে না বাবা ? তা এ-কথা পুলিশকে বলতে বারণ করছ কেন ?"

"বারণ করছি এই কারণে, আমরা গভীর রাতের অন্ধকারে চুপিচুপি কাজ সারব। আর পুলিশকে জানিয়ে দিলে হবে কি, ওরা জিপ-টিপ নিয়ে জঙ্গলে গিয়ে হাজির হবে, তারপর হাঁকডাক করে সব ভেস্তে দেবে। কেননা, ওই জঙ্গলের ধারেকাছেও গাড়ির আওয়াজ পেলে সতর্ক হয়ে যাবে ওরা।

শুভঙ্কর ও মউ আর কথা না বাড়িয়ে ভচুর ডেডবডি একেবারে ঘরের বাইরে বের করে দিল। তারপর দু'জনে দু' দিক থেকে পুণ্ডরীককাকাকে ধরাধরি করে নিয়ে চলল ঘরের দিকে। এইটুকু পথ যেতেই যেন প্রাণান্ত হয়ে গেল।

পুণ্ডরীককাকার ওই অবস্থা দেখেই চিৎকার করে উঠলেন, কাকিমা, "এ কী ! আমার এ সর্বনাশ কে করল ?"

শুভঙ্কর বলল, "কাকিমা, এখন কান্নাকাটির সময় নয়। আপনি এক্ষুনি গ্রামের ডাক্তারবাবুকে খবর দিন।"

"কিন্তু তুমি এখন কোত্থেকে এলে ? তুমি যাওনি ?"

শুভঙ্কর বলল, "দাঁড়াবার সময় নেই। আপনি সব কথা কাকাবাবুর মুখে শুনবেন। এখন আমরা চলি। আজ রাতে আমরা কেউ ফিরব না।"

ওরা আর এক মুহূর্ত দেরি করল না। সঙ্গে-সঙ্গে চলে গেল।

যাওয়ার আগে মউ বলল, "আমাকে একবার বাড়ি যেতে হবে শুভঙ্কর। না হলে মা ভীষণ চিন্তা করবে। তা ছাড়া এই ডায়েরিটা গুছিয়ে রেখে একটা টর্চ আর কিছু টাকা-পয়সাও সঙ্গে নিতে হবে।"

শুভঙ্কর বলল, "টাকা আমার কাছে আছে।"

"কত আছে ? চার-পাঁচশোর বেশি নিশ্চয়ই নেই ?"

"ওর চেয়েও অনেক কম টাকা আছে।"

"তবে ? আমিও কিছুটা সঙ্গে রাখি। বলা যায় না, কখন কী দরকারে লাগে।" বলে শুভঙ্করকে ওদের বাড়ির সামনে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে মউ ঘরে চলে গেল ওর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। মাত্র দু-পাঁচ মিনিটের ব্যাপার। তারপরই একটা টর্চ হাতে এগিয়ে এসে বলল, "চলো।"

চলো তো চলো। কিন্তু কোন দিকে ?

শুভঙ্কর বলল, "আমরা কীভাবে এবং কোনদিকে যাব ?"

"আপাতত আমরা বম্বে রোডের দিকে যাই। যদি কোনও ট্রাক ম্যানেজ করতে পারি তা হলে খুবই ভাল হয়। এ ছাড়া কোনও পরিবহণ তো আমরা পাব না। সন্ধের পরই এখানে সব কিছুই নিঝুম হয়ে যায়। বহরাগোড়ার শেষ বাস চলে গেছে। না হলে বাসেও খানিকটা এগিয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু এখন একমাত্র ট্রাক ম্যানেজ করা ছাড়া কোনও ভরসাই নেই।"

শুভঙ্কর বলল, "রাতের কোনও গাড়ি নেই? কোনও প্যাসেঞ্জার ট্রেন? তা হলে আর অত বিপদের ঝুঁকি নিতে হত না।"

মউ বলল, "না, তাও নেই। ডাউন গুয়া-খড়্গপুর প্যাসেঞ্জারটাও বেরিয়ে গেছে একটু আগে। এখন রাত দুটোর আগে কোনও গাড়িই নেই। তাও দুটোয় যে-গাড়ি তার আবার স্টপ নেই গিধনিতে। আমাদের হয় চাকুলিয়া, নয় ঝাড়গ্রামে নামতে হবে। এ ছাড়া কোনও উপায়ই নেই।"

ওরা দু'জনে দ্রুত হেঁটে বম্বে রোডে এসে পৌঁছল।

চারদিকের অন্ধকার ভেদ করে একটু-একটু করে জ্যোৎস্নার আলো ফুটছে তখন।

ঝড়ের বেগে একটা ট্রাক হেড লাইট জ্বেলে ছুটে আসছে ওদের দিকে। ওরা হাত দেখাল। কিন্তু না, পাঞ্জাবি ড্রাইভার আড়চোখে একবার ওদের দিকে তাকিয়ে দেখে আরও জোরে চালিয়ে গেল গাড়িটা। এইভাবে একটির পর একটি ট্রাক অতিক্রম করে গেল ওদের কিন্তু ওরা হাজার চেষ্টা করেও একটা ট্রাককেও থামাতে পারল না। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে বৃথা চেষ্টা করার পর ওরা আশাহত হয়ে স্টেশনের দিকে এগোতে লাগল। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে শালবনের ভেতর দিয়ে লাইন ধরে স্টেশনের পথ।

বনের পথ অন্ধকার। তাই টর্চের আলোয় পথ দেখে এগোতে লাগল ওরা। শুভঙ্কর ও মউ অবাক বিস্ময়ে দেখল, এক জায়গায় ঝোপের ধারে লাল রঙের একটি মোটরবাইক রাখা আছে। আর ঠিক তার কাছাকাছি হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে আছে কে যেন একজন। কে, কে ও?

ওরা দু'জনেই ছুটে গেল সেইদিকে। গিয়ে দেখল গুলিবিদ্ধ একজন লোক অন্তিম শয়নে লুটিয়ে আছে মাটির বুকে। ওর এক হাতে জঙ্গলের মেথিঘাস মুঠো করে ধরা। অন্য হাত আঁকড়ে আছে শক্ত একটি পাথর আসলে মৃত্যুর যন্ত্রণায় ছটফট করতে-করতে মানুষ যা-কিছু হাতের সামনে পায় তাই ধরেই আবার বেঁচে উঠতে চায়।

মউ বলল, "এ তো সেই লোক।"

"হ্যাঁ, ভচু। মুখ না দেখতে পেলেও চিনতে পেরেছি ওকে। যে তোমাকে ছাদের ওপর আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল। কড়ির সর্পাঘাতে মৃত্যুর পর সোনার গণপতি নিয়ে যে একাই পালিয়ে যাওয়ার মতো দুর্বুদ্ধি মাথায় এনে ভুল করেছিল।"

মউ বলল, "দুর্বুদ্ধি কেন?"

"ওই অভিশপ্ত গণপতিকে নিয়ে কোনওরকমেই চালাকি করা যায় না। এই সত্যটা ও জানত না, অথবা জেনেও অবজ্ঞা করেছিল।"

"সোনার গণপতি তা হলে কোথায়?"

pathagar.net

"আপাতত শিকারিবাজের হাতে। সে এত বোকা নয় যে, এই মূর্তি উদ্ধারের দায়িত্ব এদের দু'জনের হাতে ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকবে। কার্যোদ্ধারের পর ওর পালিয়ে যাওয়ার মতলব টের পেয়েই ওকে গুলি করেছে। অথবা দলের লোককে ফাঁকি দেবে বলে এটাই তার পরিকল্পনা।"

ওরা দু'জনে ভচুকে পরীক্ষা করে দেখল সত্যই সে মৃত। তারপর পকেট হাতড়ে কোনও কিছুই না পেয়ে কী যে করবে সেই ব্যাপারেই চিন্তা করতে লাগল।

মউ বলল, "শিকারিবাজের হাতে সোনার গণপতি যদি সত্যিই পড়ে থাকে তা হলে বিল্টুদাকে বাঁচানো আর আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ওকে হত্যা করে বিজয় উল্লাসে কনকদুর্গার মন্দিরের সামনে নির্জন অরণ্যে পৈশাচিক নৃত্য করবে ও। এই রাতই বিল্টুদার জীবনের শেষ রাত। আর সেইসঙ্গে হয়তো তিন্নিরও। তিন্নিকে নিয়ে ওরা কী যে করবে তা কে জানে?"

"তা হলে এখন উপায়?"

"তবু দেখতে হবে।"

"কিন্তু কীভাবে?"

"ওই বাইকটা নিয়েই যাব।"

"তুমি একা যাবে?"

"একা কেন? তুমিও যাবে।"

"তুমি তো ডবল ক্যারি করতে পারো না?"

"আসলে করিনি কোনওদিন। তবে আজ একটু চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী?"

"জয় বাবা গণেশ। আমার কিন্তু ভয় করছে খুব।"

"ভয় কী! কাল অমন দুর্ঘটনার পরও আমি তো আবার সাহসে ভর করে সেই বাইকেই চাপছি। তবে এখন তো আর উঁচু-নিচু পথ বা খানাখন্দ পাব না। এখন পিচঢালা মসৃণ পথ ধরে আমরা যাব। তুমি খুব শক্ত করে ধরে থাকবে আমাকে। আমি অবশ্য আস্তেই চালাব। না হলে দু'জনেই মরব একসঙ্গে।

ওরা সেই মোটরবাইকটাকে টেনে পথে নামাল। তারপর জঙ্গলের পথে না চালিয়ে ওটাকে ধরে টানতে-টানতে নিল এল বম্বে রোডে।

মউয়ের দক্ষতা দেখে অবাক হয়ে গেল শুভঙ্কর। ওর চেয়ে তো এক বছরের ছোট। অথচ কী দারুণ স্মার্ট। সাহসী। গ্রামের মেয়ে! বাস করে শহুরে পরিবেশ থেকে অনেক দূরে। তবু কী দুরন্ত, দুর্বার।

মোটরবাইকে চেপে বসে স্টার্ট দিয়ে শুভঙ্করকে বলল মউ, "নাও, বসে পড়ো। যদি ভয় করে চোখ বুজে থেকো। কোনওরকমে গিধনি পর্যন্ত যদি যেতে পারি তা হলে চিলকিগড় পৌঁছতে দেরি হবে না। এখন দেখি ঠাকুরের কী ইচ্ছে।"

জ্যোৎস্না-মাখা অন্ধকারে মউয়ের মোটরবাইক ভট্‌ভটিয়ে এগিয়ে চলল। প্রথমে দু-একবার টলমল করলেও ফাঁকা এবং সরল রাস্তায় বেশ খানিকক্ষণ যাওয়ার পরই আয়ত্তে এসে গেল সব। বাইকটা যখন একটু-একটু করে জোরে

pathagar.net

স্পিড নিতে লাগল, সেই সময়ই বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর হঠাৎ এক জায়গায় গিয়ে থেমে গেল বাইকটা।

কী হল ? তেল-টেল নেই নাকি ? হয়তো তাই। তা হলে উপায় ?

জায়গাটা শহর থেকে দূরে নির্জনে। কাছেপিঠে কোথাও কোনও লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নেই। দু'পাশে মাঠ আর জঙ্গল। জঙ্গল অবশ্য ঘন নয়। রাতের আবছায়ায় দেখলে ভয় করে। দূরের পাহাড়গুলোকেও আর দেখা যাচ্ছে না। অর্থাৎ পার্বত্য পটভূমিকার বাইরে চলে এসেছে ওরা।

শুভঙ্কর বলল, "এ কোথায় এলাম আমরা ?"

"ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে এটুকু বুঝতে পারছি, গিধনি এখনও অনেকদূর।"

"তা হলে উপায় ?"

"উপায় একটা হবেই। এখন এর মায়া ত্যাগ করে পায়ে হেঁটেই যতটা পারি এগিয়ে যাই চলো।"

"এই নির্জনে এত রাতে আমাদের হেঁটে যাওয়াটা কি ঠিক হবে ?"

"আঃ, চলোই না। থেমে থাকার সময় নেই আর। যেতে-যেতে আবার চেষ্টা করব কোনও যানবাহন দেখলে থামাতে।"

শুভঙ্কর বলল, "তাই চলো। তবে আমার মাথায় কিন্তু একটা অন্য বুদ্ধি এসেছে।"

"কীরকম শুনি ?"

"আমি বলি কি, আমরা দু'জনে এই রাতদুপুরে অযথা পথ হাঁটার ঝুঁকি না নিয়ে মোটরবাইকটাকে বরং রাস্তার মাঝখানে শুইয়ে রাখি।"

"তারপর ?"

"তারপর দ্যাখোই না মজাটা।"

"তুমি কী বলতে চাইছ ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"এ আর না বোঝার কী আছে ? এটাকে রাস্তার মাঝখানে ফেলে রাখলে হবে কি, এই পথে কোনও গাড়ি এসে পড়লে থামতে সে বাধ্য হবেই। আর আমরা তখন আমাদের বিপদের কথাটা তাদের বুঝিয়ে বলে সেই গাড়িতেই চলে যেতে পারব বাকি পথটুকু।"

"দি আইডিয়া। তাই করো।"

ওরা আর কোনওরকম ভাবনা-চিন্তা না করে মোটরবাইকটাকে এনে রাস্তার মাঝখানে এমনভাবে শুইয়ে রাখল যে, আপ-ডাউনে যে-কোনও পরিবহণই আসুক না কেন থামতে তাকে হবেই।

ওদের সিদ্ধান্ত নির্ভুল।

দ্রুতবেগে আসা লাল রঙের একটা মারুতি গাড়ি হঠাৎ ক্যাঁ-ক্যাঁচ করে ব্রেক কষল।

গাড়ির ভেতর থেকে এক সুন্দরী তরুণী তার বব করা চুল দুলিয়ে রীতিমত বিরক্ত হয়ে নেমে এসে বলল, "এইরকম কাজটা কার ?"

শুভঙ্কর বলল, "আমার।"

"রাস্তার মাঝখানে এইভাবে এটা রাখে ?"

pathagar.net

শুভঙ্কর বলল, "আমরা এটাকে ইচ্ছে করেই রেখেছি দিদি। নিরুপায় হয়ে।"

"হঠাৎ এইরকম ইচ্ছের কারণ ?"

"আসলে আমাদের এই গাড়িটা আর চলছে না। হয় তেল নেই, না হলে কিছুর গোলমাল হয়ে খারাপ হয়ে গেছে। কখন থেকে চেষ্টা করছি হাত দেখিয়ে কোনও গাড়িকে থামাবার। কিন্তু কিছুতেই পারছি না। তাই বাধ্য হয়েই এ-কাজ করেছি।"

তরুণী একবার সন্দেহের চোখে ওদের দু'জনকে তাকিয়ে দেখল। তারপর বলল, "তোমাদের সাহস তো কম নয়, এই বয়সের ছেলেমেয়ে তোমরা, এত রাত্রে মোটরবাইক নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছ। তা বেরোবার আগে ভাল করে দ্যাখোওনি গাড়িতে তেল-টেল আছে কি না ? বাড়ি থেকে পালাচ্ছিলে বুঝি ?"

শুভঙ্কর বলল, "আপনার সন্দেহ ভুল।"

"তোমাদের মা-বাবাই বা কীরকম ? এইসব কমবয়সী ছেলেমেয়ের হাতে এইরকম একটা ভারী জিনিস তুলে দিয়েছেন ?"

মউ বলল, "আসলে এটা আমাদের নয়। অন্য একজনের জিনিস নিয়ে পালিয়ে এসেছি।"

"স্ট্রেঞ্জ ! কী সাঙ্ঘাতিক তোমরা !"

"এ ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। বিশেষ প্রয়োজনে এক্ষুনি আমাদের গিধনিতে যেতে হবে। তাই এ-কাজ করেছি।"

"বুঝেছি। কিন্তু যাই করে থাকো না কেন, খুব অন্যায় করেছ। এখন এটাকে পথ থেকে সরাও, না হলে গাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে না।"

ততক্ষণে ডাউনে একটি মোটর এবং আগে একটি ট্রাক এসে থেমেছে।

শুভঙ্কর ও মউ পথের বাধা সেই মোটরবাইকটাকে ধরাধরি করে সরিয়ে রাখল একপাশে।

ট্রাক ও মোটর উধাও হয়ে গেল।

মউ কাতর কণ্ঠে বলল, "আপনি কি অনুগ্রহ করে আপনার গাড়িতে আমাদের একটু লিফ্‌ট দেবেন ?"

তরুণী মউয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে কিছুক্ষণ কী যেন দেখল। তারপর বলল, "ঠিক আছে ওঠো। ভেতরে ঢুকে বসো তুমি। আমার সামনের সিটে বসো।"

শুভঙ্করও উঠতে যাচ্ছিল। তরুণী হেসে বলল, "তুমি না। তুমি তো এখন আমাদের মধ্যে হিরো। চেষ্টা করে দ্যাখো গাড়িটাকে একটু ঠেলতে পারো কি না ? দেখব, তোমার গায়ে কত জোর।"

মউ বলল, "ও একা পারবে না। আমরা দু'জনেই ঠেলব ?"

তরুণী বলল, "আমি কিন্তু এদের একদম পছন্দ করি না।"

শুভঙ্কর বলল, "কোনও দরকার নেই। এ আমি একাই পারব। মারুতি হালকা গাড়ি। না পারার কিছু নেই।"

তরুণী ড্রাইভারের সিটে বসে স্টিয়ারিং ধরল। আর মউ বসল ওর পাশটিতে। শুভঙ্কর পেছন দিকে গিয়ে যেই না গাড়িটা ঠেলতে যাবে গাড়ি

pathagar.net

অমনি হুশ করে ঝড়ের বেগে হাওয়া।

॥ ৯ ॥

ঠিক এইরকম একটা ঘটনা যে ঘটে যাবে তা কেউ ভাবতেও পারেনি। মউ তো বিমূঢ়। গাড়ির ভেতর থেকে চিৎকার করতে লাগল, "থামান। থামান। থামান বলছি। শিগগির গাড়ি থামান। এ কী করছেন? ছেলেটাকে এই রাত দুপুরে একা ফেলে রেখে আপনি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?"

তরুণী গাড়ির গতি না কমিয়েই একটা রিভলভার দেখাল মউকে, "একদম চুপ। না হলে দেখছ তো? একটি গুলিতে তোমার খুলি আমি উড়িয়ে দেব। ফাটা মাথা দু'ফাঁক হয়ে যাবে একেবারে।"

মউ গম্ভীর গলায় বলল, "আপনার একটু রং টার্গেট হয়ে গেছে ম্যাডাম। আপনি আমাকে চেনেন না বলেই এই ভুলটা করলেন। গাড়ি থামান বলছি।"

তরুণী হেসে বলল, "এ-গাড়ি কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের আগে থামছে না। তা ছাড়া আমি কখনও তোমার মতো ফুটফুটে এবং সুন্দরী কিশোরীকে হাতের মুঠোয় পেয়ে ছেড়ে দিই না।"

"আপনি কী করতে চান আমাকে নিয়ে?"

"অনেক কিছু। একটু পরে আমার এই গাড়ির পেছন দিকের ডালাটা তুললেই দেখতে পাবে একটি ছেলের লাশ ঢোকানো আছে। চাকুলিয়া পৌঁছে রেলের ক্রসিং-এর কাছে একবার গাড়িটা থামলে ওটাকে তুমি টেনেহিঁচড়ে লাইনের ওপর শুইয়ে দেবে। চটপট করবে কিন্তু। এইটাই তোমার প্রথম কাজ।"

মউয়ের হাত-পা কাঁপতে লাগল। বলল, "পারব না।"

"প্রথম-প্রথম এইসব কাজ করতে তোমার একটু অসুবিধে হবে। তবে এ-কাজ বেশিদিন করতে হবে না। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে আর দু'-এক বছর বাদেই তুমি আমার অন্য কাজে লেগে যাবে!"

"আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনও কাজই আমি করতে রাজি নই।"

"এখন থেকে আমার ইচ্ছেতেই সব কাজ তুমি করবে।"

"কে আপনি জানতে পারি কি?"

"নিশ্চয়ই। আমি এক 'বাঘিনী চিতা'। এই নামেই আমাকে সবাই চেনে।"

"বাঘিনী চিতা!"

"হ্যাঁ। পুলিশের খাতার প্রতিটি পাতায় আমার এই নাম অতি সুন্দরভাবে লেখা আছে। আমি এ-পর্যন্ত কত ছেলেকে হত্যা করেছি জানো?"

"কী করে জানব?"

"তেইশটা। তবে খুনের সংখ্যা যে হারে বাড়ছে তাতে মনে হচ্ছে বছরখানেকের মধ্যেই আমি একশো পূর্ণ করে ফেলব।"

"কী সাঙ্ঘাতিক আপনি!"

pathagar.net

"আমার দলে তোমার মতন দশটি মেয়ে কাজ করে। তারা অবশ্য তোমার চেয়ে অনেক বড়। এর ভেতর থেকে আমার অবাধ্য হওয়ার জন্য আমি সম্প্রতি দু'জনকে গুলি করে মেরেছি। আশা করি তুমি আমার অবাধ্য হবে না এবং আমাকে মেনে চলবে।"

"কিন্তু ছেলেদের ওপর আপনার রাগের কারণটা ?"

"সেটা এখনই জানবার প্রয়োজন নেই। আর দু-এক বছর বাদে নিজের থেকেই জানতে পারবে সব।"

মউ কিছুক্ষণ ঘাড় হেঁট করে বসে থেকে জিজ্ঞেস করল, "এই ছেলেটির অপরাধ ?"

"এই অবাঙালি ছেলেটির নাম লুল্লু। ও টাটানগরের জুবিলি পার্কের সন্ত্রাস। ওর অত্যাচারে কেউ ওখানে নির্ভয়ে ঘোরাফেরা করতে পারে না। তাই আমার একটি থাবায় ওর অত্যাচারের শেষ করে দিলাম।"

"এই লঘু পাপে এইরকম গুরুদণ্ডের কোনও মানে হয় ?"

"এটা লঘু পাপ নয় খুকুমণি। আমার আদালতে মানুষের অবমাননাকারীর একমাত্র শাস্তি হল মৃত্যু।"

মউ বলল, "আপনি আরও যাদের খুন করেছেন তাদের অপরাধ ?"

"কিছু-না-কিছু আছেই। কেউ মেয়ের বাবার গলা টিপে পণ নিয়েছে। কেউ টাকার লোভে একটা বউকে পুড়িয়ে মেরে আবার একটা বিয়ে করেছে। আমার সন্ধানী দলের মেয়েরা সব সময় লক্ষ রাখে এই ক্রিমিন্যালদের। ওদের কাজই হল এই। আমি পাকাপাকিভাবে খোঁজখবর নিয়ে ওদের গতিবিধি লক্ষ করি। তারপর একদিন সুযোগ-সুবিধে মতো নিজে এগিয়ে যাই আমার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে। আমি এখন হিংস্র বাঘিনী। আমার থাবা থেকে এখন কারও মুক্তি নেই। তবে সবচেয়ে মজার ব্যাপার কী জানো ? আমি বর্ধমানে যাকে মারি তার লাশ ফেলে দিয়ে আসি মেদিনীপুরে। আবার মেদিনীপুরে যাকে মারি তাকে শুইয়ে রাখি বাঁকুড়ায়। এই যে ছেলেটার লাশ বয়ে নিয়ে যাচ্ছি একে নামাব চাকুলিয়ায়।"

মউ বলল, "আপনার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। আমি বুঝতে পারছি জীবনে আপনি মারাত্মক রকমের ঘা খেয়ে এইরকম হয়ে উঠেছেন। প্রথমে আপনাকে আমি ভয়ঙ্কর ভেবেছিলাম। এখন তো দেখছি আপনি দেবী দুর্গা। আজ প্রতিটি মেয়ের উচিত আপনাকে সাহায্য করা।"

তরুণী বলল, "তাহলে তুমি আমার সঙ্গে কাজ করতে রাজি আছ ?"

মউ বলল, "রাজি মানে ? এককথায় রাজি।"

মউ একটু থেমে শুরু করল, "আপনি শুধু আমাকে দয়া করে আপনার এই রিভলভারটা কীভাবে চালাতে হয় একবার শিখিয়ে দিন। তারপর দেখুন কী কেলেঙ্কারিটাই না করে বেড়াই আমি। আপনার মতো বছরে একশোটা নয়, মাসে একশোটা খুনই হবে আমার প্রধান লক্ষ্য।"

"বলো কী ?"

"আসলে আমিও একজনকে মারবার জন্য মনে-মনে ছটফট করছি।"

"সত্যি ! সত্যি বলছ তুমি ?"

pathagar.net

"আপনার মতো দেখতে আমারও এক দিদি ছিল। আমরা খুব গরিব। আমার বাবা যে কী কষ্ট করে আমার দিদির বিয়ে দিয়েছিলেন তা আমি আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। দিদির বিয়ে দিয়ে কতদিন যে আমরা উপোসে থেকেছি তার ঠিক নেই। কিন্তু যারা আমাদের সর্বস্ব নিল, তারা...।"

"থাক। আর বলতে হবে না। পরেরটা আমি জানি। মানুষ নামের সভ্য জাতির ঘরে-ঘরে আজ এই একই ছবি। তুমি তোমার নির্যাতিত দিদির অপমানের বদলা নিতে চাইছ। এই তো?"

"হ্যাঁ। ঠিকই ধরেছেন আপনি।"

"এই ছেলেটি তোমার কে?"

"আমার দাদা।"

"মিথ্যে কথা বলছ। দেখে কিন্তু তা তো মনে হল না। তা ছাড়া চেহারাতেও আদৌ মিল নেই।"

"দাদা বলতে আমার বন্ধু। দাদার মতো।"

"নিজের দাদা তো নয়?"

"না।"

"এত রাতে কোথায় যাচ্ছিলে তোমরা?"

"প্রতিশোধ নিতে।"

"কার?"

"ওই যে বললাম।"

"ভগবান রক্ষে করেছেন যে আমার সঙ্গেই তোমার দেখা হয়ে গেছে। তোমার বয়সী কোনও অনাত্মীয় ছেলেকে কখনও বিশ্বাস কোরো না।"

"শুভঙ্কর কিন্তু খুব ভাল ছেলে।"

"মানছি। তবুও... বাড়িতে কে-কে আছেন তোমার?"

"একমাত্র মা ছাড়া আর আমার কেউ নেই।"

"তা হলে তো ভালই হল। ঘরের টান থাকলে এইসব লাইনে মন দিয়ে কাজ করা যায় না। তুমি আমার কাছে কিছুদিন থাকো। তারপর তোমার মায়ের ব্যবস্থা করছি। কালই আমার লোক দিয়ে তোমার মায়ের কাছে খবর পাঠাব আর কিছু টাকাও পাঠিয়ে দেব।"

"তা যদি করেন তা হলে আপনার ঋণ আমি কখনও শোধ করতে পারব না দিদি।"

রাতের অস্পষ্টতা ভেদ করে মারুতি গাড়িটা ভীষণ বেগে ছুটে চলেছে। যেতে-যেতে হঠাৎ এক জায়গায় থেমে গেল গাড়িটা। তরুণী বলল, "এই দ্যাখো, রেল লাইন। একা পারবে তো লাশটাকে টেনে নামাতে?"

"খুব পারব?"

"থ্যাঙ্ক ইউ। ওটাকে টেনে-হিঁচড়ে যেভাবেই হোক, শুইয়ে রেখে এসো লাইনের ওপর। সামান্য কাজ। এই দিয়েই তোমার হাতেখড়ি হোক। একদম দ্বিধা করবে না, ভয় পাবে না। জেনে রেখো, এই হিংসার পৃথিবীতে হিংসা ছাড়া বাঁচার কোনও পথ নেই।"

মউ নামল।

pathagar.net

তরুণীও নামল পথে। তারপর গাড়ির পেছন দিকে গিয়ে ডালাটা টেনে তুলেই বলল, "একটু তাড়াতাড়ি করো। এসব কাজ চটপট করে ফেলতে হয়। একদম দেরি করতে নেই।" তারপর বলল, "এ-জগতে আমরা বড়ই অসহায়। আমাদের আগামী দিন যে ভয়াবহ চেহারা নিয়ে এগিয়ে আসছে তাতে সন্দেহ নেই!" মউ কোনও কথা না বলে লাশটাকে টেনে নামাল গাড়ি থেকে। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স হবে ছেলেটির। ছেলে ঠিক নয়, যুবক বলা উচিত। লাশটাকে নামিয়ে টেনে-হিঁচড়ে লাইনের ওপর নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল। তারপর তরুণীর কাছে এসে বলল, "আপনার হুকুম ঠিকমতো তামিল করতে পেরেছি তো?"

"পেরেছ। আমার জীবনে এই প্রথম তোমার মতো স্মার্ট এবং সাহসী মেয়ে দেখলাম।"

"আসলে আমরা যে একই পথের পথিক।"

তরুণী বলল, "আমার মনে হচ্ছে, তোমাকে আমি খুব অল্পদিনের মধ্যেই তৈরি করে নিতে পারব।"

মউ বলল, "তা হলে আজই আমার হাতেখড়ি হোক। আপনি আমাকে আপনার রিভলভারটা কীভাবে ধরতে হয় একবার শিখিয়ে দিন। আমি ওই মৃতদেহটায় একটা গুলি করে আমার লক্ষ্যভেদ করি।"

"মৃতদেহে গুলি করে লাভ?"

"এটা তো গুলির জন্য গুলি নয়। শুধু ট্রেনিং নেওয়া। তারপর যখন লড়াইয়ে নামব দেখবেন, আমি কী করি। আমার লক্ষ্য সমাজের প্রতিটি স্তরের দুষ্কৃতীদের এক-এক করে শেষ করা।"

"ধরো যদি এইসব কাজ করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ো?"

"ধরা দেব। তবে এটুকু জেনে রাখবেন, পুলিশের সাধ্য নেই আমাকে জীবন্ত ধরার। সেরকম বুঝলে ধরা পড়ার পূর্ব মুহূর্তেই একটি গুলি অকৃপণভাবে খরচা করব আমি, আমার নিজের জন্য।"

"শাবাশ। এই নাও রিভলভার। এ-জিনিস তোমার হাতেই মানায়। তুমি বাংলার ফুলনদেবী হও।"

"মউ হাত পেতে রিভলভারটা নিল।"

যেভাবে বলল সেইভাবেই ধরল মউ।

তরুণী বলল, "এইখানটায় শক্ত করে ধরে ট্রিগারটা টিপে দেবে। যদি অসুবিধে মনে করো, তা হলে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের কব্জির কাছটা শক্ত করে ধরে থাকতে পারো। নাও রেডি! ওয়ান টু...।"

মউ সেটা হাতে নিয়ে এক-পা এক-পা করে নির্দেশ অনুযায়ী এগোতে লাগল মৃতদেহটার দিকে। তারপর কয়েক পা গিয়ে হঠাৎই ঘুরে দাঁড়াল।

তরুণী বলল, "কী হল ভয় পেলে?"

"না।"

"তবে?"

"ভাবছি মৃতকে মেরে লাভটা কী? জীবনে প্রথম টার্গেটের গুলিটা তো জীবন্ত মানুষকে মেরে খরচা করা উচিত?"

pathagar.net

"তার মানে ? কী বলতে চাইছ তুমি ?"

"যা বললাম তা তো বাংলাতেই বললাম। বুঝতে পারছেন না ?"

ভয়ে মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল তরুণীর। কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "এ কী ! তুমি অমন করে তাকাচ্ছ কেন আমার দিকে ? তুমি এক-পা, এক-পা করে আমার দিকে এগিয়ে আসছ কেন ?"

"হত্যা করব বলে। আজ রাতে আমি এমন এক বাঘিনীকে হত্যা করব যে এ-পর্যন্ত তেইশটি শিকার ধরেছে। আমার রিভলভারের একটি গুলিতে আমি তার হত্যালীলা বন্ধ করে দেব।"

"তার মানে তুমি আমাকেই মারবে ?"

"হ্যাঁ। না হলে আপনার হাতে আরও কত প্রাণ যে অকালে ঝরে যাবে তার ঠিক নেই। আপনি এখন মৃত্যুর জন্য তৈরি হোন।"

তরুণী ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল, "না-আ-আ।"

কিন্তু করলে কী হবে ?

ততক্ষণে মউ কঠিন হাতে ট্রিগারটা টিপে দিয়েছে, ডিস্যুম।

রক্তাপ্লুত তরুণী লুটিয়ে পড়ল পথের ধুলোয়। মউয়ের মনটা খারাপ হয়ে গেল। একটু আগে যে মানবীর সঙ্গে ও কথা বলছিল, এই মুহূর্তে সেই মানবীর এইরকম একটা পরিণতি কি ভাবা যায় ? বিশেষ করে ও নিজে যার মৃত্যুর জন্য দায়ী। ও কি কখনও স্বপ্নেও ভেবেছিল এত অল্প বয়সে ওর হাত দিয়েই একটি তাজা প্রাণ এইভাবে খসে পড়বে বলে ? অথচ এই বাঘিনীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার এ ছাড়া আর কোনও উপায়ও ছিল না।

এই হত্যাকাণ্ডের পর আর এক মুহূর্তও সেখানে দাঁড়িয়ে না থেকে গা ঢাকা দিল মউ। ঘটনাস্থল থেকে বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে একটি গাছের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখল। কেননা, অন্ধকার এখানে ঘন নয়। ফিনফিনে জ্যোৎস্নায় সব কিছুই এখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এখন ও কীভাবে কী করবে, কোথায় যে যাবে কিছুই ঠিক করতে পারল না। শুভঙ্কর এখন কতদূরে তাই বা কে জানে ? মোটরে তো অনেকটা পথ চলে এসেছে। এখন কি ও শুভঙ্করের কাছে ফিরে যাবে ? না এগিয়ে যাবে গিধনি হয়ে চিলকিগড়ের দিকে ? শুভঙ্করটা এখন কী করছে কে জানে ? আর তো কোনও গাড়িও আসছে না যে সেটাকে থামিয়ে একটু ম্যানেজ করে চলে যাবে। বিশেষ করে সামান্য কিছু দূরেই যেখানে মারুতির পাশে তরুণীর তাজা লাশ পড়ে আছে, সেখানে কোনও গাড়িকে থামাতে গেলেই যে কেউ সন্দেহ করবে ওকে। হাজার হলেও ও এখন খুনি। এখন লোকজন ডেকে নিজেকে ধরিয়ে দেওয়ার চেয়ে পলাতকের ভূমিকা নেওয়াই ভাল। কিন্তু পালিয়ে ও যাবে কোথায় ? এই রাতে হাঁটা পথে এই পথ ধরে এগিয়ে যাওয়াও যেমন নিরাপদ নয়, তেমনই ওর পক্ষে সম্পূর্ণ এককভাবে এই গভীর রাতে চিলকিগড়ে গিয়ে ডুলুং নদী পার হওয়াও বিপজ্জনক ব্যাপার। একে এই দীর্ঘ পথ। তার ওপর গভীর জঙ্গল। মধ্যে বর্ষায় স্ফীত দুরন্ত ডুলুং। একজন কেউ সঙ্গে থাকলে ভাল হয়। একেবারে একা কী এইসব কাজ করা যায় ?

যাই হোক, ও যখন বিশাল গুঁড়ির একটি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে এইসব

pathagar.net

ভাবছে তখন হঠাৎই দ্রুতগতিতে ছুটে আসা একটি ট্রাক থামল সেখানে। আর সেই ট্রাকের ড্রাইভারের সিটের পাশ থেকে লাফিয়ে নামল শুভঙ্কর। ছুটে গেল সেই পড়ে থাকা মারুতিটার কাছে। তরুণীর লাশ দেখে শিউরে উঠল, এই তো! এই তো সেই মহিলা। কিন্তু মউ কোথায়? কোথায় গেল সে?

সর্দারজিও তখন ড্রাইভারের সিট থেকে নেমে এগিয়ে গেছেন শুভঙ্করের দিকে, "মিল গিয়া ও লেড়কি কো?"

"না সর্দারজি। কী যে হল ব্যাপারটা কিছু বুঝতেই পারছি না। এই মহিলাই বা খুন হলেন কীভাবে, আর আমাদের মেয়েটিই বা কই?"

মউ আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। এতক্ষণে আত্মপ্রকাশ করল সে। গাছের আড়াল থেকে ছুটে গেল শুভঙ্করের কাছে।

বিস্মিত শুভঙ্কর জিজ্ঞেস করল, "এ কী, মউ! এতক্ষণ কোথায় ছিলে তুমি?"

"ওই গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিলাম।"

"আমি তো ভাবলাম আবার নতুন করে কোনও বিপদ হল বুঝি তোমার।"

"বিপদ হতে আর বাকি কী ছিল? তবু ভাল যে ঠিক সময়ে তুমি এসে পড়লে। না হলে একা আমি দারুণ নার্ভাস হয়ে পড়ছিলাম।"

শুভঙ্কর বলল, "ভাগ্যটা সত্যি ভাল। না হলে আবার যে তোমাকে ফিরে পাব তা কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি। এই সর্দারজি আমাকে দয়া করে ওঁর গাড়িতে তুলে নিয়েছেন। উনি সাহায্য না করলে এত তাড়াতাড়ি আমি তোমার কাছে আসতে পারতাম না।"

সর্দারজি তরুণীর মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলেন, "এ ক্যা হাল হো গিয়া?"

শুভঙ্কর বলল, "আপনাকে বলছিলাম না সর্দারজি, এই মহিলাই আমার বোনকে চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছিল।"

"লেকিন ইনকো মার্ডার কিনোনে কিয়া?"

মউ বলল, "একটু আগে কয়েকজন লোক আমাদের গাড়ি থামিয়ে এই মহিলাকে মার্ডার করে পালিয়ে যায়।"

ততক্ষণে আরও কয়েকটি ট্রাক ও মোটর এসে থেমেছে, সবাই সবকিছু দেখেশুনে বলল, "এখানে অযথা ভিড় করা ঠিক নয়। যে-যার জায়গায় কেটে পড়ো।"

শুভঙ্কর সর্দারজিকে বলল, "সর্দারজি! আপনি দয়া করে আমাদের আর-একটু নিয়ে চলুন। গিধনি এলেই নেমে পড়ব আমরা।"

সর্দারজি বললেন, "জলদি করো, চটপট। হিঁয়া ঠারনা ঠিক নেহি। লেকিন ইয়ে বাত কিসিকো মাত বোলনা।"

শুভঙ্কর আর মউ আর একটুও সময় নষ্ট না করে উঠে বসল ট্রাকের ভেতর।

ট্রাক ছুটে চলল গিধনির দিকে।

গিধনি এখান থেকে খুব একটা বেশি দূরে নয়। তাই আধ ঘণ্টার মধ্যেই গিধনিতে পৌঁছে গেল ওরা।

pathagar.net

লেভেল ক্রসিং ডিঙিয়েই সর্দারজির ট্রাক নামিয়ে দিল ওদের। ওরাও সর্দারজিকে ধন্যবাদ জানিয়ে ট্রাক থেকে নেমে পড়ল। এখানটা বেশ ফাঁকা-ফাঁকা। এই জ্যোৎস্নালোকে দূরে কয়েকটি সাদা-সাদা ঘরবাড়ি দেখতে পেল ওরা। সে কী অপরূপ দৃশ্য।

মউ বলল, "আমি বাবার সঙ্গে একবার এখানে এসেছিলাম। ঠাকুরবাবার আশ্রম ওটা। দারুণ উৎসব হয় ওখানে। আর এই যে দেখছ বাঁ দিকের পথ, এই পথটা স্টেশন পর্যন্ত গিয়ে আবার ডান দিকে বাঁক নিয়েছে। দু' পাশে বন-জঙ্গল। তারই মাঝখান দিয়ে সুন্দর পিচ-ঢালা পথ। সেই পথ দিয়েই যেতে হবে আমাদের।"

"কতদূর?"

"ওরা সেই নির্জন পথ ধরে ধীরে-ধীরে এগিয়ে চলল। খানিক যাওয়ার পরই দেখল বাঁ দিকের একটি পথ বাজারের পাশ দিয়ে স্টেশনে গিয়ে পড়েছে। একপাশে একটি শীতলা মন্দির। ওরা সেদিকে না গিয়ে ডান দিকের পথ ধরল। এই পথই সোজা চলে গেছে চিলকিগড় হয়ে দূরে দূরান্তরে।

মউ বলল, "এই পথ হেঁটে পার হওয়া অনেকটা সময়ের ব্যাপার। অথচ এখন এই মুহূর্তে না হাঁটা ছাড়া কোনও উপায়ই নেই।"

ওরা সেই নির্জনে শুরু করল পথ হাঁটা। এখানটা স্টেশন রোড। তাই দু' পাশে দোকানপত্তর। সব দোকানেরই ঝাঁপ বন্ধ। কেননা, এখন গভীর রাত। সবাই এখন গভীর ঘুমে অচেতন।

ওরা হাঁটা পথে সবে কিছুটা এসেছে এমন সময় হঠাৎ দেখল, একদল হাতি পাশের একটি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে রাজপথ ধরেছে। এগুলো কিন্তু বুনো হাতি নয়। মাহুত বসে আছে সকলের পিঠে। পোষা হাতি।

তাই না দেখেই মউ ছুটে গিয়ে দেখাল ওদের। তারপর হেঁকে বলল, "তোমরা কোথায় যাবে গো? কতদূর?"

"আমরা অনেকদূর যাব, পুরুলিয়া।"

"চিলকিগড় পার হয়ে যাবে কি?"

"চিলকিগড়ের পাশ দিয়েই যাব। কেন বলো তো?"

"আমাদের একটু চিলকিগড়ে নামিয়ে দেবে ভাই? না হলে এই অন্ধকারে দু'জনের যেতে খুব ভয় করছে।"

মাহুতদের নির্দেশে হাতিরা থামল। একজন মাহুত নেমে এসে বলল, "তোমরা কারা? তোমাদের দেখে তো খুব ভাল ঘরের ছেলেমেয়ে বলেই মনে হচ্ছে। এত রাতে তোমরা দু'জনে চিলকিগড়ে কেন যাবে?"

মউ বলল, "সেসব কথা বলতে গেলে [illegible] লাগবে। তবে এটুকু জেনে রাখো, আমাদের খুব বিপদ।"

মাহুত বলল, "কিন্তু তোমাদের দেখে কেমন যেন ভয়-ভয় করছে। মনে হচ্ছে তোমরা বাড়ি থেকে পালিয়ে আসছ। তোমাদের সঙ্গে নিলে কোনও পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ব না তো?"

এতক্ষণে শুভঙ্কর কথা বলল, "না। বরং আমাদের না নিলেই তোমরা ওইসব

pathagar.net

ঝামেলায় জড়াবে। কেননা, আমি একজন পুলিশ অফিসারের ছেলে। আমাদের এক ভাই আর এক বোনকে কিছু দুষ্ট লোক নিয়ে গিয়ে চিলকিগড়ের জঙ্গলে লুকিয়ে রেখেছে। আমরা তাদের উদ্ধার করতে যাচ্ছি।"

মাহুতরা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। ওদেরই ভেতর থেকে একজন বলল, "ঠিক আছে। তুলে তো নাও। পরে দেখা যাবে।"

দলের প্রথম হাতিটি মাহুতের নির্দেশে হাঁটু মুড়ে বসলে শুভঙ্কর ও মউ চেপে বসল হাতির পিঠে।

এর পর আবার শুরু হল চলা। গজেন্দ্রগমনে ধীরে-ধীরে এগিয়ে চলল ওরা। সার্থক অভিযান। মউ দু' হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল। বলল, "মনে হচ্ছে ঠাকুরের নজর আমাদের ওপর পড়েছে।"

"কী করে বুঝলে?"

"সোনার গণপতির দর্শন না পেলেও জীবন্ত গণপতির দেখা তো পেয়েছি আমরা। জঙ্গলের লোকেরা হাতিকে গণেশ ঠাকুর বলে। তা সেই গণেশ ঠাকুর নিজেই আমাদের পিঠে করে বয়ে নিয়ে চলেছেন। ভেবে দ্যাখো তো এ কিসের ইঙ্গিত?"

শুভঙ্কর বলল, "ঠিক বলেছ তুমি। কিন্তু দৈব অনুগ্রহ যখন এইভাবেই বারেবারে পেয়ে চলেছি আমরা, তখন একটাই প্রশ্ন, কেন আমরা এইভাবে প্রতি পদে বাধা পাচ্ছি?"

"রহস্য তো এইটাই।"

"কী রহস্য বলো?"

"এর ভেতর দিয়েই হয়তো উনি আমাদের একাগ্রতাকে যাচাই করে নিচ্ছেন। উনি হয়তো দেখতে চাইছেন তাঁর প্রতি আমরা কতখানি নিষ্ঠাবান। তা ছাড়া এই বাধার ভেতর দিয়ে বাধাকে অতিক্রম করানোর মধ্যেই উনি আমাদের বুঝিয়ে দিতে চাইছেন যে, তাঁর নজর আমাদের ওপর আছে। পাওয়ার অব গডের প্রকাশ তো এইভাবেই হয়।"

হাতির দল এগিয়ে চলেছে। হাতির পিঠে বসে শাল গাছের মাথা ও আকাশ দেখতে-দেখতে তারাভরা রাতে জ্যোৎস্নাস্নাত হয়ে এইভাবে যাওয়া এই দুই কিশোর-কিশোরীর জীবনে এই প্রথম। তাই ওদের বারবারই মনে হতে লাগল এই অন্তবিহীন পথ যেন কখনও শেষ না হয়।

যেতে-যেতে শুভঙ্কর বলল, "শুনেছি হাতির পিঠে চাপলে নাকি রাজা হয়।"

"তুমি তা হলে নির্ঘাত রাজা হবে।"

"আমি যদি রাজা হই তুমি তা হলে রানি হবে।"

"আমার রানি হওয়ার খুব শখ। সোনার সিংহাসনে বসব। দাসীরা চামর দুলিয়ে বাতাস করবে। মাথায় মুকুট পরব। ভারী মজা হবে তাই না?"

"আমিও রাজা হয়ে প্রজাদের দণ্ডাদেশ দেব। ন্যায়বিচার করব। ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধে যাব। শিকার করব। ভারী মজা হবে তাই না?"

"তোমাকে তো রাজপুত্তুরের মতন দেখতে। মানাবে ভাল।"

"তুমিও তো রাজকন্যার মতো রূপসী। রানি হলে ভালই মানাবে।"

"ঠিক বলেছ রাজপুত্তুর। কিন্তু মন্ত্রিপুত্র, কোটালপুত্র কারা হবে?"

"মন্ত্রিপুত্র হবে আমার প্রাণের বন্ধু বিল্টু। আর কোটালপুত্র হবে শিকারিবাজ। তবে মুশকিল হচ্ছে এই, আমাদের রাজধানীটা কোথায় হবে? আমরা রাজত্ব করব কোথায়?"

"কেন, চিলকিগড়ে। সেখানে তো রাজবাড়ি একটা আছেই। সেটাই আমরা দখল করে নেব।"

"রাজারা রাজবাড়ির দখল দেবেন কেন?"

"রাজবাড়ির দরজায় ঝাণ্ডা পুঁতব। রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব।" বলেই হো-হো করে হেসে উঠল মউ। তারপর বলল, "কিন্তু মশাই, হাতির পিঠে চাপলে সবাই যদি রাজা হত তা হলে মাহুতরা রাজা হয় না কেন?"

"এ বড় কঠিন প্রশ্ন। সত্যিই তো, মাহুতরা রাজা হয় না কেন?"

মাহুত শুনে বলল, "কী সব আবোল-তাবোল বকছ? ওই দ্যাখো, চিলকিগড় এসে গেছে। এবার নামো দেখি?"

"চিলকিগড় এসে গেছে? কল্পনার সমস্ত জাল এক লহমায় ছিঁড়ে গেল যেন। এইবার শুধু সাহস আর বুদ্ধির প্যাঁচে কাজ হাসিল করতে হবে। কিন্তু বিল্টু, তিন্নি ওরা কি জীবিত আছে এখনও?

মাহুতের নির্দেশে হাতিরা থামলে ঝুপঝাপ করে নেমে পড়ল ওরা। তারপর ওদের বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে রাজপথ ছেড়ে মেঠোপথ ধরল দু'জনে।

আকাশে ভরন্ত চাঁদ। তবু সঙ্কীর্ণ পথ এবং ঘন গাছপালার জন্য টর্চ জ্বালতে হল। এই অন্ধকারের পথ অবশ্য বেশি দূর নয়। খানিক যাওয়ার পরই একটি খোলামেলা জায়গায় এসে পড়ল ওরা। কয়েকটি শিব মন্দির চোখে পড়ল ওদের। বাঁ দিকে বিশাল রাজবাড়ি। সাদা রং করায় মনে হচ্ছে যেন মার্বেল প্যালেস এটি। কী সুন্দর!

রাজবাড়ির সামনে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ওরা কিছুক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রাজবাড়ির দিকে। সুউচ্চ পাঁচিল দিয়ে চারপাশ ঘেরা। সামনেটা বাগান। নানারকমের ফুলগাছ রয়েছে সেখানে। রাজবাড়ির ছাদের আলসের দু' পাশে দুটো প্যাঁচা বসে আছে, মনে হয় লক্ষ্মীপ্যাঁচা।

মউ বলল, "শুভযাত্রার প্রতীক। নমস্কার করো।" বলে দু' হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল মউ।

দেখাদেখি শুভঙ্করও নমস্কার করল। তারপর ওরা ধীর পদে এগিয়ে চলল একটা বস্তির পাশ দিয়ে জঙ্গলের দিকে।

সবে কয়েক পা গেছে এমন সময় হঠাৎ ব্যাঘ্র বিক্রমে কোথা থেকে যেন কয়েকটি ক্ষুধার্ত কুকুর ছুটে এল ঘেউ-ঘেউ করে। সে কী প্রাণান্তকর চিৎকার। গায়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে আর কি। তারা এসে এক-এক করে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল ওদের। শুভঙ্কর ও মউ সভয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আর্তনাদ করে উঠল। আতঙ্কে নীল হয়ে গেল দু'জনে। সারা শরীরে যেন এক ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। উঃ, কী সাঙ্ঘাতিক।

কুকুরের চিৎকার এবং ওদের আর্তনাদে সবক'টি ঘর থেকেই লোকজন ছুটে এল হইহই করে। সবাই ভাবল নিশ্চয়ই কোনও চোর-ডাকাতের পদার্পণ ঘটেছে এখানে। কিন্তু তার বদলে যা দেখল তাতে সবাই অবাক হয়ে গেল। দেখল

pathagar.net

অনিন্দ্যসুন্দর দুই কিশোর-কিশোরী যেন স্বর্গের দ্যুতি নিয়ে স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে এই বনভূমিতে।

একজন প্রবীণ জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কারা ?"

শুভঙ্কর বলল, "আমরা দু' ভাই-বোন।"

"ভাই-বোন ? কোথায় থাকো তোমরা ?"

মউ বলল, "আমরা ধলভূমগড়ে থাকি। খুব বিপদে পড়ে এই গভীর রাতে আপনাদের এখানে আসতে বাধ্য হয়েছি আমরা। জীবন বিপন্ন করে এখানে এসেছি। এখন আপনারাই আমাদের সহায়।"

"আমরা তোমাদের জন্য কী করতে পারি বলো ? যদি সাধ্যে কুলোয় তা হলে নিশ্চয়ই কিছু করব তোমাদের জন্য।"

"আমরা আপনাদের কাছে সর্বতোভাবে সাহায্য চাই।"

"কী সাহায্য চাও ?"

শুভঙ্কর বলল, "আগে আপনারা এই কুকুরগুলোর হাত থেকে আমাদের বাঁচান।"

গ্রামবাসীদের তাড়া খেয়ে কুকুরগুলো সামান্য কিছু দূরে গিয়ে রাগে গরগর করতে লাগল।

মউ বলল, "আমাদের কথাগুলো আপনারা মন দিয়ে শুনুন। শিকারিবাজ নামে এক কুখ্যাত শয়তান আমার বাবাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে। শুধু তাই নয়, আমাদের এক ভাই ও বোনকে ওরা নিয়ে এসে লুকিয়ে রেখেছে এখানকার জঙ্গলে। শুনেছি আজ রাতে তাদেরই একজনকে বলি দেবে কনকদুর্গার মন্দিরে। যদি এতক্ষণে ওই ধরনের কোনও অঘটন ঘটে না থাকে, তা হলে যেভাবেই হোক তাদের উদ্ধার করতেই হবে। এই জঙ্গলে আমরা পথের দিশা খুঁজে পাব না। তাই আপনাদের কেউ আমাদের সঙ্গে চলুন।"

সব শুনে গ্রামবাসীরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু কেউ কোনও কথাই বলল না।

মউ বলল, "আপনারা চুপ করে গেলেন কেন ?"

শুভঙ্কর বলল, "কিছু তো বলুন ?"

একজন বলল, "আমাদের এই রাত দুপুরে ওই জঙ্গলে যাওয়ার অধিকার নেই।"

"কেন নেই ?"

"দেবীর নিষেধ।"

"কিন্তু আপনারা তো বিনা কারণে যাচ্ছেন না সেখানে। দুটি অসহায় কিশোর-কিশোরীর জীবন রক্ষা করতে চলেছেন।"

"তবুও আমরা ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি। তাই কোনও কারণেই দেবীর কোপে পড়তে চাই না।"

"এ আপনাদের সংস্কার। আপনাদের এইসব দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে গুণ্ডা-বদমাশ, চোর-ডাকাত সবাই তো রাতের-পর-রাত দিব্যি গা ঢাকা দিয়ে কাটিয়ে যাচ্ছে ওখানে। তা ছাড়া মন্দিরের আসল যে বিগ্রহ সেই কনকদুর্গাই তো নেই। তাকেই তো চুরি করে নিয়ে গেছে ডাকাতরা। তা হলে ?"

pathagar.net

"কিন্তু স্থানমাহাত্ম্য তো একটা আছে ? সন্ধের পর এখানকার মাটিতে পা দেওয়ার অধিকার পর্যন্ত নেই আমাদের। তা ছাড়া ওই মন্দিরে এখন তোমরা যাবেই বা কী করে ? ডুলুং-এ এখন বাড় এসেছে। সেই নদী পার হওয়াও তো বিপজ্জনক।"

মউ বলল, "মন্দিরে পুজোপাঠ কী করে হয় তা হলে ?"

"এই গ্রামেই মায়ের সেবাইত ব্রাহ্মণ থাকেন। তিনিই সকালে গিয়ে পুজোপাঠ সেরে মন্দিরে চাবি দিয়ে বিকেলে ফিরে আসেন।"

"তিনি কীভাবে যান ? সাঁতার কেটে ?"

"না. তা অবশ্য নয়। রঙিন মাঝি নৌকো বেয়ে ওপারে নিয়ে যায়।"

"তা হলে রঙিন মাঝিকেই একবার বলুন, আমাদের যেন পার করে দেয়।"

"কিন্তু রঙিন মাঝি পার করবে কেন ? শিকারিবাজ জানতে পারলে ওকে আস্ত রাখবে ?"

এমন সময় হঠাৎই কোথা থেকে ভীষণদর্শন এক বেঁটেখাটো আদিবাসী যুবক তীর-কাঁড় নিয়ে এগিয়ে এসে বলল, "কাউকে কোথাও যেতে হবেক নাই। তুরা আয় দেখি আমার সাথে। আমি তুদের উপারকে লিয়ে যাব। আমার এই তীর-কাঁড়ের সামনে যে আসবে তাকেই খতম করে দেব আমি। তা সে শিকারিবাজই হোক, আর যে-ই হোক।"

মউ ছুটে গিয়ে তার হাত দুটো ধরে বলল, "সত্যিই তুমি আমাদেরকে ওপারে নিয়ে যাবে ? আমরা তা হলে সারা জীবন তোমার বন্ধু হয়ে থাকব। আমার হাতের আংটিটা তোমাকে উপহার দেব।"

শুভঙ্কর বলল, "আমি তোমাকে একশোটা টাকা দেব। এখন না হলেও পরে একটা ঘড়ি কিনে দেব।"

যুবক হাসল। হেসে বলল, "উসব লিয়ে আমি কী করব রে ? আমি তো আদিবাসী। ওই শয়তানটার ভয়ে ইখানকার ভেড়াগুলো কাঁপে। আমি আজ নিজে হাতে ওই শয়তানটাকে বধ করব।"

মউ বলল, "না। তা তুমি করবে না। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আমি নিজে ওর বুক চিরে রক্তপান করব। ও আমার বাবার বুকে গুলি করেছে। তারই বদলা আমি নেব। তুমি শুধু নদীটা পার করে দেবে আমাদের। তা হলেই তোমার ছুটি।"

গ্রামবাসীদের একজন বলল, "একটা মশাল অন্তত নিয়ে যাও তোমরা।"

মউ বলল, "না। আমাদের কাছে টর্চ আছে। তা ছাড়া আলো জ্বেলে ওই পথে গেলে ওরা সতর্ক হয়ে যাবে। আমরা যাব অন্ধকারে মিশে সরীসৃপের মতো বুকে হেঁটে। যাতে নিশাচর পশুপাখিরা পর্যন্ত আমাদের উপস্থিতি টের না পায়।"

যুবক ওদের অন্ধকার গ্রাম্যপথ ধরে নদীর কাছে নিয়ে এল। চম্বলের বেহড়ের মতো একটা ঢালু বাঁধের ফাটল বেয়ে ওরা যখন নদীর কাছে এল, তখন দেখল ওপারে জঙ্গলের মধ্যে টিমটিম করে একটা মশাল জ্বলছে। তার মানেই শয়তানরা এখনও আছে ওখানে।

নদীর তখন সে কী উন্মত্ত রূপ। কলকল রবে বড়-বড় পাথরে ধাক্কা খেয়ে

pathagar.net

কচ্ছপের পিঠের মতো পাক খেয়ে ছুটে চলেছে নদী। এই ডুলুং এখন সুন্দরী নয়। বর্ষায় দুরন্ত দুর্বার।

আদিবাসী যুবক অন্ধকারে নদীগর্ভে নেমে কোথা থেকে যেন গাছের ডালের সঙ্গে বেঁধে রাখা একটা কলাগাছের ভেলা টেনে নিয়ে এল। সেইসঙ্গে নিয়ে এল লম্বা একটি বাঁশের লগি। তারপর ওদেরকে ভেলায় তুলে লগি বেয়ে নিয়ে এল মাঝ দরিয়ায়। প্রবল প্রবাহে ভেলাটা কাগজের নৌকোর মতো ভেসে চলল। যুবক লগি হাতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল স্থাণুর মতো।

মউ বলল, "এ কী! এ কোথায় ভেসে চলেছি আমরা?"

যুবক হেসে বলল, "লদী সিখানকে লিয়ে যাবেক আমাদের।"

"তার মানে?"

"খানিক বাদে বাঁকের মুখে ডাঙা পাব। তখনই একটা উপায় হবেক। নইলে ইমনিতে তো পারাপার করা যাবেক নাই।"

শুভঙ্কর বলল, "কিন্তু তুমি হাল ছেড়ে দিলে কেন? একটু চেষ্টা অন্তত করো। এইভাবে গেলে তো মাইলের পর মাইল চলে যাব আমরা।"

যুবক এবার একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "তুরা কনকদুর্গার মন্দিরে কী জন্য যাইছিলি?"

শুভঙ্কর বলল, "কে তুই! আমার মনে হচ্ছে তোর মতলব ভাল নয়! তুই নিশ্চয়ই শিকারিবাজের লোক।"

যুবক হাসল। হেসে বলল, "আমি বুনো। বুনোয়ারি হাঁসদা। ইখানে আমি জঙ্গল-শের। তুদের শিকারিবাজের সাধ্যি নাই আমার সঙ্গে পাল্লা দেয়। তবে ঔর সাথে আমার দোস্তি আছে। এই চিলকিগড়ে আমি এসেছিলাম পুলিশের মুকাবিলা করতে। ইখানে তুদের দিখা পেয়ে বুঝলম পুলিশ ইখানকার ঠেক এখনও পায় নাই। তাই আমিই তুদের সাথী হয়ে গেলাম।"

শুভঙ্কর বলল, "যদি ভাল চাস, তা হলে এখনও বলছি ভালয়-ভালয় এটাকে ডাঙায় ভেড়া।"

বুনো একবার হা-হা করে হেসে উঠল। তারপর কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই শুভঙ্করের পা লক্ষ করে হঠাৎ একটা লাথি মারল। স্রোতের দোলায় দুলছিল ভেলাটা। তাই টাল সামলাতে না পেরে টুপ করে জলে পড়ল শুভঙ্কর। একে বর্ষার নদী। অথই জল। তার ওপর সাঁতার জানে না। তাই জলে পড়ামাত্রই তলিয়ে গেল ছেলেটা। মউ ডুকরে কেঁদে ঝাঁপিয়ে পড়ে যেই না ওকে ধরতে যাবে বুনো অমনই ক্ষিপ্র গতিতে শক্ত করে টিপে ধরল ওর একটা হাত। মউ চিৎকার করে উঠল, "শু-ভ-ঙ্ক-র—।"

॥ ১০ ॥

জলে পড়ে প্রথমটা একটু হাবুডুবু খেল শুভঙ্কর। তারপর প্রবল স্রোতের টানে বড় একটা পাথরের খাঁজে গিয়ে ঠেকল সে। ভাগ্যিস এখানে নদীগর্ভে সর্বত্রই বড়-বড় পাথরের চাঁই মাথা উঁচিয়ে আছে, তাই রক্ষে। কোনওরকমে সেই পাথরটা ধরে অনেকটা ওপরে উঠে এল সে। তারপর ছোট-বড় পাথরের

pathagar.net

খাঁজে-খাঁজে পা দিয়ে মাঝ নদী থেকে ক্রমশ চলে এল ডাঙার দিকে। তবে একেবারে তীরে পৌঁছতে পারল না। কেননা, পাঁচ-ছ' হাত ব্যবধানের মধ্যে আর কোনও পাথর নেই। অথচ নদী সেখানে খরস্রোতে ছুটছে। পা ডুবিয়ে জলের মাপ দেখে কিছুই বুঝতে পারল না। কেননা, পায়ের তলায় মাটি পেল না ও। তার মানেই গভীর জল। ততক্ষণে ভিজে পোশাকে শীত ধরে গেছে। এমন সময় হঠাৎ ও দেখতে পেল জলের স্রোতে একটা বাঁশের লগি ভেসে আসছে। এইরকমই হয়। বিপদ যিনি দেন, বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার পন্থাও তিনিই দেখিয়ে দেন। সৃষ্টিরহস্যের এটাই নিয়ম। তাই আশায়, আনন্দে বুক ভরে উঠল শুভঙ্করের। লগিটা কাছে আসতেই ও সেটাকে পায়ে করে টেনে নিল। তারপর সেটা দিয়েই গভীরতা পরীক্ষা করল জলের। জল খুব যে একটা বেশি, তা নয়। ওর গলা পর্যন্ত। কিন্তু তা হলেও এই জল তো হেঁটে পেরনো যাবে না। কেননা, জলের যা টান তাতে এক হাঁটুর বেশি হলেই কুটোর মতো ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তবু একটা বুদ্ধি বের করে সেই বাঁশের লগিতে ভর দিয়ে ডাঙার ওপর লাফিয়ে নামল সে।

মউয়ের জন্য গভীর বেদনায় বুকের ভেতরটা টনটনিয়ে উঠল ওর। একেই বলে মেঘের পরে মেঘ। মউকে নিয়ে সেই শয়তানটা এখন কোথায় কতদূরে চলে গেছে তা কে জানে? মউ কি পারবে ওই দুর্বৃত্তদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে? হয়তো পারবে না। আর একা অসহায় ও নিজেই বা এই গহন বনে কী করবে, কোথায় যাবে, তারই বা ঠিক কী? তবুও সান্ত্বনা এই, ডাঙার মানুষ ডাঙায় তো এল। ও বালিতে পা দিয়ে কোনওরকমে ভাঙন বেয়ে জঙ্গলের উঁচু পাড়ে ওঠবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু না, জঙ্গল এমনই দুর্ভেদ্য যে, কিছুতেই তা পারল না। কেননা, এখানে চারদিকে জঙ্গল যেমন ঘন, তেমনই সর্বত্রই আগাছার বন। এর মাঝখানে কোথাও এতটুকু একটা শুঁড়িপথও নেই। এখানে সাপখোপ কী না থাকতে পারে? ভয়ে বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল ওর। তাই ও নদীর গতিপথ ধরে, মানে যেদিক থেকে নদীটা বয়ে আসছে, সেই মুখে আবার পিছিয়ে চলল। মউয়ের নির্দেশ মতো কনকদুর্গার মন্দির ওই দিকেই।

সবে কয়েক পা এগিয়েছে এমন সময় হঠাৎই ভাঙনের পাশ দিয়ে বড় একটি পাথরের আড়াল থেকে ওর চেয়েও বয়সে ছোট দুটি আদিবাসী মেয়ে বেরিয়ে এসে পথ রোধ করে দাঁড়াল। ময়লা ছেঁড়া ফ্রক পরা রুক্ষ চুল। কুচকুচে কালো গায়ের রং। খালি পা। ওর দিকে সাপের চোখে তাকিয়ে তীর-কাঁড় উঁচিয়ে বলল, "সাবধান। আর এক পাও এগোবি না।"

শিউরে উঠল শুভঙ্কর। এটা কাফ্রি মুলুক নাকি? দারুণ ভয়ে ভীত হয়ে বলল, "তোরা কারা?"

"তুই কে?"

শুভঙ্কর বলল, "তোরা আমাকে চিনবি না। আমি শহরের ছেলে। মাঝ নদীতে পড়ে গিয়ে এই অবস্থা হয়েছে আমার। কোনওরকমে প্রাণটাকে বাঁচিয়ে নিয়ে এখানে এসে পৌঁছেছি। আমি তো সাঁতার জানি না। তাই ভগবান রক্ষা করেছেন আমায়।"

"এত রাতে ইখানে কী করতে এসেছিলি?"

pathagar.net

"আমরা এক দুষ্ট লোকের পাল্লায় পড়েছিলাম। সে আমার এক সঙ্গীকে নিয়ে পালিয়ে গেল। আর আমাকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে গেল নদীর জলে।"

মেয়ে দুটি এবার তীর-কাঁড় নামিয়ে বলল, "তুই তা হলে মাছ চুরি করতে আসিসনি ?"

"না। তোরা বিশ্বাস কর।"

মেয়ে দুটি তখনও ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। শুভঙ্করের অন্য ভয় করল এবার। সে মনে-মনে ভাবল এ দুটো সত্যিই মেয়ে তো, না কোনও ভূতের ছানা ? একবার মনে হল ওদের গায়ে হাত দিয়ে একটু টিপে-টিপে দ্যাখে। আবার ভাবল দরকার নেই। যদি এটা ওরা পছন্দ না করে বা ভুল বোঝে ? তাই ও-ও অপলকে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

একটি মেয়ে বলল, "আমরা ইখানে ঘাটে জাল পেতে বসে আছি। সারারাত জেগে পাহারা দিচ্ছি পাছে কেউ এসে জাল নিয়ে পালায়।"

"কিন্তু তোরা তীর-কাঁড় নিয়ে এসেছিস কেন ? এই তো এইটুকু-টুকু পুঁচকে চেহারা তোদের। চোর এলে তো তোদেরকেই নিয়ে চলে যাবে।"

মেয়ে দুটি হি-হি করে ভূতের হাসি হাসল।

শুভঙ্কর বলল, "হাসলি যে ?"

"তোর কথা শুনে। আমরা এমনভাবে ইখানে লুকিয়ে থাকি যে, আমাদের কেউ দেখতেই পায় না। কিন্তু আমরা ইখান থেকে সব কিছুই দেখতে পাই। সবাইকে দেখতে পাই। তুই যদি জলে পা দিয়ে হেঁটে আসতিস আর আমাদের জাল ছুঁতিস তা হলে ইখান থিকেই আমরা তোকে তীর ছুঁড়ে মেরে ফেলতাম।"

শুভঙ্কর বলল, "উঃ। কী সাঙ্ঘাতিক। ভাগ্যে আমি বালির ওপর দিয়ে হেঁটে আসছিলাম। কিন্তু আমি যে শুনলাম সন্ধের পর কেউ এপারে আসে না, তা তোরা এলি কী করে ?"

"শুধু আমরাই মাছ ধরার জন্য এপারে আসি। তবে জঙ্গলে ঢুকি না। আর ওপারের লোক এপারে আসবেই বা কেন ? কী আছে এপারে ? কোনও মানুষের বসতি তো নেই। শুধুই জঙ্গল। কাজেই সন্ধের পর এখানে বাঘ-ভালুকের হাতে প্রাণ দিতে আসবেটা কে ?"

"এখানে বাঘ আছে নাকি ?"

"বনে বাঘ থাকবে না তো কি তোদের শহরের রাস্তায় বাঘ থাকবে ? ইখানে বাঘ আছে, ভালুক আছে, সাপ আছে। সব কিছু আছে।"

"তবু তোরা এখানে বসে আছিস। তোদের ভয় করে না ?"

"আমাদের ভয়ও নাই, মরণও নাই।

"নাম কী তোদের ?"

"আমার নাম রুনকি ওর নাম ঝুনকি। দু' বোন আমরা। আর কী জানতে চাস বল ?"

"তোরা আদিবাসী ?"

মেয়ে দুটি ঘাড় নাড়ল, "হ্যাঁ।"

"কিন্তু তোদের কথায় টান নেই কেন ?"

pathagar.net

"আমরা চিলকিগড়ে থাকি। শহরের মানুষদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করি তো। রাত জেগে নদীতে মাছ ধরি। সকালবেলা হাটে বেচি। বাড়ি-বাড়ি মাছ জোগাই। দুপুরে ঘুমাই। তোদের সঙ্গে কাজ-কারবার করতে গিয়ে তোদের ভাষাই রপ্ত হয়ে গেছে। তবু মাঝে-মধ্যে একটা-দুটো আদিবাসী ভাষা বেরিয়ে আসে মুখ দিয়ে। মাতৃভাষার টান এসেই যায়।"

শুভঙ্কর আরও কিছুক্ষণ ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তোরা যে দুটি বোনে সারারাত এখানে পড়ে থাকিস, তোদের মা-বাবা কিছু বলেন না?"

রুনকি-ঝুনকি হেসে বলল, "আমরা পোড়াকপালি। আমাদের কেউ নাই রে। বাবাটা অনেকদিন আগে মরে গেছে। আর মাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে বুনো।"

শুভঙ্কর চমকে উঠল, "কী নাম বললি? বুনো!"

"হ্যাঁ।"

"কোথায় থাকে সে?"

"ও থাকে অনেক দূরে। ঠাকরুনপাহাড়িতে। কিন্তু তুই অমন চমকে উঠলি কেন? তুই চিনিস তাকে?"

"লোকটা খুব বদ। তাই না রে?"

"হ্যাঁ। শুনেছি কিছুদিন আগে আমার মাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেছে।"

রুনকি-ঝুনকির চোখ দুটি ছলছলিয়ে উঠল।

শুভঙ্কর বলল, "ওই শয়তানটাই তো আমার সঙ্গীকে ধরে নিয়ে গেল। ওর আর-এক নাম জঙ্গল-শের।"

"হ্যাঁ, ওই শয়তানটা জঙ্গল-শেরই বটে।"

শুভঙ্কর বলল, "তোরা তো এখানেই আছিস। তোরা দেখিসনি একটু আগে একটা ভেলায় ভেসে এইখান দিয়েই চলে গেল ওরা।"

"কই দেখিনি তো? আসলে আমরা একটু আড়ালে ছিলাম। আর আমাদের নজর ছিল জালের দিকে। তাই নজর এড়িয়ে গেছে।"

শুভঙ্কর বলল, "ওই জঙ্গল-শের কোথায় থাকে বললি? ঠাকরুন পাহাড়িতে? সেটা কী অনেক দূর?"

"অনেক দূর। শুধু পাহাড় আর জঙ্গল সেখানে। দিনের আলোতেও সেখানে গেলে গা ছমছম করে।"

"আমি যাব সেখানে।"

"না, তুই যাবি না। গেলে মরবি। ওখানে গেলে কেউ ফেরে না। আমাদের মাও ফেরেনি।"

"তবু আমাকে যেতেই হবে রে। না হলে মেয়েটার কী অবস্থা হবে?"

"মরবে। ওর আশা ছেড়ে দে তুই।"

"অসম্ভব। আমার জীবন দিয়েও ওকে আমি উদ্ধার করব। আগে এখানকার কাজটা সারি। তারপর যাব ওখানে। তোরা এখানে কতক্ষণ আছিস?"

"তা রাত দশটা থেকেই আছি আমরা।"

"আমার একটা কাজ করবি?"

"কী কাজ বল?"

pathagar.net

"যদি করিস তা হলে আমি তোদের অনেক টাকা দেব। এত কষ্ট করে রাত জেগে মাছ ধরে এই মাছ বেচে যা টাকা পাবি, তার চেয়েও অনেক বেশি টাকা আমি দেব তোদের।"

রুনকি-ঝুনকি উৎসাহিত হয়ে বলল, "সত্যি বলছিস ?"

"হ্যাঁ।"

"বেশ, তোর কাজটা আমরা করে দেব। কী করতে হবে বল ? তোকে নদীর ওপারে পৌঁছে দিতে হবে ? না অন্য কিছু ?"

"তোদের এখানে কনকদুর্গার মন্দিরটা কোথায় ? আমাকে একটু রাস্তা চিনিয়ে নিয়ে যাবি সেখানে ?"

"কনকদুর্গার মন্দির ! এমন সময় ওখানে কী করে যাবি তুই ? কেউ নেই ওখানে। ডাকু-বদমাশ কিছু হয়তো আছে ওখানে। কিন্তু ওরা তোকে দেখলেই মেরে ফেলবে।"

"ওই ডাকুগুলোর খোঁজেই তো আমাকে যেতে হবে। শিকারিবাজের নাম শুনেছিস ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ শুনেছি।"

"ওই শিকারিবাজ আমার বন্ধু বিল্টু আর তিন্নিকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। এই জঙ্গলের মধ্যে কোথায় যে লুকিয়ে রেখেছে তাদের, তা কে জানে ? শুনেছি আজ রাতে বিল্টুকে ওরা মায়ের মন্দিরে বলি দেবে। এই খবর পেয়েই মউ নামে আমার আর-এক বোনকে নিয়েই এখানে আসছিলাম। মউ এখানকার পথঘাট চেনে। কিন্তু আমি একেবারে নতুন।"

রুনকি-ঝুনকি বলল, "তাই যদি হয় তা হলে আর গিয়ে লাভ নেই। এখন শেষ রাত। এতক্ষণে ওরা যা করবার করে ফেলেছে।"

"হয়তো। তবু একবার আমি শেষ চেষ্টা করে দেখতে চাই। তোরা আমাকে সাহায্য কর।"

রুনকি বলল, "একটু দাঁড়া। জালটা তা হলে গুটিয়ে রাখি।"

শুভঙ্কর বলল, "দেরি হয়ে যাবে। তা ছাড়া এখানে এসে কেউ তোদের জাল নিয়ে পালাবে না।"

ঝুনকি বলল, "এখানকার মানুষজনকে বিশ্বাস নেই রে। আমাদের এই মাছ ধরার জায়গাটার ওপর অনেকের নজর। তবে তুই যখন বলছিস তখন থাক। খুব সাবধানে আমাদের পেছন-পেছন আয় তুই।"

শুভঙ্কর রুনকি-ঝুনকির সঙ্গেই সেই আলোছায়ার জগতে পা টিপে-টিপে এগিয়ে চলল। সহজ-সরল এই মেয়ে দুটিকে খুব ভাল লাগল শুভঙ্করের। ওদের হাতে তির-কাঁড় আছে। ওর হাতে আছে রিভলভার। কিন্তু জলে পড়ে যাওয়ার ফলে কার্তুজগুলো তো সব ভিজে গেছে। ওগুলো আর কাজ করবে কী ? যাই হোক, বিপদে পড়লে একবার অন্তত চেষ্টা করে দেখবে।

রুনকি ও ঝুনকি যে কোথা দিয়ে কীভাবে নিয়ে গেল ওকে তা ও বুঝতেও পারল না। তবে বেশ খানিকটা পথ যাওয়ার পর হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে ঠোঁটে তর্জনী রেখে চুপ থাকবার সঙ্কেত দিল ওরা। তারপর ইশারায় আরার যেতে বলে খুব সঙ্কীর্ণ একটি পায়ে-চলা বনপথ ধরে ওকে নিয়ে এগিয়ে

চলল। এক জায়গায় ক্ষীণ একটু আলোর রেখা ওরা দেখতে পেল। আর দেখল, বনের মাঝখানে একটু উচ্চস্থানে দেবীর মন্দিরের ধ্বজা পতপত করে উড়ছে। ওরা সামনের দিকে না গিয়ে পেছন দিক দিয়ে মন্দিরের ঠিক পেছনে এসে দাঁড়াল। এখানে এসে যা দেখল তাতে সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল ওদের। ওরা দেখল সেই দুর্ভেদ্য জঙ্গলে অন্ধকার দূর করবার জন্য মন্দিরের সামনেই একটি মশাল জ্বলছে। তারই আলোয় যেটুকু আলো হয়েছে তাতেই দেখা যাচ্ছে একটি মহুয়া গাছের গুঁড়ির সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা আছে বিল্টু। ওর কান্না-ভেজা চোখ দুটোর কোল বেয়ে জলের ধারা নেমে আসছে। তার ওপর যে অমানুষিক অত্যাচার হয়েছে তারই পরিচয় সর্বাঙ্গে। মারের চোটে নাক-মুখ ফুলে গেছে ওর।

শিকারিবাজের দুই সঙ্গী রিভলভার হাতে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। ওদের একজনের নাম লক্কা, অপরজনের নাম লোটন। এরা তো শুভঙ্করের পূর্ব পরিচিত। আর মন্দিরের চাতালে একজন বিদেশী সাহেব বসে আছেন। সাহেবের নাম অ্যান্টনি।

এ ছাড়াও দু'জন ডাকাতের মতো দুর্ধর্ষ লোক বল্লম হাতে ঘোরাফেরা করছে সেখানে। ঠিক যেন জহ্লাদের মতো চেহারা তাদের। যেমন ঝাঁকড়া চুল, তেমনই পাকানো গোঁফ। বিশাল ভুঁড়ি। ভয়ঙ্কর।

শুভঙ্কর ও রুনকি-ঝুনকি চুপিসারে এসে বেশ খানিকটা নিরাপদ দূরত্বে থেকে ওদের গতিবিধি লক্ষ করতে লাগল। শুধু লক্ষ করলেই তো হবে না। তাই মনের সঙ্গে দারুণভাবে বোঝাপড়া করতে লাগল, কীভাবে এই শত্রুব্যূহ ভেদ করে বিল্টুকে উদ্ধার করবে ওরা। ওরা মানে শুভঙ্কর একাই। মেয়ে দুটি তো বুদ্ধি খরচ করবে না। ওদের মারতে বললেই ওরা মারবে। লাউডগা সাপের মতো বিষাক্ত তীর ছুটে যাবে ওদের কাঁড় থেকে শিরিক-শিরিক করে। কিন্তু এই মুহূর্তে এতটুকু কাঁচা কাজ কিছু করে ফেললে সব ভেস্তে যাবে। হাতের মুঠোয় পেয়েও হারাতে হবে বিল্টুকে। তার কারণ ওরা তিনজন। শত্রুপক্ষে পাঁচজন। ওদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র আছে। শুভঙ্করের কাছে রিভলভার থেকেও নেই। তাই ঘন গাছপালার আড়ালে দাঁড়িয়ে আক্রমণটা কখন এবং কীভাবে হবে তাই ভাবতে লাগল। লক্কা ও লোটন কার যেন প্রতীক্ষা করতে-করতে হঠাৎই একসময় অধৈর্য হয়ে উঠল। লক্কা এসে বিল্টুর চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলল, "এখনই নেতিয়ে পড়লে কী করে হবে ? আর-একটু অপেক্ষা কর শয়তান। শিকারিকে আসতে দে। তারপর ভোরের আগেই তোকে শেষ করে দেব।"

বিল্টু কোনও কথা না বলে যেমন ছিল তেমনই ঝিমিয়ে নেতিয়ে রইল। ঝিমোবেই বা না কেন ? সারাটা দিন কিছু খায়নি বেচারি। ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় প্রাণ ওর ওষ্ঠাগত হয়ে এসেছে। পেটের মধ্যে পাক দিচ্ছে।

লোটন বলল, "আচ্ছা, তোর জানটা কী দিয়ে তৈরি বল তো ? এত মারলাম তোকে, তবু তোর পেট থেকে একটা কথাও বের করতে পারলাম না।"

বিল্টু এবারও কোনও কথাই কথাই বলল না। ম্লান মুখে শুধু একটু হাসল।

লক্কা বলল, "আমার মনে হয় ছোঁড়াটা নিশ্চয়ই এর আগের জন্মে স্বদেশী ছিল। তাই এত কষ্ট পেয়েও মুখ খুলল না।"

pathagar.net

"আর মুখ খোলবার দরকার নেই। রাত্রি শেষ প্রহর হতে চলেছে। শিকারিবাজ এবার আসবেই। সোনার গণপতি পাওয়া যাক বা না যাক, আজই ওর ছিন্ন মুণ্ড হয় লুটিয়ে পড়বে মাটিতে অথবা দেহটা ঝুলবে এই গাছেরই ডালে।"

যে-সাহেব এতক্ষণ মন্দিরের চাতালে বসে ছিলেন তিনি এবার পায়চারি শুরু করলেন। অনেকক্ষণ এদিক-সেদিক করার পর একটা চুরুট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে বললেন, "ডেখো, হামি টোমাডের চালাকি এইবার বুঝিতে পারিয়াছে। আজ রাত্রের মধ্যে ওই মাল যডি হামি না পাবে টা হলে টোমরা আমাকে হামার সব রুপিয়া অবশ্যই ফেরট ডিবে। ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলিং মার্কেটে হামি আর টোমাডের বিশোয়াস করিটে পারিটেছি না। যডি টোমরা আমার রুপিয়া ফেরট না ডাও টাহা হইলে টোমাডের সমূহ বিপড জানিবে।"

লক্কা-লোটন বলল, "দেখো অ্যান্টনি, তুমি মিছিমিছি আমাদের ভুল বুঝছ। তোমার সঙ্গে আমাদের অনেকদিনের কাজ-কারবার। এর আগে আর কখনও এইরকম কথার খেলাপ হয়েছে কী ? তা ছাড়া তোমারথেকে যা নিয়েছি আমরা, সে তো শুধু অ্যাডভান্স। মূর্তি পেলে আরও তো অনেক টাকা দিতে হবে তোমাকে।"

ক্রুদ্ধ সাহেব বললেন, "আমি আড়াই লাখ রুপিয়া টোমাডের গুনিয়া ডিয়াছে। টোমরা আমাকে ঠকাইলে আমার বস আমাকে বিশোয়াস করিবে না। আমি এখনও বলিয়া ডিটেছি, আমি ভাল মানুষ না আছে। আমার মনে হচ্ছে টোমরা একটা নাটক সাজাইয়া আমার সঙ্গে মজা করিতেছ।"

শুভঙ্কর ও রুনকি-ঝুনকি সুযোগ বুঝে একটি গাছের ডাল ধরে মন্দিরের ছাদে উঠে এসেছে তখন। যে-কোনও আক্রমণই উচ্চস্থান থেকে যতটা সহজে হয়, সামনাসামনি ততটা হয় না বলে ওরা বুদ্ধি খাটিয়ে ছাদেই উঠে এল। এখান থেকে আক্রমণ করারও সুবিধে যত, লুকিয়ে পড়াও ততই সহজ।

লক্কা-লোটন বলল, "তুমি শুধু-শুধু আমাদের ওপর রাগ করছ অ্যান্টনি।"

সাহেব এবার চুরুটটা মাটিতে ফেলে সেটাকে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে বললেন, "ব্লাডি ফুল ! টোডের ডুইজনের বাবার নাম আমি অ্যান্টনি রাখবে। আমি টোডের জানে মারিবে।"

"তুমি ভীষণ রেগে গেছ সাহেব। কিন্তু আমাদের কী দোষ বলো। আমরা তো দলের হয়ে কাজ করি।"

"আমি কোনও কঠা শুনবে না। হয় টোমরা আমাকে হিরের চোখওয়ালা গোল্ডেন গণপতি ডিবে, না হলে আমি যে-টাকা টোমাডের অ্যাডভান্স করিয়াছি, টাহা ফিরাইয়া ডিবে। আমার বস বেঞ্জামিন কালকের ফ্লাইটে চলিয়া যাইবে। টোমাডের বিশ্বাসঘাটকটার জন্য আমি টাহার কাছে মুখ ডেখাইটে পারিব না। গণপতি না পাইলে বেঞ্জামিন আমাকে গোলি করিবে। টোমরাও উহার হাট হইটে রক্ষা পাইবে না। টোমরা জানো না সে কী দারুণ ডেঞ্জারাস।"

লক্কা বলল, "জানি সাহেব। আমরা নেটিভরা খুব ভালভাবে জানি তোমরা কী লোক। আর-একটু সবুর করো তুমি। একবার শুধু শিকারিকে আসতে দাও, তারপর দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে।"

সাহেব হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, "রাত এখন কট জানো ? তিনটা বাজিয়া গিয়াছে।"

"তাতে কী ! এমনও তো হতে পারে সে কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে ?"

সাহেবের মুখ আরও লাল হয়ে উঠল। সাহেব চিৎকার করে বললেন, "কী পারে না-পারে টাহা ডেখিবার প্রয়োজন আমার নাই। টোমরা এক্ষুনি আমাকে আমার রুপিয়া ফিরাইয়া ডাও।"

এতক্ষণে বিল্টু বলল, "সাহেব ! ও-টাকা তুমি কোনওদিনই ফেরত পাবে না। ওরা তোমাকে চিট করেছে সাহেব। আসলে ওই সোনার গণপতি ও হিরের চোখ বলে কিছুই নেই। আমারই ঠাকুরদাদার আনা জিনিস সেটা। বহু বছর আগে ডাকাতি হয়ে গেছে। ওরা একটা ডায়েরি পেয়ে বোকার মতো সেই দেখে লাফাচ্ছে। না হলে ও-জিনিস থাকলে বা আমি ওর সন্ধান জানলে কী এতক্ষণ এইভাবে পড়ে মার খেতাম ? মারের চোটে সত্যি কথাটা কখন বলে ফেলতাম। জিনিসের চেয়ে জান তো বড়।"

সাহেব বললেন, "টুমি ঠিক বলিটেছ ?"

"তোমাকে মিথ্যে বলে লাভ ? ওরা ওই জিনিস হাতে না পেয়েই তোমার কাছ থেকে অগ্রিম টাকা খেয়েছে। এখন ও-জিনিস ওরা তোমাকে দিতে পারলে আরও টাকা খাবে। না পারলে আগের টাকা মেরে দিয়ে পালাবে। আড়াই লাখ টাকা বড় কম নয়। শিকারিবাজ ওই টাকা নিয়ে নিজেই কেটে পড়েছে হয়তো। এই বোকা দুটো ওর চাল বুঝতে না পেরে এখনও ওর ফেরার আশা করছে।"

সাহেব লক্কা ও লোটনকে বললেন, "এই বালক যাহা বলিটেছে টাহা ঠিকই বলিটেছে। টোমরা এক্ষুনি এই বালককে ছাড়িয়া ডাও।"

লক্কা-লোটন সভয়ে বলল, "ওরে বাবা ! শিকারিবাজ তা হলে আস্ত রাখবে না আমাদের।"

"কিন্টু আমার কোঠা না শুনিলে আমিও টোমাডের আস্টো রাখিবে না। পিঠের ছাল ছাড়াইয়া ফেলিব টোমাডের।"

লক্কা, লোটন দু'জনেই এবার নিজমূর্তি ধারণ করল। হঠাৎ সাহেবের দিকে রিভলভার তাগ করে বলল, "তুমি কিন্তু খুব বেশি বাড়াবাড়ি করছ অ্যান্টনি। তোমার এবং তোমার বস বেঞ্জামিনের চেয়ে আমরাও কম বিষাক্ত নই। আর-একটি কথা বললে তোমার মাথার খুলি আমরা ফুটো করে দেব। তুমি কি জানো, এই ছেলেটা কী করেছিল ? আমাদের সর্দারের মুখের ওপর গরম কফি ছুঁড়ে দিয়েছিল।"

"আমি হইলে উহাকে এমন মারিটাম যে, সব ডম বাহির হইয়া আসিট। টোমরা যডি বাঁচিটে চাও তো রিভলভার নামাও।"

লক্কা, লোটন বলল, "তুমি এখন নিজে বাঁচার চেষ্টা দ্যাখো সাহেব। আজ আর আমাদের হাত থেকে তোমার নিস্তার নেই।"

সাহেব বনভূমি কাঁপিয়ে হো-হো করে হেসে উঠলেন এবার। বললেন, "টোমাডের কী ঢারনা, আমি এই জঙ্গলে একা আসিয়াছি ? এটো বোকা আমি না আছে। এই জঙ্গলের ভিটরে আমার ডুইজন লোক মেশিনগান লইয়া সব সময়

boiRboi.net

টোমাডের ডিকে নজর রাখিটেছে : একটু বাড়াবাড়ি করিলেই উহারা টোমাডের ডিসুম করিয়া ডিবে।"

লক্কা, লোটন বলল, "ওসব ভড়কিবাজি তুমি অন্য জায়গায় দেখাবে। তুমি ভেবেছ ওই ভয়ে আমরা কাঁপব আর সেই সুযোগে তুমিই আমাদের গুলি করে বদলা নেবে। তাই না ? যাক। আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো তারপর তোমাকে এবং এই খুদে শয়তানটিকে একই কবরে ঘুম পাড়াবার ব্যবস্থা করছি।"

এই সুযোগ। এ-সুযোগ হাতছাড়া করাটা ঠিক নয়। শুভঙ্কর ইশারা করতেই রুনকি ও ঝুনকি অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে তীর নিক্ষেপ করল লক্কা, লোটনের দিকে। দু'জনেরই বুকের ঠিক মাঝখানে তীর বিদ্ধ হল। হাতের রিভলভার খসে পড়ল হাত থেকে। ওরা হাঁটু মুড়ে মাটিতে বসে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল সেই বেঁধা তীর বুক থেকে টেনে ছাড়ানোর। কিন্তু পারল না।

সাহেব ততক্ষণে কুড়িয়ে নিয়েছেন ওদের দু'জনের রিভলভার দুটি।

লক্কা, লোটন কাতর কণ্ঠে অনুরোধ করল, "সাহেব তুমি দাঁড়িয়ে দেখছ কী ! টেনে ছাড়াবে তো এ-দুটোকে।"

সাহেব বললেন, "টোমাডের আশা টো বড় কম নয়। টোমরা আমাকে কবরে পাঠাইবে আর আমি টোমাডের প্রাণ বাঁচাইব ?"

"আমরা নিশ্চয়ই নতুন কোনও শত্রুর মুখোমুখি হয়েছি সাহেব। তুমি ভেবো না যে, আমরা মরব তুমি বাঁচবে।"

"আমি খাঁটি ইংরেজ বাচ্চা। মরিটে আমি ভয় পাই না। টোমরা রাস্টার কুকুর, টাই এই কঠা বলিটেছ। যে টোমাডের বুকে টির মারিয়াছে সে আমাকে মারিবে না। সে আমার বনডু আছে। টোমাডের হাট হইটে আমাকে বাঁচাইবার জন্যই এই কাজ করিয়াছে।"

"কী সব ভুলভাল বকছ ! এই গভীর জঙ্গলে তোমার বন্ধু। শুনলেও হাসি পায়। ভীম সিং ! রঘুয়া ! দাঁড়িয়ে দেখছিস কী ! আমাদের বুক থেকে এ-দুটো খুলে দে।"

সাহেবের দু' হাতে তখন দুটো রিভলভার। ভীম সিং আর রঘুয়া নামের বল্লম হাতে সেই যমের মতো লোক দুটো ছুটে আসতেই সাহেব তাদের দিকে রিভলভার তাগ করলেন, "খবরদার ! আর এক পা আগাইলেই আমি টোমাদের গোলি করিবে।"

ভীম সিং আর রঘুয়া দু'জনেই থেমে গেল এবার। ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল ওদের।

সাহেব বললেন, "হ্যান্ডস আপ। হাট উপরে ওটাও।"

ওরা তাই করল। দু' হাত ওপরে তুলে গৌর-নিতাই হল।

সাহেব একটা সিটি দিলেন এবার। দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই দেখা গেল দু'জন বেঁটেখাটো নেপালি এগিয়ে এল সেখানে। ওদের একজনের হাতে মেশিনগান। অপরজনের হাতে একটি সুটকেস। সম্ভবত গণপতি কেনার বাকি টাকাটার বাণ্ডিল আছে এর ভেতর। ওরা সুটকেসটা মন্দিরের চাতালে নামিয়ে রাখল।

সাহেব নিজে এসে বন্ধনমুক্ত করলেন বিল্টুকে।

বাঁধন খোলা মাত্রই খপ করে মাটিতে বসে পড়ল বিল্টু। তারপর অতিকষ্টে

বলল, "সাহেব ! ওই যে ভাঙা মতন মন্দিরটা দেখছ, ওই মন্দিরের ভেতর আমার এক বোনকে ওরা বন্দী করে রেখেছে ! ওকে তোমরা উদ্ধার করো। ওই হচ্ছে দেবীর আদি এবং পুরনো মন্দির। এখন একমাত্র সাপ আর বিছে ছাড়া ওই মন্দিরে কিছুই নেই। শুধু প্রাচীন ঐতিহ্যের নিদর্শন বলে ওটাকে এখনও ভাঙেনি কেউ। একবার গিয়ে দ্যাখো যদি মেয়েটা এখনও বেঁচে থাকে।"

সাহেবের নির্দেশে নেপালি দু'জন ভাঙা মন্দিরের দিকে ছুটে যেতেই সেই অন্যমনস্কতার সুযোগে ভীম সিং ও রঘুয়া ঝাঁপিয়ে পড়ল সাহেবের ওপর।

সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন, "সেভ মি বাহাদুর ! আই অ্যাম ইন গ্রেট ডেঞ্জার। ফায়ার-ফায়ার।"

নেপালি দু'জন যেতে গিয়েও ঘুরে দাড়াল এবার। তারপর হায়েনার মতো ছুটে এসে সেই মাথামোটা যমদূত দুটোকে গুলিতে-গুলিতে ঝাঁজরা করে দিল। ভীম সিং ও রঘুয়ার মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

লক্কা ও লোটন তখনও চেষ্টা করছে নিজেদের বুক থেকে সেই তীর উপড়ে ফেলতে। কিন্তু পারছে না। প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ হচ্ছে ওদের ক্ষতস্থান থেকে। তীর দুটো ওদের হাড়ের সঙ্গে এমনভাবে গেঁথে গেছে যে, হেঁচকা টান ছাড়া খোলা অসম্ভব। অথচ সেটা নিজে-নিজে সম্ভব নয়। যতবারই চেষ্টা করছে ওরা, ততবারই যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠছে। অবশেষে বুদ্ধি করে লক্কা লোটনের এবং লোটন লক্কার বুকে বেঁধা তীর টেনে ছাড়াল। তারপর ক্লান্ত অবসন্ন দেহে লুটিয়ে পড়ল মাটির বুকে।

নেপালি দু'জন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে তবুও বিল্টুকে বাঁধা সেই দড়িটা দিয়েই আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল লক্কা-লোটনকে। অবশ্য না বাঁধলেও চলত। কেননা রক্তক্ষরণে ওরা তখন ক্রমশ দুর্বল হয়ে এমন ঝিমিয়ে পড়ছে যে, ওরা একেবারেই শক্তিহীন।

বিল্টু নিজেই এবার এগিয়ে গেল মন্দিরের দিকে। কিন্তু গিয়ে দেখল, শিকল খোলা। ফাঁকা ঘর। কেউ কোথাও নেই। ও তবুও দু-একবার ডাকল, "তিন্নি ! তিন্নি রে।" কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। ও বুঝতে পারল ওকে যখন বাঁধন-মুক্ত করে বাইরে গাছের সঙ্গে বাঁধছিল ওরা, তখনই নিশ্চয় তিন্নিকে অন্যত্র পাচার করেছে। কাল থেকে একভাবে এই ঘরের ভেতর ওদের দু'জনকে সামনে-পেছনে করে আষ্টেপৃষ্ঠে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিল ওরা। এখন ওকে পাওয়ার যেটুকু সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল সেটুকুও উবে গেল নিমেষের মধ্যে। গেল কোথায় মেয়েটা ? বিল্টু কেঁদে সাহেবের কাছে এসে তিন্নির কথা বলতেই সাহেব ওর মাথার চুলে একবার হাত বুলিয়ে বললেন, "উহাকে খুঁজিয়া বাহির করা টো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। টুমি কোঠাও গিয়া চুপচাপ বসিয়া ঠাকো। পরে উহার ব্যবস্ঠা হইবে।"

বিল্টু তবুও মন্দিরের আশপাশে ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগল।

সাহেব এইবার দৃপ্তকণ্ঠে বললেন, "যাহারা অন্‌ঢোকারে ঢিল ছুঁড়িয়া আমার শট্‌রুদের ক্ষটি করিয়াছে, আমি টাহাদিগকে আমার সামনে আসিটে অনুরোঢ করিটেছি। ইউ কাম ইন [illegible] অব মি হোয়্যারএভার ইউ স্টে।"

মন্দিরের ছাদে অন্ধকারে [illegible] কা দিয়ে বসে রুনকি-ঝুনকি শুভঙ্করের দিকে

pathagar.net

তাকিয়ে ওর মত জানতে চাইল। শুভঙ্কর ইশারায় বারণ করল ওদের। চাপা গলায় বলল, "এখনও সময় হয়নি।"

সাহেব হেঁকে বললেন, "টোমাডের কোনও ভয় নাই। আমি টোমাডিগকে কিছুই বলিব না। টোমরা আমার বোন্‌ডু হইয়া গিয়াছ। আমি টোমাডিগকে বখশিস করিটে চাই। কাম সুন।"

তবুও কেউ এল না।

আর সাহেবও সেই অন্ধকারে ঠিক করতে পারলেন না তীর নিক্ষেপ ঠিক কোন দিক থেকে হয়েছিল। তাই চারদিকে মুখ করে সমানে ওদের সামনে আসার জন্য অনুরোধ করতে লাগলেন।

লক্কা, লোটন সাহেবের রকমসকম দেখে অতি কষ্টে এক সময় বলল, "তুমি যতই ডাকো সাহেব, কেউ আসবে না। ও তীর মানুষ ছোঁড়েনি।"

"টবে কি ভুটে ছুঁড়িয়াছে?"

"নিশ্চয়ই। ভূত ছাড়া আর কিসেই বা ছুঁড়বে?"

"এই জঙ্গলে ভুট?"

"ভূত তো এই জঙ্গলেই থাকবে সাহেব। কম খুন-জখম করেছি আমরা? সেই মরা মানুষদের আত্মাগুলো যাবে কোথায়?"

সাহেব এবার দারুণ ভীত হয়ে চিৎকার করে উঠলেন, "টোমরা ডয়া করিয়া চুপ করো। ভুটের কটা আমাকে একদম বলিবে না। ভুটের নাম শুনিলে আমার হাট-পা পেটের মড্যে ঢুকিয়া যায়। আমি জ্যান্‌টো মানুষকে ভয় করে না। কিন্‌টু মরা মানুষকে আমার ডারুণ ভয়।"

"তাই বলি সাহেব, যদি বাঁচতে চাও তো এখনও পালাও।"

ওরা যখন এই সমস্ত কথাবার্তা বলছে তেমন সময় হঠাৎ বহুদূর থেকে একটা মোটরবাইকের ভট-ভট শব্দ ভেসে আসতে লাগল। শব্দটা ধীরে-ধীরে কাছে এল, তারপর একসময় দেখা গেল শিকারিবাজকে। বিজয় উল্লাসে বাইকটা নিয়ে মন্দিরের সামনে এসে থামাল সে। তারপর বাইক থেকে নেমেই বলল, "ডোণ্ট মাইণ্ড মিঃ অ্যাণ্টনি। আমার আসতে খুব দেরি হয়ে গেল। আসলে অনেক খুন-জখমের পর পুলিশ খুব মরিয়া হয়ে উঠেছে। তাই পুলিশের নজর এড়িয়ে ঘুরপথে আসতে গিয়েই এত দেরি। আমি যে কীভাবে এসেছি তা আমিই জানি।" তারপর হঠাৎ রণক্ষেত্রের দিকে তাকিয়েই বলল, "কিন্তু এখানে এসে এসব কী দেখছি? লক্কা, লোটনের এই অবস্থা কেন? ভীম সিং, রঘুয়াকে মারল কে? এদের এইরকম হাল কে করল?"

সাহেব মিটিমিটি হেসে বললেন, "আমি করিয়াছি। ইহারা আমার সঙ্গে ডুশমনি করিটে আসিয়াছিল। আমাকে প্রাণে মারিটে চাহিয়াছিল।"

শিকারিবাজ বলল, "বলো কী! তোমার ওপর বিদ্রোহ করেছিল? তা হলে তুমি ঠিক করেছ। বেশ করেছ তুমি। কিন্তু সেই ছেলেটা কোথায়? কোথায় সেই খুদে শয়তানটা? যে আমাকে এত কষ্ট দিল?"

বিল্টু তখন সভয়ে অন্ধকারে ঘন জঙ্গলের মধ্যে আত্মগোপন করে ছিল। তবে এমন একটা জায়গায় ছিল সে, যেখান থেকে সব কিছুই দেখতে পাচ্ছিল।

সাহেব বললেন, "আমি উহাকে ছাড়িয়া উয়াছে।"

pathagar.net

শিকারি পরিস্থিতি উপলব্ধি করে বুঝতে পারল তার বিলম্বের কারণে এখানে রীতিমত একটা অপ্রিয় ব্যাপার ঘটে গেছে। এবং এর ফলে সে এখানে খুবই অসহায়। তাই সে কোনওরকম উত্তেজনা না দেখিয়ে একটু দুঃখ প্রকাশ করার ভঙ্গিতে বলল, "এটা তুমি ঠিক করলে না সাহেব। ওই ছেলেটাকে আমি মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলাম।"

"টোমার ডেওয়া ডণ্ড আমি মকুব করিয়া ডিয়াছি শিকারিবাজ।"

"খুব ভাল করেছ। কিন্তু তোমার জিনিস রেডি?"

"ইয়েস। এই সুটকেসটার মধ্যে দশ লাখ রুপিয়া আছে। টুমি গুনিয়া দেখিটে পারো। বাট হোয়্যার ইজ ইয়োর গোল্ডেন গণপতি?"

"আছে, আছে। সব আছে। ও-জিনিস না এনে কি আমি তোমার কাছে অমনই টাকা চাইছি?" বলেই কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে সেই দুষ্প্রাপ্য সোনার গণপতি বের করে আনল শিকারিবাজ। তরপর সেটা সাহেবের হাতে দিতেই কী সব যন্ত্র দিয়ে যেন সাহেব পরীক্ষা করলেন সেটাকে। করেই লাফিয়ে উঠলেন, "সাবাশ শিকারিবাজ। আই অ্যাম কনভেয়িং মাই হার্টিয়েস্ট থ্যাঙ্কস টু ইউ, অ্যাজ ইউ হ্যাভ সাপ্লায়েড মি দ্য পিওর থিংস অ্যাণ্ড ডিড নট চিট মি।"

শিকারিবাজ বলল, "আমি কখনও কাউকে ঠকাই না সাহেব। তোমরা আমাদের দেশের সম্পদ নিয়ে তোমাদের দেশের মিউজিয়াম সাজাবে আর আমরা তোমাদের দেওয়া টাকা নিয়ে মজা করব। এতেই আমাদের আনন্দ। আমরা এই করতেই জন্মেছি।"

"এই টাকা লইয়া এখন টুমি কী করিবে?"

"প্রথমেই আমি ঠাকরুনপাহাড়ির জঙ্গলে আমার গোপন ডেরায় যাব। এই টাকাগুলো সেখানে একটি গুহার মধ্যে লুকিয়ে রাখব। ওই গুহায় আমার অনেক সম্পদ আছে। আর এখন টাকারও ভাগিদার কেউ নেই।"

লক্কা, লোটন বলল, "কে বললে নেই? আমরা তো আছি।"

"তোমরা ছিলে। কিন্তু এখন আর নেই। কেননা, তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছ। আমার বন্ধু অ্যাণ্টনিকে তোমরা আমার অনুমতি ছাড়াই মারতে গিয়েছিলে। তাই আমি যাওয়ার আগে তোমাদের শেষ করে দিয়ে যাব।"

সাহেব তখন সেই দুর্লভ সামগ্রী অর্থাৎ সোনার গণপতিকে মন্দিরের চাতালে নামিয়ে রাখলেন। তারপর শিকারিবাজকে বললেন, "টুমি টোমার টাকা লইয়া চলিয়া যাও। ভোর হইয়া আসিটেছে। আমিও যাই।"

লক্কা, লোটন বলল, "তা তো করবে। কিন্তু আমাদের কী হবে? আমরা কি এইভাবেই থাকব?"

"টোমরা কীভাবে ঠাকিবে উহা ডেখিবার আমার কোনও প্রয়োজন নাই। শিকারিবাজের সহিট টোমাডের বোঝাপড়া হইবে। আমি টোমাডিগকে কিছু বলিব না।"

শিকারিবাজ বলল, "হ্যাঁ। আমার সঙ্গেই ওদের বোঝাপড়া হওয়া উচিত। আমি শত্রুর শেষ রাখব না। আরও দু-চারদিন ঠাকরুনপাহাড়িতে গা-ঢাকা দিয়ে থাকব আমি। তারপর বোম্বাই পালাব। ওখানে একটা ফ্ল্যাট কিনে বিজনেস করব।"

"টা হলে টুমি আর আমার স্মাগলিং পার্টনার ঠাকিবে না ?"

শিকারি হেসে বলল, "না না। তা কেন ? তবে পরের কথা পরে আছে। এখন আমার নতুন জীবন আগে শুরু হোক। তোমার সঙ্গে ওইসব ব্যবসা না করে আমি যাব কোথায় ? শুধু তাই নয়, আমার ইচ্ছে আছে আমি বোম্বাই গিয়ে ফিল্মের ব্যবসা করব। প্রোডিউসার হব। তবে যাওয়ার আগে আমার আর-এক শত্রুকে খতম করব আমি। সে আমার দোস্ত। জঙ্গল-শের। কিন্তু এই সময় তার সঙ্গে আমার দোস্তি রাখলে তাকে আমার টাকার ভাগ দিতে হবে।" বলে সাহেবকে বলল, "অ্যান্টনি, তোমার বাহাদুরকে একবার বলো তো ওই মেশিনগানটা আমাকে দিতে। আমি যাওয়ার আগে এক্ষুনি এই শয়তানদুটোকে ঘুম পাড়িয়ে দিই। তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার বদলা আমি নিজের হাতেই নিয়ে নিই।"

সাহেব হেসে বললেন, "না। এট বোকা আমি না আছে। টোমার মাঠায় ষাঁড়ের গোবর ঠাকিলেও আমার মাথায় উহা নাই। উহারা যেমন আছে টেমনি ঠাকিবে। আমি টোমার হাটে মেশিনগান টুলিয়া ডিলে আমাকেই মারিয়া ডিবে টুমি। সাপকে বিশোয়াস করা যায়, কিন্টু টোমাকে বিশোয়াস করা যায় না।"

"কী বলছ তুমি অ্যান্টনি। তুমি আমার বিজনেস পার্টনার। আমি কখনও তোমাকে মারতে পারি ? তা ছাড়া বেঞ্জামিনের সঙ্গে শত্রুতা আমি চাই না।"

"ড্যাম ইয়োর বেঞ্জামিন। বেঞ্জামিন আমারই নাম আছে। আমি টোমাকে বিশোয়াস করে না। যেভাবে টুমি টোমার ডলের লোকেডের মারিটে চলিয়াছ টাহাটে নেহাট বোকা ছাড়া টোমাকে কেউ বিশোয়াস করিবে না। এখন টাকা লইয়া টুমি পলাইয়া যাও। না হলে আমিই টোমাকে মারিয়া ডিব।"

"অ্যান্টনি !"

"গো অ্যাহেড। ভাগো।"

শিকারিবাজ আর একটুও সময় নষ্ট না করে কোনওদিকে না তাকিয়ে সুটকেসটা নিয়েই মোটরবাইকে চেপে বসল। তারপর প্রাণভয়ে ভীত হয়ে যেই না পালাতে যাবে অমনই দু'দিক থেকে দুটি তীর নিক্ষিপ্ত হল তার দিকে। একটি ফসকাল। একটি লাগল ওর বাঁ দিকের কাঁধে। শিকারিবাজ চিৎকার করে উঠল —আ-আ-আ। কিন্তু ভয়ে বাইক থামাল না। ঝড়ের বেগেই উধাও হয়ে গেল সে।

নেপালি দু'জন বলল, "এ কী করলে সাহেব ? ওই অত টাকা সত্যি-সত্যিই লোকটাকে নিয়ে যেতে দিলে ?"

সাহেব দারুণভাবে হেসে উঠে বললেন, "বুড়ু কাঁহাকা। ওই অ্যাড্‌ভান্সের আড়াই লাখ রুপিয়া লইয়া বোম্বাই যাইলেই ও ঢরা পড়িবে। পুলিশ যখন উহাকে লক-আপে ঢুকাইয়া পিটাইতে ঠাকিবে আমি টখন লণ্ডনে বসিয়া গরম-গরম কফি খাইব। হাঃ হাঃ হাঃ।" হাসতে-হাসতে হঠাৎই সাহেবের হাসি থেমে গেল। কণ্ঠস্বর বিকৃত করে চিৎকার করে উঠলেন সাহেব, "হাউ স্ট্রেঞ্জ !"

"কী হল ! কী হল সাহেব ?"

"আমার সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে বাহাড়ুর।"

"কী সর্বনাশ হল ?"

pathagar.net

"টোমরা এইখানে ডাঁড়াইয়া মজা ডেখিটেছ আর আমি চোখে সর্ষেফুল ডেখিটেছি। আমাদের অন্যমনস্কটার সুযোগে গোল্ডেন গণপতি চুরি হইয়া গিয়াছে।"

"অসম্ভব। এখানে আমাদের এত লোকের চোখের সামনে থেকে কে ওই জিনিস চুরি করবে!"

"কেহ যদি চুরি না করিবে টো উহার কী পা গজাইল যে ছুটিয়া চলিয়া যাইবে? আমি গোল্ডেন গণপতিকে একটু আগে মন্‌ডিরের চাটালে ঠিক এইখানটিতে বসাইয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্‌টু এখন ডেখিটেছি চাটালটা ঠিক আছে। কিন্‌টু গণপতি নাই।"

"রহস্যময় ব্যাপার দেখছি!"

লক্কা, লোটন বলল, "ভাল করে খুঁজে দেখো সাহেব ও-জিনিস এখানেই কোথাও আছে। নেহাত আমরা বাঁধা আছি তাই। না হলে হয়তো চুরির দায়টা আমাদের ঘাড়েই চাপত।"

সাহেব হঠাৎ কী ভেবে রক্তচক্ষু হয়ে বললেন, "বুঝিয়াছি। ইহা ওই শয়টান বালকটিরই কাজ হইবে। উহাকে ছাড়িয়া ডেওয়াটাই আমার ভুল হইয়াছে। শয়টান আমাকে মিট্‌ঠা কঠা বলিয়াছিল। ও বলিয়াছিল গোল্ডেন গণপতি চুরি হইয়া গিয়াছে। কিন্‌টু শিকারি পাকা প্রমাণ করিয়াছে উহা চুরি হয় নাই। এখন একবার আমি উহাকে ঢরিটে পারিলে উহার গলার টুঁটি ছিঁড়িয়া ফেলিব।"

লক্কা, লোটন বলল, "ওকে আবার পেলে তবে তো ওর টুঁটি ছিঁড়বে সাহেব। আমাদের ওপর বিশ্বাস রেখে একটু ধৈর্য ধরে থাকলে সব ঠিকঠাক হয়ে যেত। শুধু-শুধু হনুমানের মতো লম্ফঝম্ফ করে উদারতা দেখাতে গিয়েই দিলে সব কিছু গুবলেট করে। ওই বালক যা-তা বালক নয়। ওরকম শয়তান নরকেও নেই। আমরা তো ওকে মারতেই চাইছিলাম। কিন্তু তুমিই বাদ সাধলে। এখন বোঝো।"

"আমি আমার ভুল বুঝিটে পারিয়াছে। এখন টোমরা কি পারিবে উহাকে আমার কাছে ঢরিয়া আনিটে?"

"অসম্ভব। এই দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ওই মূর্তি নিয়ে সে এখন কোথায় কতদূরে পালিয়েছে তার ঠিক কী! তা ছাড়া প্রচুর রক্তক্ষরণে আমরা খুব দুর্বল। তবে তুমি যদি আমাদের বাঁধন খুলে মুক্তি দাও তা হলে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।"

সাহেব কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, "হ্যাঁ। আমি টোমাডের অবশ্যই মুক্‌টি ডিবো। টা না ডিলে টোমরা এই অবস্‌ঠায় ঠাকিলে কাল সকালে পুলিশকে টোমরা সব কঠা বলিয়া ডিবে। তা ছাড়া আমি টোমাডের জালি নোট উয়া ঠকাইতে আসিয়াছিলাম ইহা টোমরা জানিয়া গিয়াছ। টাই টোমরা শিকারিবাজের সহিট হাট মিলাইয়া আমার পিছনে লাগিবে। অটএব টোমরা এখন ডুর্গামাটাকে শরণ করিটে পারো। আমি টোমাডের চির মুক্‌টির ব্যবস্‌টা করিয়া ডিটেছি। বাহাডুর! স্টার্ট! ঠা-রা-রা-রা। হাঃ-হাঃ-হাঃ।"

সাহেবের নির্দেশে বাহাদুর মেশিনগান চালিয়ে ঝাঁজরা করল লক্কা-লোটনের দেহ দুটো। আর ঠিক সেই মুহূর্তে মন্দিরের ছাদের ওপর থেকে শাঁই-শাঁই করে

তীর এসে বিঁধতে লাগল নেপালি দু'জনের গায়ে। সাহেবও বাদ পড়লেন না। এই অতর্কিত আক্রমণে শুরু হয়ে গেল সকলের চিৎকার-চেঁচামেচি ও লম্ফঝম্ফর পালা।

সাহেবের গায়ে একটিমাত্র তীর লেগেছিল। তাতেই সে কী চিৎকার। সাহেব কোনওদিকে না তাকিয়ে প্রাণ নিয়ে পালাবার জন্য ছুটে গেলেন যেখানে তাঁর গাড়িটা রাখা ছিল, সেইদিকে। সাহেব পালালেন। কিন্তু তীর-বেঁধা দু'জন যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। এক-একজনের গায়ে তিন-চারটি করে তীর বিঁধেছে। ওরা মাটিতে উপুড় হয়ে ছটফট করছে মরণ যন্ত্রণায়।

ওদের ওই অবস্থা দেখে এবং নিরাপদ বুঝে রুনকি ও ঝুনকিকে নিয়ে গাছের ডাল ধরে নীচে নামল শুভঙ্কর।

শুভঙ্করকে দেখে তো বিস্ময়ের শেষ রইল না বিল্টুর। সে সেই ভাঙা মন্দিরের পেছনের জঙ্গল থেকে সব কিছুই লক্ষ করছিল এতক্ষণ। এবার শুভঙ্করকে দেখেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল।

শুভঙ্কর তো আগেই দেখেছে বিল্টুকে। তাই শুধুমাত্র আনন্দের প্রকাশ ছাড়া বিস্ময়ের প্রকাশ কিছুই ঘটাল না সে।

শুভঙ্করকে বুকে জড়িয়ে বিল্টু বলল, "তুই এখানে কী করে এলি শুভঙ্কর ?"

"সে অনেক কথা। এক্ষুনি সব বলা যাবে না।"

"তুই না এলে এদের হাতেই আমার মৃত্যু হত আজ।"

"বিপদ যিনি দিয়েছেন, বিপদ মুক্ত করার জন্য তিনিই আমাকে নিয়ে এসেছেন। এই অচেনা জায়গায় আমাদের এই আদিবাসী বোন দুটিকে হঠাৎ করে যদি না পেতাম, তা হলে কিছুতেই কিছু হত না রে। ওরা যদি আড়াল থেকে তীর ছুঁড়ে ওদের ঘায়েল না করত তা হলে মরতেই হত তোকে। আমিও দূরে বসে মাথা খুঁড়তাম। তবে তুই যে কখন কীভাবে মূর্তিটা চুরি করলি তা কিন্তু টেরই পেলাম না কেউ।"

বিল্টু কপাল চাপড়ে আশাহতের মতো বলল, "রহস্যটা তো এইখানেই। ও মূর্তি আমি মোটেই চুরি করিনি।"

"সে কী! তা হলে গেল কোথায় মূর্তিটা ?"

"কী জানি। আমরা এই ক'জন ছাড়া আর কেউ তো নেই এখানে। অথচ ভোজবাজির মতো মন্দিরের চাতাল থেকে উধাও হয়ে গেল মূর্তিটা।"

শুভঙ্কর বলল, "আমি ভাবলাম তুই নিয়েছিস।"

"আমি তো মন্দিরের পেছনে লুকিয়ে ছিলাম। এক-একবার ভাবছিলাম, এদের খপ্পর থেকে মুক্তি যখন পেয়েছি তখন পালিয়ে যাই। শুধু পারছিলাম না এই কারণে যে, কে বা কারা তীর ছুঁড়ছে তা না জেনে পালানোটা ঠিক নয়। আমার কখনও মনে হচ্ছিল হয়তো মউকে নিয়ে তুই এসেছিস আমাকে উদ্ধার করতে, আবার কখনও মনে হচ্ছিল ঠাকরুনপাহাড়ির জঙ্গল-শেরের দল হয়তো বা খবর পেয়ে শিকারিবাজের হাত থেকে সোনার গণপতি ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য এই কৌশল নিয়েছে। ভাগ্যে পালাইনি। তা হলে তোর সঙ্গে দেখা হত না।"

"জঙ্গল-শেরকে তুই চিনিস বিল্টু ?"

"না। তবে এই অঞ্চলের সন্ত্রাস সে। ওর নাম শুনেছি। চোখে দেখিনি।

শিকারিবাজের চেয়েও ডেঞ্জারাস। খুন, জখম, ডাকাতি ছাড়াও জঙ্গলের কাঠ চোরাপথে চালানের একজন লিডার। কিন্তু তুই হঠাৎ জঙ্গল-শেরের কথা জিজ্ঞেস করছিস কেন?"

"আমি ওর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে কোনওরকমে এই জঙ্গলে এসে পড়েছি। কিন্তু মউটাকে বাঁচাতে পারিনি।"

"তার মানে!"

"জঙ্গল-শের মউকে নিয়ে চলে গেছে। এখন তুই যে উদ্ধার হলি, এবার ওকে উদ্ধার করি চল। ওইসঙ্গে চেষ্টা করে দেখি তিন্নিটাকেও যদি খুঁজে পাওয়া যায়। তুই-আমি দু'জনে সক্রিয় হলে হয়তো সে-কাজ সম্ভব। বিশেষ করে জঙ্গল শের আর শিকারিবাজের গোপন ঘাঁটি যখন ঠাকরুনপাহাড়িতেই, আর ওরা যখন দল ভেঙে নিজেরাও দুর্বল, তখন আশা করি খুব একটা বেগ পেতে হবে না।"

"বেশ। তবে তাই চল। কিন্তু আমাদের এত সাধের সোনার গণপতি? সেটা কী হল বল দেখি?"

এমন সময় হঠাৎই সকলকে চমকে দিয়ে তিন্নির আর্বিভাব হল সেইখানে। তিন্নি বলল, "ওটা এখন আমার হাতে বিল্টুদা।"

শুভঙ্কর বলল, "এ কী তিন্নি? তুমি! তুমি কোত্থেকে এলে?"

"সে অনেক কথা শুভদা। এই নাও, একবার হাতে নিয়ে দ্যাখো, কী চমৎকার। কত বাধা-বিঘ্নের পর রক্তপাতের ভেতর দিয়ে এই জিনিস আমাদের হাতে এল বলো তো? এতক্ষণ এটা আমার বুকে ছিল। এবার তোমরা একে মাথায় নাও।"

তখন একটু-একটু করে ভোরের আলো ফুটে উঠছে। ব্রাহ্ম মুহূর্ত যাকে বলে। ওরা তিনজনে সেই সোনার গণপতিকে মাথায় নিয়ে নৃত্য করল প্রথমে। তারপর কনকদুর্গা মন্দিরের চাতালে বসিয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে ফুটে থাকা জবা, কলকে ও শিউলি ফুলে অঞ্জলি দিল গণপতিকে। হঠাৎ নেচে-নেচে বলতে লাগল, "গণপতি বাপ্পা মোরইয়া, উর্চা বর্ষী লৌকরি আ।"

বিল্টু বলল, "এসব কী বলছিস তুই?"

শুভঙ্কর বলল, "আমার বাবার মুখে শুনেছি। এই সময় মহারাষ্ট্রে গণেশ চতুর্থীতে আমাদের দুর্গাপুজোর মতন মহাসমারোহে গণপতি উৎসব হয়। বিশেষ করে শিবাজির দেশ পুনেতে এই উপলক্ষে লক্ষ-লক্ষ নরনারীর আগমন ঘটে। এই পুজোর এগারো দিনের দিন প্রতিমা যখন নিরঞ্জন হয়, সবাই তখন এই কথা বলে। বোম্বাইতে আরব সাগরের জলেও লক্ষ-লক্ষ গণপতি নিরঞ্জন হয় চৌপট্টিতে। সে নাকি এক দেখবার মতো জিনিস। তাই ওই কথাটা আমার মনে এল।"

"কিন্তু আমাদের গণপতির নিরঞ্জন কি আজ?"

"আজ না হলেও একদিন তো বটেই। এবার আমরা একটা শুভদিন দেখে একে রাবণ হ্রদে নিরঞ্জন দিতেই নিয়ে যাব। তা হলে?"

তিন্নি বলল, "তা হলে আর দেরি নয়। ভীষণ খিদে পেয়েছে। চলো, আমরা কোনওরকমে জঙ্গল পার হয়ে কোথাও গিয়ে দুটি খেয়ে নিই। তারপর শুরু করি

pathagar.net

ঠাকরুনপাহাড়ি অভিযান। মউটাকে উদ্ধার তো করতে হবে।"

বিল্টু বলল, "না। আর এক মুহূর্ত দেরি নয়। খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে। শুধু বাঁচার আনন্দে ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব ভুলেছি। চলো, এখুনি চলো। কোথাও গিয়ে পেটে কিছু দেওয়ার ব্যবস্থা করেই লেগে পড়ি অভিযানে।"

শুভঙ্কর বলল, "যাব তো। কিন্তু তুই কি জানিস ঠাকরুনপাহাড়ি কোনখানে?"

"সে অনেকদূর। এখন আমাদের জঙ্গল পার হয়ে বড় রাস্তায় যেতে হবে। সেখান থেকে বাসে করে যেতে হবে ঝাড়গ্রামে। তারপর আবার অন্য বাসে উঠে বেলপাহাড়ি। বেলপাহাড়ি থেকে হাঁটাপথে শুধু বন আর পাহাড়ের মধ্য দিয়ে অনেকদূর গেলে তবেই ঠাকরুনপাহাড়ি।"

"তুই গেছিস কখনও?"

"না যাইনি। তবে গল্প শুনেছি।"

শুভঙ্কর এবার রুনকি-ঝুনকির দিকে তাকিয়ে বলল, "তোদের অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি রে। এবার তোদের ছুটি।" বলেই পকেট থেকে পঞ্চাশটা টাকা বের করে বলল, "এই নে। এখনকার মতো রাখ। পরে তোদের আরও দেব। অনেক টাকা দেব।"

রুনকি-ঝুনকির চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠল এবার। বলল, "এই টাকা তুরা রেখে দে। আমরা এ টাকা লিব না। আমরাও তুদের সাথে ঠাকরুনপাহাড়ি যাব। ওই জঙ্গল-শেরের বুকে একটা তীর আমরা মারবই মারব।"

শুভঙ্কর বলল, "সে কি! তোদের মাছধরা জালটা ডুলুং-এ পাতা রইল যে। কেউ যদি চুরি করে নেয়?"

"নিক গে। তবু আমরা যাব তুদের সাথে। তুরা বড় ভাল। তুদের কোনও বিপদ হঁলে আমরা তীর-কাঁড় নিয়ে রুখে দাঁড়াব।"

শুভঙ্কর ততক্ষণে লক্কা-লোটনের রিভলভার দুটো কুড়িয়ে পেয়েছে। ওর কাছে যেটা ছিল সেটা ফেলে দিয়ে নতুন একটাই কুড়িয়ে নিল। তারপর অন্যটার ভেতর থেকে গুলি বের করে পকেটে রেখে বলল, "এইবার যাবি কোথায় বাছাধনরা? তোদের মারণ-অস্ত্র এখন আমার হাতে।"

তিন্নি তখন চটপট কয়েকটি কলাগাছের গা থেকে পেটো ছাড়িয়ে সেই পেটোয় সোনার গণপতিকে এমনভাবে মুড়ে ফেলেছে যে, বাইরে থেকে কারও আর বোঝবার উপায়টি নেই যে, ওর ভেতরে কী আছে। সব কিছু ঠিকঠাক করে কনকদুর্গার উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে তিন্নি বলল, "আর দেরি নয়। সকাল হয়ে আসছে। চলো এবার।"

রুনকি-ঝুনকি বলল, "আমরাও তুদের সঙ্গে যাব রে দিদি।"

তিন্নি বলল, "না রে। আমরা যাচ্ছি জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে। তোরা কোথায় যাবি? তোরা আমাদের জন্য যা করেছিস, তা আমরা কখনও ভুলব না। এবার দ্যাখ না বছর-বছর শীতকাল হলেই আমরা এই চিল্কিগড়ে পিকনিক করতে আসব। ডুলুং নদীর বুকে পাথরে বসে মাংস-ভাত রান্না করব। তোদের জন্য কত কী নিয়ে আসব। তোরাও খাবি আমাদের সঙ্গে। রাত্রিবেলা তোদের ঘরে থাকব। কী মজা হবে বল তো? এখন তোরা ঘরে যা। আমরা আসি।"

ওরা যখন যাওয়ার উপক্রম করছে তেমন সময় ওদের কানে এল, "বাবু ! খোকাবাবু !"

ওরা ফিরে তাকিয়ে দেখল তীর-বেঁধা অর্ধমৃত সেই নেপালি দু'জন ছটফট করছে। তিন্নি আর শুভঙ্কর ছুটে গিয়ে টেনে-হিঁচড়ে ওদের গা থেকে বেঁধা তীরগুলো খুলে নিয়ে রুনকি-ঝুনকিকে দিয়ে দিল। আর ওদের বলল চিলকিগড়ে যেতে। ওখানে ডাক্তার-বদ্যি আছে।

রুনকি-ঝুনকি ওদের বিদায় জানাল।

বিল্টু, তিন্নি ও শুভঙ্কর এগিয়ে চলল সেই নির্জন বনপথ ধরে। এখন আর কোথাও কোনও আবছায়া নেই। রোদ না উঠলেও আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে।

যেতে-যেতে বিল্টু বলল, "তুই ওদের খপ্পর থেকে কি করে পালালি তিন্নি !"

তিন্নি হেসে বলল, "সোনার গণপতির অশেষ করুণায়। ওরা তো দড়ির বাঁধন খুলে আমার কাছ থেকে তোমাকে নিয়ে গেল। তুমি তখন যা ছটফট করছিলে বা ওদের লাথি মারছিলে তাতেই ওরা ভুলে গেল আমাকে বাঁধতে। আর সেই সুযোগে আমিও করলুম কি, সুট করে পালিয়ে গেলুম। তারপরে জঙ্গলে ঢুকে এমন এক জায়গায় লুকিয়ে রইলুম, যেখান থেকে আমি সবাইকে দেখতে পেলেও আমাকে কেউ দেখতে পেল না।"

"তারপর ?"

"তারপর তো নাটকের দৃশ্যের মতো সব কিছুই দেখলাম আমি। আর যে মুহূর্তে দেখলাম সাহেব সোনার গণপতিকে মন্দিরের চাতালে রেখে একটু অন্যমনস্ক হয়েছেন, অমনই আমি জীবন বিপন্ন করে ওটাকে উদ্ধার করার জন্য এগিয়ে গেলাম। বহুকষ্টে ভয়ে-ভয়ে বুকে হেঁটে ওটাকে নিয়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে পালিয়ে এলাম আমি।"

"খুব চালাকি করেছিস তুই। আর রীতিমত সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিস।" তারপর শুভঙ্করকে বলল, "কিন্তু তোর ব্যাপারটা কী ? এবার নিশ্চয়ই বলা যাবে ?"

শুভঙ্কর ধলভূমগড়ের বৃত্তান্ত থেকে শুরু করে আগাগোড়া সব কথা খুলে বলল ওদের। রুদ্ধশ্বাস গল্পের মতো পুরো কাহিনীটা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল সকলে। এই জঙ্গলমহলে তখন শরতের সোনার রোদ একটু-একটু করে ফুটে উঠছে। ওদের আশা ও আনন্দের মাঝে মউকে হারানোর ব্যথাটাই যে পীড়া দিচ্ছে শুধু। এখন কোনওরকমে মউকে ফিরে পেলেই সব বাধামুক্ত হয়ে ছুটে চলবে অজানার উজানে। অর্থাৎ কৈলাস-মানসের পথে।

॥ ১১ ॥

pathagar.net

প্রায় মাইলখানেক হেঁটে যাওয়ার পর ওরা দেখল জঙ্গল ক্রমশ পাতলা হয়ে আসছে। বেশ কিছুটা দূরে একটি চালাঘরও নজরে পড়ছে। ওরা সেই চালাঘরের কাছাকাছি এসে দেখল, আসলে সেটি একটি চায়ের দোকান। দোকানের সামনে পেতে রাখা বেঞ্চিতে কয়েকজন লোক বাসের প্রতীক্ষায় বসে

আছে। ওরা যেতেই দোকানদার সবিস্ময়ে বলল, "তোমরা কারা গো বাছাধনেরা ? এই এত সকালে এখানে কী করে এলে ? কোথায় গিয়েছিলে তোমরা ?"

শুভঙ্কর বলল, "আমরা চিলকিগড় গিয়েছিলাম। সেখান থেকে আসছি। ডুলুং নদী পেরিয়ে কনকদুর্গার মন্দির দর্শন করে শালবন পার হয়ে আসছি।"

"বেশ করেছ। কিন্তু মন্দির দর্শন কী করে করলে বাবা ? এত সকালে মন্দির তো খোলে না ?"

"নাই বা খুলল। বাইরে থেকেই মন্দির দেখলাম। আর দেখার মতো খুব একটা তো কিছু নেই।"

"তা অবশ্য নেই। তবে মন্দিরেই যখন গেলে তখন এত তাড়াহুড়ো না করে মন্দির খোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেই পারতে।"

এবারে তিন্নি বলল, "তাতেই বা লাভটা কী হত ? মন্দিরে বিগ্রহ তো নেই।"

"আঃ। বিগ্রহ নাই-বা রইল। বলি, পুজোপাঠ তো হয়। তাই দেখতে পারতে। দশটার সময় ঠাকুরমশাই এসে মন্দির খুললে তারপর যেতে পারতে।"

বিল্টু বলল, "আসলে আমাদের হাতে সময় খুব কম। এখন আমরা ঝাড়গ্রাম যেতে চাই। বাসটাস আছে কি কিছু বলতে পারেন ?"

"বাস আছে বইকী। অনেক বাস। আধঘণ্টা অপেক্ষা করো, একটা বাসের আসবার সময় হয়ে গেছে।"

"তা যদি হয় তা হলে তার আগে একটু জলযোগ সেরে নেওয়া যাক। কী পাওয়া যাবে বলুন তো আপনার দোকানে ?"

"যা চাইবে তাই পাবে। আলুর চপ, মুড়ি, গরম জিলিপি, শুকনো বোঁদে, বাসী গজা, আর কী চাই ?"

তিন্নি বলল, "বাসী গজা ? ক'দিনের ?"

"কালকের।"

শুভঙ্কর বলল, "এখন আর টাটকা-বাসীর ব্যাপার নেই আমাদের কাছে। যা পারেন দিন। খুব খিদে পেয়েছে।"

দোকানদার এইরকম খদ্দের পেয়ে তো বর্তে গেল। তাই সব কিছুই কিছু-কিছু করে দিল ওদের।

ওরা গোগ্রাসে খেয়ে নিল সব। বিশেষ করে বিল্টু আর তিন্নি তো খাওয়ার জন্য পাগল হয়ে উঠেছিল। ওরা মুড়ি, তেলেভাজা, গরম জিলিপি খেয়েই ঢকঢক করে জল খেয়ে নিল কয়েক গেলাস।

দোকানদার বলল, "চা দেব ?"

শুভঙ্কর বলল, "সে-কথা আবার বলতে ? এতসব খাওয়ার পরে এই সকালবেলায় একটু চা না খেলে হয় ?"

দোকানদার চা দিল। ওরা বেশ আয়েস করে দোকানে বসে যখন চা খাচ্ছে, তেমন সময় হঠাৎ একটি পুলিশের জিপ ঝড়ের বেগে ঢুকে পড়ল সেই জঙ্গলের পথে।

দোকানদার অবাক হয়ে বলল, "বাব্বা। এত সকালে আবার পুলিশের আগমন কেন ?"

pathagar.net

বাইরের বেঞ্চিতে বসা অপেক্ষমাণ বাসযাত্রীরা বলল, "নিশ্চয়ই কোনও খুনখারাপি হয়েছে কোথাও। তাই প্রভুদের পায়ের ধুলো পড়ছে।"

দোকানদার বলল, "কী গো ছেলেরা! তোমরা তো এলে ওইদিক দিয়ে। সেরকম কিছু দেখলে নাকি? মানে খারাপ কিছু?"

"না। সেরকম কিছু তো চোখে পড়ল না। অবশ্য আমরাও তাকাইনি কোনওদিকে। আসলে আমাদের কলকাতা যাওয়ার তাড়া। ঝাড়গ্রামে যাচ্ছি ট্রেন ধরতে।"

বিল্টু বলল, "কিন্তু আধঘণ্টার ওপর তো হয়ে গেল। বাস এত দেরি করছে কেন?"

"আসবে, আসবে। এখুনি আসবে।"

এমন সময় হঠাৎ একটা ট্রাক আসতে দেখে দোকানদার ট্রাককে থামিয়ে বলল, "এই! এটা কোথায় যাচ্ছে এখন? ঝাড়গ্রাম?"

ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে বলল, "হ্যাঁ, কেন?"

"বাবুদের এই ছেলেমেয়েগুলোকে একটু তুলে নাও তো। এরা সব কলকাতার ট্রেন ধরবে।"

"স্টিলে যাবে বুঝি?"

বিল্টু বলল, "হ্যাঁ।"

"তা হলে চট করে উঠে পড়ো।"

ওরা সানন্দে খাবারের দাম মিটিয়ে দোকানদারকে ধন্যবাদ জানিয়ে ট্রাকে উঠে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল।

ট্রাক ছুটে চলল হুহু করে।

ওরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। আসলে পুলিশের জিপ দেখে যা ভয় হয়েছিল ওদের, তা বলবার নয়। আর-একটু হলেই ধরা পড়ে গিয়েছিল আর কি। ভাগ্যিস ওরা এসে দোকানে কোনও খোঁজখবর নেয়নি। পুলিশ যে ওদেরই সন্ধানে এখানে এসেছে, তা ওরা ছাড়া আর কেই-বা জানে? যাই হোক, বিপদ কিন্তু এখনও কাটেনি। অবশ্য শুভঙ্কর বুদ্ধি করে দোকানদারকে ওদের কলকাতা যাওয়ার কথা বলায় একটা কাজ হবে এই যে, যদি পুলিশ ওই জঙ্গল থেকে ফেরার পথে দোকানে এসে কোনও জিজ্ঞাসাবাদ করে, তখন সবাই একবাক্যে বলবে, "হ্যাঁ হ্যাঁ। ছেলেমেয়েগুলো এখানে এসেছিল বটে, তবে ওরা তো একটু আগেই ঝাড়গ্রাম চলে গেছে কলকাতার ট্রেন ধরবে বলে।" এতে হবে কি এখানকার পুলিশ অনেকটা নিশ্চিন্ত হবে। আর ঝাড়গ্রাম অথবা ঠাকরুন পাহাড়ির দিকে অযথা ওদের খোঁজে যাবে না।

ঝাড়গ্রাম এখান থেকে খুব বেশিদূরের পথ নয়। এক-দেড় ঘণ্টার রাস্তা। তবে দ্রুতগামী ট্রাক তার চেয়েও অনেক কম সময়ের মধ্যে ওদের লেভেল ক্রসিং-এর কাছে নামিয়ে দিল।

এই জায়গাটা খুব জমজমাট। যতসব দোকানদানি হোটেল-পত্তরের মেলা। ক্রসিং পেরোলেই বাঁ দিকে বাজার। এ-বছর কী আম উঠেছে। সব দোকানে তোতাপুলি, গোলাপখাস আর বেগুনফুলি আমের পাহাড় সাজানো আছে যেন। ওরা তিনজনে চারদিকে একবার অনুসন্ধানী চোখ মেলে দেখে নিল। তারপর

চিন্তা করতে লাগল কীভাবে কী করবে, তাই নিয়ে। প্রথমত, খুব সাবধানে যেতে হবে ওদের বেলপাহাড়ির দিকে। সে-জায়গা যে কোথায় কতদূরে, শুভঙ্কর তা জানে না, তবে বিল্টু ও তিন্নি জানে। কিন্তু মুশকিল হল এই, দুষ্প্রাপ্য ও বহুমূল্য গণপতিকে নিয়ে সে-পথে অভিযান কি সম্ভব ? পথিমধ্যে কোনও বিপদ ঘটলে এই দুর্লভ সামগ্রী পেয়েও হারাতে হবে। তাই কী যে করবে ওরা তা নিয়ে দারুণ চিন্তায় পড়ে গেল। কেননা ওদের শত্রু এখন একজন নয়। একদিকে শিকারিবাজ, অপরদিকে জঙ্গল-শের। এ-জিনিস হাতছাড়া হলে ওদেরই পোয়া-বারো।

তাই উদ্দেশ্যহীনভাবেই ওরা এদিক-সেদিকে পায়চারি করতে-করতে উপায় একটা ঠিক করল।

তিন্নি বলল, "এখন আমরা যে-কোনও বাসে শিলদায় চলে যাই চলো। ওখানে আমার মামার বাড়ি। এই মূর্তিটা যেভাবেই হোক ওখানে কোথাও লুকিয়ে রেখে আমরা চলে যাব আমাদের আসল জায়গায়। তা হলে মূর্তি খোয়ানোর ভয়টা আর থাকবে না।"

বিল্টু বলল, "তোর যুক্তিটা মন্দ নয়। তবে আমার মনে হয় এখন আমাদের এখানে-ওখানে কোথাও না গিয়ে ঝাড়গ্রামেই কোনও হোটেলে উঠে পড়া ভাল।"

শুভঙ্কর বলল, "সেটা করলেও মন্দ হয় না। কিন্তু হোটেলে ওঠার খরচও তো অনেক।"

"হোটেল না হলে ধর্মশালায়। এইখানে একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন চমৎকার ধর্মশালা আছে। অগ্রসেন ধর্মশালা। ঝকঝকে তকতকে। পাশেই নতুন মন্দির। এই ধর্মশালায় বিছানাপত্তর, মশারি সব আছে। জলকলের ব্যবস্থাও ভাল। প্রতিদিন দশ টাকা ভাড়া। বড় ঘর। তাই বলছিলাম কি, এইখানে উঠে স্নান-খাওয়া সেরে আমাদের মধ্যে যে-কোনও একজনকে সোনার গণপতির পাহারায় রেখে বাকি দু'জন যেতাম মউয়ের খোঁজে।"

তিন্নি বলল, "সোনার গণপতির পাহারায় থাকবেটা কে শুনি ? আমি কিন্তু ও দায়িত্ব নিচ্ছি না। তোমাদেরও ছাড়ছি না আমি। তা ছাড়া একা থাকতে দারুণ ভয় করবে আমার। যদি পুলিশ আসে বা চোর-ডাকাত আসে, তা হলে একা আমি কী করব ? ওখানে গিয়ে তোমাদের কোনও বিপদ হলে আমি জানতেও পারব না। আর মউয়ের জন্য মনটা খুব খারাপ হচ্ছে আমার।"

শুভঙ্কর বলল, "না না। এ-ব্যাপারে আমার কিন্তু একদম সায় নেই। আমাদের আর কোনওমতেই দলছুট থাকা ঠিক নয়। শুধু তাই নয়, আমাদের তিনজনের এখন কোনও হোটেল বা ধর্মশালায় থাকাটাও বিপজ্জনক।"

বিল্টু বলল, "কেন, বিপজ্জনক কেন ?"

"দুপুরে যদি কেউ শয়তানি করে পুলিশকে জানিয়ে দেয় তা হলে কিন্তু সব মাটি হয়ে যাবে। আর সোনার গণপতিও চলে যাবে পুলিশের হাতে। তার চেয়ে আমি বলি কি শিলদায় তিন্নির মামার বাড়িতেই চলে যাই চল। ওখানে তবু শান্তিতে গা-ঢাকা দিয়ে থাকা যাবে। মূর্তিটাও নিরাপদে থাকবে।"

তিন্নি বলল, "সেইজন্যই তো আমি বলছি আগে আমার মামার বাড়িতে যাই

চলো। কেননা এত কাণ্ডের পর এই মূর্তি আবার হাতছাড়া হলে দুঃখের আর শেষ থাকবে না।"

ওরা যখন রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে এইসব আলোচনা করছে, সেই সময় হঠাৎ করে একটি বাস এল। কী প্রচণ্ড ভিড় তাতে। এ-বাসটা শিলদা যাবে।

বিল্টু বলল, "বড্ড ভিড়। কী করবি ?"

শুভঙ্কর বলল, "ভিড় তো কী হয়েছে ? আমাদের এখন জানলার ধারে বসে প্রকৃতির দৃশ্য দেখবার সময় নয়। এইরকম ভিড়ভাট্টার ভেতর দিয়েই এখন আমাদের যাওয়া উচিত। যাতে কেউ কোনওরকমেই আমাদের ব্যাপারে কোনও ইনফরমেশন কাউকে দিতে না পারে। এবং সেইজন্যই আমরা তিনজনে বাসে উঠে আলাদাভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকব। যে-যার টিকিটও নিজে-নিজেই কাটব। আর শিলদা এলেই ঝুপঝাপ নেমে পড়ব এক-এক করে।"

তিন্নি বলল, "কিন্তু আমার কাছে তো বাস-ভাড়ার টাকা নেই।"

শুভঙ্কর বলল, "জানি। এই নাও, পাঁচটা টাকা রেখে দাও তোমার কাছে।" বলে একটি পাঁচ টাকার নোট ওর দিকে এগিয়ে দিল।

তিন্নি সেটা নিয়ে সামনের গেট দিয়ে উঠে পড়ল বাসের ভেতর। ওরাও উঠল পেছনের গেট দিয়ে। ভুলাভেদা না কোথাকার বাস যেন এটা। শিলদা, বেলপাহাড়ি হয়ে যাবে। মানুষে ভর্তি বাসের ভেতরটা। ভাদ্র মাসের এই গুমোট গরমে গা যেন গুলিয়ে উঠছে। তিন্নি ও বিল্টুর এসব অভ্যাস আছে। কিন্তু শুভঙ্করের এই প্রথম। তাই খুবই অসুবিধে হল ওর।

এইভাবে প্রায় ঘণ্টা দুই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার পর শিলদা এলে ঝুপঝাপ নেমে পড়ল সকলে। বাস এখানে ফাঁকা হয়ে গেল। আজ এখানে হাটবার। তাই হাটমুখো লোকের আধিক্যই বেশি। ওরা সকলের নজর এড়িয়ে একটি শিবমন্দিরের পাশ দিয়ে তিন্নির মামাবাড়িতে এল।

তিন্নির দিদিমা তো ওকে পেয়ে কী যে খুশি তা বলবার নয়। আশি বছরের বুড়ি ঠুকঠুক করে এসে তিন্নিকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগলেন। বললেন, "কাল রাতে আমরা খবর পেলুম তোদের বাড়িতে নাকি ডাকাতি হয়েছে। তোকে নাকি ডাকাতরা তুলে নিয়ে গেছে। তোর বাবাকেও নাকি হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। সেই শুনেই তোর মামারা সবাই গেছে ধলভূমগড়ে। আজই সকালের বাসে গেছে ওরা।"

তিন্নি শিউরে উঠে বলল, "বাবাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে ? কেন, কী হয়েছে বাবার ?"

শুভঙ্কর বলল, "সব কথা তোমাকে তো বলেইছি তিন্নি। মউ আর আমি তোমার বাবাকে আহত অবস্থায় পাই। আঘাত খুব গুরুতর নয়, আবার সামান্যও নয়। সেই কারণেই হয়তো ওঁকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে। তুমি অযথা চিন্তা কোরো না। উনি সেরে উঠবেন।"

দিদিমা বললেন, "কিন্তু তুই এখানে কী করে এলি ? এরা কারা ?"

"তুমি ওদের চিনবে না দিদিমা। এই হল বিল্টুদা। যাদের বাড়িতে আমরা থাকি। আর ইনি হলেন শুভদা। ডাকাতরা বিল্টুদাকেও চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। আমার সঙ্গে। এই শুভদাই আমাদের উদ্ধার করেছেন। আমাদের

pathagar.net

আর-এক বন্ধু মউকেও নিয়ে গেছে ওরা। যতদূর সম্ভব ওরা ওকে বেলপাহাড়ির কাছে ঠাকরুনপাহাড়ির জঙ্গলে লুকিয়ে রেখেছে। ওর খোঁজেই আমরা এখানে এসেছি দিদিমা!"

"ঠাকরুনপাহাড়ি! ওরে বাবা! ও তো ঠ্যাঙাড়ে ডাকাতের জায়গা। ওখানে কেউ যায়?"

"আমরা যাব। না গেলে মেয়েটা বাঁচবে না।"

"কিন্তু যদি তোদের কোনও বিপদ হয়?"

"সে আমরা বুঝেশুনে সাবধানেই যাব। এখন যা হোক দুটো কিছু তুমি খেতে দাও।"

"কী দিই বল তো? কী আছে ঘরে? অভাবের সংসার। দুটো ভাতে-ভাতই রেঁধে খা।"

"ওরে বাবা! ভাত রাঁধবার সময় নেই আমাদের। মুড়ি আছে ঘরে? থাকে তো দাও।"

"হ্যাঁ। কিন্তু শুধু মুড়ি খাবি কী করে?"

তিন্নি বলল, "শুভদা, আর পাঁচটা টাকা দেবে? তা হলে এক্ষুনি হাটে গিয়ে কিছু চিঁড়ে কিনে আনতুম।"

বিল্টু বলল, "না, তোকে কোথাও যেতে হবে না। হাট আমি দেখে এসেছি। আমিই কিনে আনছি ওখান থেকে। তুই ঘরে থাক।"

বিল্টু শুভঙ্করের কাছ থেকে টাকা নিয়ে হাটে গেল। তারপর চিঁড়ে, ছাতু আর মিষ্টি কিনে আনল কিছু। মুড়ির সঙ্গে ভিজিয়ে তাই মেখেই পেট পুরে খেল ওরা তিনজনে। তারপর তিন্নি করল কি, কলার পেটোয় মোড়া সেই সোনার গণপতিকে দিদিমার ঠাকুরঘরে অন্ধকারে একটি মাটির জালার ভেতর ঢুকিয়ে রেখে বিল্টু ও শুভঙ্করকে ইশারা করল, "চলো।"

ওরা দিদিমাকে প্রণাম করে যাওয়ার জন্য তৈরি হল।

দিদিমা বললেন, "তোরা ফিরবি কখন?"

"ঠিক নেই। রাত্রিও হতে পারে আবার সকালও হয়ে যেতে পারে।"

দিদিমা বললেন, "আমার কিন্তু ভয় করছে খুব।"

তিন্নি বলল, "ভয় নেই। তোমার আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে যাচ্ছি। কে কী করবে আমাদের? যাই হোক, তুমি কিন্তু সাবধানে থেকো। ঘরের দরজা বন্ধ করে রেখো সব সময়। আর কেউ যদি আমাদের খোঁজে এখানে আসে তা হলে বোলো আমরা এসেছিলাম, তোমার সঙ্গে দেখা করেই কলকাতায় ফিরে গেছি।"

"তোদের খোঁজে কে আসবে এখানে?"

"তা জানি না। চোর-ডাকাতও আসতে পারে, আবার পুলিশও আসতে পারে।"

দিদিমা শিউরে উঠলেন, "ও মাগো!"

"তুমি দরজায় খিল দাও দিদিমা।"

দিদিমা সভয়ে বললেন, "সিদ্ধিদাতা গণেশ, সিদ্ধিদাতা গণেশ।"

ওরা দিদিমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গ্রাম্যপথ ধরে বড় রাস্তায় এল। বেলপাহাড়ির একটি বাস ঝাড়গ্রামের দিক থেকে এসে থেমেছে তখন। ওরা

pathagar.net

ছুটে গিয়ে সেই বাসে উঠে পড়ল। শুধু উঠে পড়া নয়। ওঠা মাত্রই বসার জায়গাও পেয়ে গেল ওরা। সে কী আনন্দ ওদের।

বাস শিলদা থেকে ছেড়ে এগিয়ে চলল বেলপাহাড়ির দিকে। বেলপাহাড়ি এখান থেকে খুব কাছে। হেঁটে যাওয়া যায়। বাসে মিনিট কুড়ি সময় লাগল। বেলপাহাড়িতে ওরা যেই না বাস থেকে নেমেছে, অমনই কোথা থেকে দানবাকৃতি লোকটা রক্তচক্ষু হয়ে একটা পাঁঠা কাটা দা নিয়ে ভয়ঙ্কর ক্রোধে ছুটে এল ওদের দিকে, "বাংখাম গুজুয়া। হর জয়েদ তেদো বাঙ দহমেয়া।" অর্থাৎ "তোরা মরবি। তোদের সহজে ছাড়ব না।"

তিন্নি, বিল্টু ও শুভঙ্কর ভয়ে আর্তনাদ করে ঢুকে পড়ল একটা হোটেলের মধ্যে। প্রচণ্ড ভয়ে কাঁপতে লাগল ওরা। পথিমধ্যে লোকজন যারা ছিল তারা সব হইহই করে উঠল। হঠাৎ দু'জন লোক পেছনদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওই লোকটার পায়ের খাঁজে সজোরে একটা লাথি মারতেই লোকটা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল রাস্তার ওপর।

হাতের দা-টা ছিটকে গিয়ে লাগল রাস্তার একটা মাইল পোস্টে। আর-একটু হলেই একটা ঘুমন্ত কুকুরের গায়ে গিয়ে লাগত সেটা। কুকুরটা চমকে উঠে ভয়ে চিৎকার করে লেজ গুটিয়ে পালাল সেখান থেকে।

একজন ছুটে গিয়ে দা-টা কুড়িয়ে নিল।

বাকি লোকরা সবাই মিলে সেই লোকটিকে ধরে ফেলেছে তখন। হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়ার ফলে লোকটির অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। সামনের দুটো দাঁত নড়ে গিয়ে ঠোঁট কেটে সে কী রক্ত। লোকটি তখন ধুলোয় শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ছে আর মুখ দিয়ে বিকট চিৎকার করছে।

বিল্টু, তিন্নি ও শুভঙ্কর যে হোটেলের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল, তার মালিক বললেন, "ভয় নেই তোমাদের। ও আর কিছু করবে না। এখন ওইরকম চিৎকার আর দাপাদাপি করবে কিছুক্ষণ। তারপর ঠিক হয়ে যাবে। তোমরা এবার যেতে পারো।"

শুভঙ্কর বলল, "তা যাচ্ছি। কিন্তু ও ওইভাবে আমাদের আক্রমণ করতে এল কেন?"

"লোকটা পাগল। তবে ওর হাতে ওই মারাত্মক জিনিসটা যে কীভাবে এল তা ভেবে পাচ্ছি না। নিশ্চয়ই কারও অন্যমনস্কতার সুযোগে ওটাকে ও চুরি করে এনেছে। যাই হোক, ব্যাপারটা দেখতে হচ্ছে।"

বিল্টু বলল, "কিছু লোক হঠাৎ উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে লোকটাকে ফেলে না দিলে ও তো কেটেই ফেলত আমাদের।"

"তা ফেলত। শুধুমাত্র ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছ তোমরা।"

ওরা আর সেখানে না থেকে সোজা রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল।

পাগলটাকে ঘিরে তখন স্থানীয় লোকেদের ভিড় জমাট বেঁধেছে। দারুণ কোলাহল শুরু হয়ে গেছে সেখানে। হবে নাই-বা কেন? আর-একটু হলেই তো মারাত্মক একটা হত্যাকাণ্ড ঘটে যেত প্রকাশ্য দিবালোকে। কী সাঙ্ঘাতিক দৃশ্যের সৃষ্টি হত।

ওরা তিনজনে এবার নির্ভয়ে সামনের দিকে কিছুটা এগিয়ে বাঁ দিকে মোড়ের

মাথায় বাঁক নিল। কাঁকড়াঝোরের যাত্রীরা এই পথ ধরে ভুলাভেদা, শিয়ারবিঁদার দিকে চলে যায়।

যাত্রাপথে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে-দেখতে শুভঙ্কর বলল, "বিল্টু! এই নাকি বেলপাহাড়ি,এরই এত নামডাক? ডি এফ ও-র বাংলোটায় দিকে তাকিয়ে দ্যাখ, ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে আছে। এই বেলপাহাড়ির কত নামডাক শুনেছিলুম। প্রকৃতিপ্রেমিক মানুষরা লালায়িত হয়ে ছুটে আসেন এখানে। কিন্তু কেন আসেন বল তো? কী আছে এখানে? না আছে টিলা, না আছে কোনও গাছপালা, মুঠোর মধ্যে ধরা যাবে এমন একটি হতশ্রী গ্রাম আর ধানখেত ছাড়া কিছুই তো নেই। বহুদূরে কিছু পাহাড়ের রেখা অবশ্য আছে।"

এক বৃদ্ধ একটি খোড়োঘরের মাটির দাওয়ায় বসে বোধ করি শুনতে পেলেন ওদের কথা। বললেন, "তোমরা কারা হে? কোথা থেকে আসছ?"

শুভঙ্কর বলল, "আমরা কলকাতার দিক থেকে আসছি।"

"কলকাতার দিক থেকে মানে?"

"মানে, হাওড়া থেকে আসছি। বাজে শিবপুর।"

"অ। তা কী ব্যাপারে একটু জানতে পারি কী?"

বিল্টু বলল, "ব্যাপার কিছুই নয় দাদু। আসলে আমরা শরৎকালের প্রকৃতি দেখব বলে শহর থেকে গ্রামে এসেছি। শুনেছি বেলপাহাড়ির সৌন্দর্য নাকি অপরিসীম। কিন্তু এখানে এসে এর কোনওরকম সৌন্দর্যই না দেখতে পেয়ে আমাদের মন ভরল না।"

তিন্নি বলল, "জানেন তো দাদু, আমাদের চোখে অনেক স্বপ্ন ছিল। কিন্তু এখানে এসে স্বপ্নের জাল ছিঁড়ে গেছে।"

শুভঙ্কর বলল, "সত্যিই তো। কী দেখতে এখানে আসে লোকে?"

বৃদ্ধ ওদের দাওয়ায় বসিয়ে বললেন, "আসত। কিন্তু এখন নেহাত মতিচ্ছন্ন না হলে এখানে কেউ আসে না। তোমরা যে-বেলপাহাড়ির গল্প শুনেছ, সে-বেলপাহাড়ি এখন আর নেই। তবে একসময় ছিল। আমার নাম রঙ্গলাল মাইতি। আমার বয়স এখন পঁচানব্বই বছর। আমাদের আদি বাস ছিল ফুলকুসমা।"

তিন্নি খুশি-খুশি মুখে বলল, "ফুলকুসমা! ভারী মিষ্টি নাম তো?"

"তোমার নাম কী মা?"

"আমার নাম তিন্নি। ভাল নাম নীলাঞ্জনা।"

"তবে! তুমিও কি মিষ্টি কম? তা ওই ফুলকুসমা হল গে বাঁকড়ো জেলায়। যেমন তুমি মিষ্টি, তেমনই ওই ফুলকুসমাও মিষ্টি। আসলে ফুলকুসমা একটি নদীর নাম। নদীর নামেই গ্রামের নাম। ঘন জঙ্গলে পূর্ণ এক শ্যামল উপত্যকায় সেই ছোট্ট মিষ্টি নদীটি তিরিতিরি বয়। তা বিশেষ কারণে সেইখান থেকে যখন আমরা বরাবরের জন্য এই বেলপাহাড়িতে চলে আসি, এর রূপই তখন আলাদা।"

শুভঙ্কর বলল, "আপনি কত বছর আগেকার কথা বলছেন?"

"তা ধরো না কেন, আমি বলছি আশি বছর আগেকার কথা। আমার বয়স তখন পনেরো। এই বেলপাহাড়িতে ছিল শাল-মহুয়ার বন। এক-একটা সেগুন

গাছের চেহারা দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যেত। সেইসব সেগুন গাছকে জড়িয়ে আবার বেড়ে উঠত বড়-বড় চিহড়লতার গাছ। আর ছিল অসংখ্য টিলা। কত যে ঝরনা ছিল সেইসব টিলা-পাহাড়ে, তার যেন লেখাজোখা নেই। জোছনা রাতে তারাভরা আকাশের নীচে সেইসব ঝরনায় হরিণরা যখন জল খেতে আসত দলে-দলে, আমাদের তখন আনন্দের আর শেষ থাকত না। আদিবাসীরা সারারাত ধরে ধামসা-মাদল বাজিয়ে গান করত। বাঁধনা পরবের দিন সারারাত নাচগান হত। তখনকার সেই জঙ্গল দেখলে বুক শুকিয়ে যেত, বুঝেছ ? আর সেই জঙ্গলময় তখন ঘুরে বেড়াত ভালুক আর চিতা বাঘের দল।"

তিন্নি বলল, "বলেন কী ! তার এই হাল ?"

"হ্যাঁ। সভ্যতা। আমরা সভ্য হচ্ছি না ? সভ্যতার অসুখে এখন সবকিছু ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। সেই অরণ্যকে আমরা নির্মূল করেছি। বন্যপ্রাণীদের নির্বিচারে হত্যা করেছি। সেইসব টিলা-পাহাড়কে কেটে খণ্ড-খণ্ড করে পিচ ঢেলে পাকা রাস্তা বানিয়েছি। কাজেই ঝরনা শুকিয়ে গেছে। প্রকৃতি শ্রীহীন হয়েছে। ট্রাকটর দিয়ে মাটি চষে চাষের জমি তৈরি করে ফসল ফলাচ্ছি। এটার অবশ্য প্রয়োজন ছিল। কিন্তু অরণ্য নিধনের কোনও প্রয়োজন ছিল না। অরণ্যভূমি না থাকলে যে নিত্যনতুন ধূমকেতু উঠবে প্রকৃতির বুকে, সে-বুদ্ধি তখন ছিল না কারও। কাজেই সারাদেশ এখন অনাবৃষ্টিতে কাঁদছে। খরায় জ্বলছে। কোথাও কোনও গাছ নেই। তৃণ নেই। ভাদ্রের গুমোটে পরান আইঢাই করছে। তা এই যখন অবস্থা, তখন এখানে এসে কী দেখবে বাবা তোমরা ? এই যে ধরো না কেন, এমন একটা শরৎকাল এল, কখন যে শিউলি ফুটল, সে-ফুল কার উঠোনে ঝরল, সে-খবর কে রাখে ? সারা বেলপাহাড়িতে কারও ঘরে এখন একটা শিউলি গাছ আছে কিনা সন্দেহ। ওই দ্যাখো, পুকুর আছে মাছ নেই। দিঘিতে শালুক-পদ্ম নেই। গাছ নেই, তাই গাছের ডালে পেখম মেলে ময়ূর নাচে না। রাখালিয়া বাঁশির সুরে উন্মনা হয় না কেউ। রাখাল বালকের হাতে এখন ট্রানজিস্টর। তাতে 'হাওয়া-হাওয়া' গান। এক নতুন যুগের হাওয়ায় সব কিছু যেন উলটেপালটে গেছে ভাই।"

বৃদ্ধের কথা শুনতে-শুনতে অবাক হয়ে গেল সকলে।

বৃদ্ধ আক্ষেপ করে বললেন, "কয়েক বছর আগেও যেটুকু গাছপালা ছিল, এখন আর তাও নেই। আর দু' বছর বাদে আমাদেরই হয়তো দু'গাছা দূর্বা ঘাস কিনতে তোমাদের কলকাতায় ছুটতে হবে।" তারপর একটু থেমে বললেন, "এই সেদিন আমাদের হাসপাতালের কম্পাউন্ডোর প্রাণকেষ্ট পণ্ডিত বললেন, খবরের কাগজে নাকি দিয়েছে পাহাড়-জঙ্গল কেটে এখন কলকাতার ফুটপাতে গাছ লাগাবার ধুম পড়ে গেছে। এটা কি সত্যি ?"

বিল্টু, তিন্নি, শুভঙ্কর হাসল। বলল, "সত্যি। তা দাদু, এই অরণ্য নিধনে আপনি খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন মনে হচ্ছে, তাই না ?"

"হব না ? সেই বেলপাহাড়ির এই পরিণতি কি দেখা যায় ? দরকার নেই আধুনিকতার। সেই অরণ্যকে তোমরা আবার ফিরিয়ে দাও। এইসব দেখেশুনে আর আমার বাঁচতে ইচ্ছে করে না। এবার মরাই ভাল। এখানকার সব কিছুই এখন বিষিয়ে গেছে। মানুষজন, জলহাওয়া, সব, সব বিষিয়ে গেছে।"

pathagar.net

শুভঙ্কর বলল, "আমরা এখানে এসে একেবারেই হতাশ হলাম।"

বৃদ্ধ বললেন, "এসেওছ তো ভুল সময়ে। এই ভাদ্রের চড়া রোদে ঘুরবে কী করে? সর্দিগর্মি হয়ে যাবে যে। না হলে তোমাদের বলতাম আরও একটু এগিয়ে যেতে। কয়েক মাইল যদি হাঁটতে পারতে তা হলে আমি তোমাদের এমন একটা জায়গায় পাঠাতাম, যেখানে গেলে মনপ্রাণ ভরে উঠত। পাহাড়ের-পর-পাহাড় আর গভীর জঙ্গল যদি দেখতে চাও, সেইখানে চলে যাও। কিন্তু এই সময়ে সেখানে যাওয়াটা কোনওমতেই উচিত হবে না। একবার বরং শীতকাল দেখে এসো, তখন যেও। এখন তোমরা ঝাড়গ্রামে ফিরে গিয়ে হাটবাজার দেখো, রাজবাড়ি দেখো।"

বিল্টু বলল, "সে তো দেখবই। কিন্তু দাদু, এতদূর এসে রোদ্দুরের ভয়ে ফিরে যাব? একজন আমাদের বলল, এইখানে কোথায় ঠাকরুনপাহাড়ি আছে তাই দেখতে। সেইজন্যই যাচ্ছিলাম আমরা।"

"তাই বলো। কিন্তু ঠাকরুনপাহাড়ি নেহাত কাছেপিঠে নয়। অনেকদূর। আমি তো ওইখানকার কথাই বলতে যাচ্ছিলাম তোমাদের। তবে তোমরা যদি নেহাতই যাও তা হলে অতদূরে যেতে হবে না। তার আগেই তোমরা পাহাড়-জঙ্গলের দেখা পাবে। কী ভাগ্যিস, ওইদিককার অরণ্য নিধনের কথাটা মনে হয়নি কারও, তাই এখনও অরণ্যের স্বাদ ওখানে গেলে পাবে। তবে আমি যে-জঙ্গল দেখেছি সে-জঙ্গল এখন আর নেই। তবু জঙ্গল ওখানে আছে। পাহাড়ও আছে। সেইসব প্রাচীন মহীরুহ না থাকলেও যা আছে তা নতুন প্রজন্মের।"

বিল্টু, তিন্নি, শুভঙ্কর বলল, "আমরা যাব। আপনি আমাদের পথ চিনিয়ে দিন।"

"এই রোদে সত্যিই যাবে তোমরা?"

"হ্যাঁ।"

"তোমাদের কপালে দেখছি নেহাতই দুর্ভোগ আছে। ওই অঞ্চলের দূর-দূর গ্রামের লোকেদের যাতায়াতের জন্য দু-একটা বাসও আছে। তবে কিনা রাস্তা মেরামতির জন্য সে-বাস এখন দিনকতকের মতো বন্ধ। সাইকেল রিকশও যায়। কিন্তু তারও ওই একই অবস্থা। এখন তোমাদের এখানে যেতে হলে পায়ে হেঁটে যাওয়া ছাড়া কোনও উপায়ই নেই। বুঝে দ্যাখো, এবার কী করবে।"

"আমরা যাবই।"

"বেশ, তা হলে যাও। বেলপাহাড়ি দেখতে যারা আসে তারাও জিপ-টিপ নিয়ে বা সাইকেল রিকশয় ওইদিকেই যায়। ওইদিকে বদাডিহি বলে একটা গ্রাম আছে, সেই পর্যন্তই যায় সব। ঠাকরুনপাহাড়িতে খুব কম লোকই যায়।"

"কেন?"

"জানে না বলে। তা ছাড়া বদাডিহিই যখন পাহাড়-জঙ্গলের স্বাদে মন ভরায় তখন কে আর যায় অতদূর। আসলে এখন বেলপাহাড়ি মানে ওকে কেন্দ্র করে ওইসব জায়গা। যাক, কথায়-কথায় অনেক দেরি হয়ে গেল। তোমরা যদি যেতে চাও তা হলে এইবেলা চলে যাও। এই সোজাপথ ধরে খানিক এগোলেই দেখবে একটা মোরাম বিছানো পথ বাঁ দিকে বেঁকেছে। সেই পথ ধরে

কোনওদিকে না বেঁকে সোজা এগোলেই পেয়ে যাবে বদাডিহি গ্রাম।"

"কিন্তু ঠাকরুনপাহাড়ি ?"

"বদাডিহি থেকে ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আবার বাঁ দিকে বেঁকে বেশ কিছু উঁচু-নিচু জায়গা পার হয়ে একটা পাহাড় ডিঙিয়ে ছোট্ট একটি গাঁও দেহাত। সেইটাই ঠাকরুনপাহাড়ি। তবে দরকার নেই তোমাদের অতদূরে যাওয়ার। তোমরা বদাডিহিই যাও।"

"আপনি তা হলে ঠাকরুনপাহাড়ি যেতে আমাদের মানা করছেন ?"

"মানা করছি এই কারণে যে, তোমাদের তা হলে কষ্টের শেষ থাকবে না। এই রোদে বদাডিহি যেতেই দম ছুটে যাবে। আমার তো মনে হচ্ছে মুখ দিয়ে রক্ত না উঠে যায়। কেননা শুধু গেলেই তো হল না। আবার ফিরেও তো আসতে হবে।"

তিন্নি বলল, "আমরা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করব। বেশি কষ্ট হলে কাছাকাছি দু-একটা পাহাড় দেখেই ফিরে আসব আমরা। তবে দাদু, আমাদের ফিরতে যদি রাত হয় আমরা কিন্তু আপনার এখানেই এসে উঠব।"

"এ তো খুব ভাল কথা। এই এতবড় দাওয়াটা রয়েছে। মাদুর পেতে দেব। শুয়ে-বসে গড়াবে। আমার ঘরে গুড়-মুড়ির অভাবটা হবে না। খাও না কত খাবে ?"

তিন্নি বলল, "এবার আপনাকে আর-একটা কথা জিজ্ঞেস করি। এই যে আমরা যাব, পথে কোনও বিপদ-আপদের ভয় নেই তো ? মানে দিনকাল এখন যা পড়েছে তাতে···।"

"না না। ভয় কিসের। তবে রাত দুপুরে দু-একটা ছিচকে চোর-ডাকাতের ভয় হতে পারে, কিন্তু দিনমানে কোনও ভয়ই নেই।"

বিল্টু বলল, "বেলপাহাড়ির বাসে কে যেন একজন বলছিল ঠাকরুনপাহাড়িতে নাকি যতসব চোর-ডাকাতের আড্ডা।"

"মিথ্যে কথা বলেছে। ওইসব অঞ্চল হচ্ছে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকা। অযথা ওদের নামে ওইসব কলঙ্ক রটানো ঠিক নয়। তোমরা তো কখনও মেশোনি ওদের সঙ্গে। তাই জানো না। ওদের মতন সহজ-সরল মানুষ হয় না।"

তিন্নি, বিল্টু আর শুভঙ্কর রঙ্গলাল মাইতির কাছ থেকে বিদায় নিল। এখন ওদের একটাই মাত্র উদ্দেশ্য। যেন-তেন-প্রকারেন মউটাকে খুঁজে উদ্ধার করা। আসল সত্যটা বুড়োর কাছে গোপন করে ছলে-বলে-কৌশলে ওরা অনেক কথাই জেনে নিয়েছে। তবে এটা ঠিক, ওরা বেশ ভালভাবেই বুঝতে পেরেছে আপাতত এ-পথে ভয়ের কোনও আশঙ্কা নেই।

pathagar.net

॥ ১২ ॥

ওরা বৃদ্ধ রঙ্গলাল মাইতির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁরই নির্দেশিত পথ ধরে রওনা হল। সামান্য কিছুটা পথ যাওয়ার পর একটা চেকপোস্টের কাছে এল ওরা। এখানে কয়েকজন হোমগার্ড ও পুলিশকে বসে থাকতে দেখল। এখন পুলিশ দেখলেই ওদের ভয় করে। কেননা কোনওরকমে একবার যদি ওরা ধরা পড়ে তা হলে সমস্ত পরিকল্পনাটাই বানচাল হয়ে যাবে। পুলিশ এখন হন্যে হয়ে খুঁজছে ওদের। কাজেই খুব সহজে ধরা পড়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই ওরা পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে হেসে গড়িয়ে এমনভাবে কথা বলতে-বলতে চলল যে, সবাই মনে করল ওরা এখানকারই স্থানীয় ছেলেমেয়ে।

চেকপোস্টের বাঁ দিকে সেই লাল মাটির মোরাম বিছানো রাস্তা। এই পথ যেন ওদের কত পরিচিত। তাই কাউকে কিছু না জিজ্ঞেস করে সেই পথ ধরেই চলল ওরা। এখান থেকে কাছে-দূরে-বহুদূরে শুধু পাহাড় আর পাহাড়ের সারি ওরা দেখতে পেল। এই পাহাড়-জঙ্গলের দেশে মউটা এখন কোথায় কীভাবে আছে তা কে জানে ? ওকে উদ্ধার করতেই হবে। সোনার গণপতি তো হাতের মুঠোয়। নাগালের বাইরে শুধু মউ। মউকে ফিরে পেলেই শুরু করবে ওরা দুর্গম পথে, দুরূহ পথে যাত্রা।

খানিক যাওয়ার পর ওরা দেখল প্রকৃতি যেন এখানে হঠাৎ একটা অন্যরকম চেহারায় রূপ নিতে চাইছে। কী সুন্দর সেই রূপ। লাল মাটির এই দীর্ঘ পথ কতদূর পর্যন্ত গেছে তা কে জানে ? যেতে-যেতে এক জায়গায় ওরা দেখল কিছু আদিবাসী মেয়ে-পুরুষ সেই মাঠফাটা রোদে ঘর্মাক্ত কলেবরে উঁচু বাঁধের মতো রাস্তা মেরামতের কাজে লেগে পড়েছে।

অভিযানের উত্তেজনায় মন উত্তেজিত হলেও প্রকৃতির সৌন্দর্যও মনকে উদাস করে দেয়। শুভঙ্করও তাই প্রকৃতির এই শ্যামলিমায় বিভোর হয়ে বলল, "যদি আমাদের অভিযান সার্থক হয় তা হলে আবার আমরা একবার শীতকাল দেখে এখানে আসব। বেলপাহাড়িতে ওই রঙ্গলাল বুড়োর আশ্রয়ে থেকে এই জায়গাগুলো ঘুরে-ঘুরে দেখব। আমার তো মনে হয় এখানে এলে আর কাশ্মির যাওয়ার দরকার হবে না।"

তিন্নি বলল, "সত্যিই জায়গাটা মনোরম। তাই না শুভদা ? আমাদের ঘাটশিলাতেও পাহাড় আছে। ধারাগিরিতে ঝরনা, পাহাড় আছে। কিন্তু এর পটভূমি বড়ই চমৎকার। কত তফাত দুটো পরিবেশের মধ্যে।"

ওরা কথা বলতে-বলতেই প্রচণ্ড উদ্যমে পথ চলছিল। কষ্টও হচ্ছিল খুব। রোদ যা চড়েছে তাতে সারা গায়ে দর-দর করে ঘাম ঝরছে। ওরা বেশ কিছুক্ষণ হাঁটার পর এক জায়গায় একটি গ্রামে লাল মাটির নিকনো কয়েকটি ঘর দেখতে পেল। খোড়ো চালার সেই ঘরের দাওয়ায় আদিবাসীরা দলবদ্ধ হয়ে বসে আছে। ওরা শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে ঘর্মাক্ত কলেবরে তাদেরই এক-একজনের দাওয়ায় গিয়ে ধুপধাপ বসে পড়ল।

বিল্টু আর শুভঙ্কর ঝিমোতে লাগল।

pathagar.net

তিন্নি বলল, "তোমরা কেউ আমাকে এক গ্লাস জল দিতে পারো ?"

একজন বলল, "জমঞর।" অর্থাৎ হ্যাঁ। বলেই এক গ্লাস জল এনে দিল।

একটি বউ কাকে যেন বলল, "সেঁড়াঃ ওড়া রিনি গিদড়ে।" অর্থাৎ এরা সব শহরের ছেলেমেয়ে।

ওদেরই ভেতর থেকে একজন মধ্যবয়সী যুবক এগিয়ে এসে বলল, "এই এত রোদে এদিকে কোথায় যাবে তোমরা ?"

শুভঙ্কর বলল, "আমরা ঠাকরুনপাহাড়ি যাব।"

"কে আছে সেখানে ?"

"কেউ নেই। এমনই বেড়াতে যাচ্ছি।"

"সে তো অনেক দূর এখান থেকে। তা ধরো না কেন, সাত-আট মাইল তো হবেই। রোদে আলা হয়ে যাবে তোমরা।"

"তা যাব। তবে আমরা শহরে থাকি তো। কখনও পাহাড়-পর্বত দেখিনি। তাই যাচ্ছি একটু পাহাড় দেখতে।"

আদিবাসী রমণীরা বেশ সহানুভূতির সঙ্গেই বলল, "আহা। শহরের ছেলে। সত্যিই তো, পাহাড় তো দেখেনি। যাও বাছা, যাও। যদি হাঁটতে পারো তো যাও। কী সুন্দর ছেলেমেয়ে গো সব।"

তিন্নি বলল, "ওখানে কোনও চোর-ডাকাতের ভয় নেই ?"

"বাব্বা। তা আবার নেই ? তবে ওরা যে যা করে সবই বাইরে। এখানে কিছু করে না। এখানে করবেই বা কোথায় ? কার কী আছে যে নেবে ? তা ছাড়া তোমরা ছেলেমানুষ। তোমাদের কেউ কিছু বলবে না।"

আর-একজন বলল, "দিনের বেলা কোনও ভয় নেই। ওদিকে অনেক গ্রামও আছে। লোকজন আছে। যাও।"

শুভঙ্কর জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের এই গ্রামের নাম কী ?"

"জামবনি। ওই ওদিকে হল কাদাপুড়া। অনেক ছোট-ছোট গ্রাম আছে এদিকে। কত নাম বলব ?"

ওরা আবার ওদের চলা শুরু করল। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর দু'পাশের পাহাড়মালা যেন সারিবদ্ধ হয়ে আরও কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। চারদিকে গাছপালা জঙ্গলের রূপ নিতে লাগল। আর তেমনই নির্জনতা ওদের অবাধ বিচরণে আতঙ্কময় হয়ে উঠল। মাঝেমধ্যে দু-একটা আদিবাসী গ্রাম এল আর মিলিয়ে গেল। শুধু বন, পাহাড় আর পাখির ডাক।

এইভাবে অনেকদূর যাওয়ার পর ওরা এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছল, সেখানে পাহাড় এবং বনভূমি স্বপ্নময় হয়ে ধরা দিল ওদের চোখে। সে কী রূপ। ঘরের কাছেই যে এইরকম অনাবিল আনন্দ এবং নয়নমনোহর সৌন্দর্য তার ডালি সাজিয়ে রেখেছে তা কে জানত ? সেই পাহাড় এবং জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় রাস্তার ধারে বাঁ দিকে খোড়ো চালের ছোট্ট একটি চায়ের দোকান ওদের নজরে পড়ল।

বিল্টু, তিন্নি, শুভঙ্কর সেখানে গিয়ে দোকানের বেঞ্চিতে ধপ করে বসে পড়ে হাঁফাতে লাগল। রোদের তাতে এবং এই দীর্ঘ পথশ্রমে তখন ঘেমে-নেয়ে গেছে ওরা।

pathagar.net

শুভঙ্কর বলল, "আমাদের তিন কাপ চা খাওয়াবে ভাই ?"

দোকানদার বলল, "খাওয়াব বইকী। নিশ্চয়ই খাওয়াব। সেইজন্যই তো দোকান খুলে বসে আছি। আমি তো দেখলুম তোমরা এলে, বসলে। আগে একটু বসে জিরোও, ঠাণ্ডা হও, জল খাও, তবে তো। মুড়ি, তেলেভাজা কিছু লাগবে ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ। যা আছে নিয়ে এসো। পেটের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে এখন। কখন থেকে হাঁটছি।"

ওরা প্রথমেই এক গ্লাস করে জল খেয়ে হাঁফ ছাড়ল। তারপর মুড়ি আর তেলেভাজা খেয়ে গরম চায়ে চুমুক দিল তৃপ্তি করে।

দোকানদার বলল, "তোমরা এদিকে কোথায় যাবে ?"

শুভঙ্কর বলল, "আমরা যাব ঠাকরুনপাহাড়ি।"

"কাদের বাড়ি ?"

"কারও বাড়ি নয়। এমনই বেড়াতে।"

"বেড়াতে ! মাথা খারাপ নাকি ! এই বনে-জঙ্গলে কোথায় বেড়াবে ?"

"আমরা বন-জঙ্গল দেখতে এসেছি। তাই বনে-জঙ্গলেই বেড়াব। পাহাড়ে উঠব। ঠাকরুনপাহাড়ি এখান থেকে কতদূর ?

"তা দূর আছে বইকী। এই দোকানের পাশ দিয়েই যে সরু রাস্তাটা গভীর জঙ্গলের দিকে ঢুকে গেছে ওই পথেই ঠাকরুনপাহাড়ি। কিন্তু ওখানে কেউ শখ করে বেড়াতে যায় না। তাও এই অসময়ে।"

"আমরা যাব।"

"এসেছ যখন, যাও। তবে কী আর আছে দেখার ? একটা পাথরের খনি ছিল, সেটাও কবে থেকে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে।"

শুভঙ্কর বলল, "এটাই কি তা হলে বদাডিহি গ্রাম ?"

"হ্যাঁ, এইটাই বদাডিহি। কী করে জানলে ?"

"বেলপাহাড়ির এক ভদ্রলোক আমাদের বলে দিয়েছিলেন। তাঁর মুখেই শুনেছিলাম বদাডিহি থেকেই ঠাকরুনপাহাড়ির রাস্তা।"

দোকানদার বলল, "যাই হোক তোমরা যখন এসেছ পাহাড়-জঙ্গল দেখবে বলে, তখন ওই চাতন পাহাড়টায় একবার উঠে এসো।"

শুভঙ্কর বলল, "ও-পাহাড়ে উঠব কী করে ? যা জঙ্গল। পথ কই ?"

"আসলে তোমরা বর্ষার পর এসেছ তো। চারদিকে আগাছার বন গজিয়ে গেছে। তা চলো, এখন এই এত বেলায় খদ্দের-পত্তর তো নেই। বাসও বন্ধ। আমিই তোমাদের সঙ্গে করে পাহাড়ে উঠিয়ে আনছি।" বলে ওদের কাছ থেকে দাম নিয়ে দোকানঘরে তালা লাগিয়ে বলল, "এসো।"

ওরা সানন্দে ওর পিছু নিল। বিশেষ করে শুভঙ্কর তো খুব খুশি। ওর খুশির যেন অন্ত নেই। তার কারণ এই প্রথম ওর পাহাড় দেখা বা পাহাড়ে ওঠা। ওরা যে কাজের জন্য এখানে এসেছে ক্ষণ মুহূর্তে তাও যেন ভুলে গেল। যেতে-যেতে শুভঙ্করই বলল, "আপনার নামটি কী ?"

"আমার নাম গুইরাম মাহাতো।"

"আর এই পাহাড়টার ?"

pathagar.net

"এই তো একটু আগেই বললুম, চাতন পাহাড়। এই রোদে হেঁটে এতদূরে কষ্ট করে এসেছ তাই তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। আমিও প্রায় বছর দুই উঠিনি এখানে।"

বিল্টু বলল, "যা বন হয়েছে তাতে আপনি না থাকলে উঠতুমই না আমরা।"

"এই রোদ্দুরে হেঁটে আসতে কষ্ট হয়েছে তো খুব তোমাদের?"

"তা একটু হয়েছে বইকী।"

"শীতকাল হলে এরকমটি হত না। এবার কখনও এলে তোমাদের আরও বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আসবে। আসবার আগে আমাকে একটা চিঠি লিখে দেবে। আমি তোমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দেব। তখন সারাদিন ধরে টো-টো করে ঘুরবে।" বলতে-বলতেই একটা গাছের ডাল ভেঙে লাঠি তৈরি করে জঙ্গল ঠেলে ওদের নিয়ে পাহাড়ে উঠতে লাগল গুইরাম।

এদের তো পাহাড়ে ওঠা অভ্যাস নেই। তাই খানিক ওঠার পরই যেন হাঁফ ধরে গেল বুকে। তবু উঠতে লাগল। এইভাবে সময় নষ্ট করার কোনও ইচ্ছেই ওদের ছিল না যদিও, তবুও পাহাড়ে ওঠার দুর্নিবার আকর্ষণ ওরা ছাড়তে পারল না। তা ছাড়া সবচেয়ে বড় কথা যেটা, সেটা হল এই অচেনা এবং অজানার মাঝে সহজ-সরলভাবে কোনও মানুষের সঙ্গে মিশে যাওয়ার সুযোগটাকেও ছাড়তে পারল না।

ওরা পাহাড়ের অনেকটা ওপরে ওঠার পরই ছোট্ট একটি গুহা দেখতে পেল।

গুইরাম বলল, "এই একটা গুহায় ভালুক থাকে।"

"তাই নাকি? এখনও আছে?"

"থাকতে পারে। তোমরা কথা না বলে পা টিপেটিপে চুপিচুপি এসো। ওই ভালুকটার জন্যই তো এই লাঠিটা ভেঙে নিলুম। যদি বেরিয়ে আসে তো লাঠিটাই আগে ধরিয়ে দেব।"

ওরা সভয়ে পা টিপেটিপে একদম কথা না বলে ওপরে উঠতে লাগল। এ এক দারুণ অভিজ্ঞতা।

আর খানিক ওঠার পর আর-একটি গুহাকৃতি ফাটল দেখিয়ে গুইরাম বলল, "এই যে দেখছ, এখানে অনেক সাজা পাখির বাসা।"

শুভঙ্কর বলল, "সাজা পাখি কী?"

"ও মা! সাজা পাখি জানো না? ওরা সাধারণত সন্ধের পর বের হয়। ওদের পালকে ছুঁচের মতো কাঁটা থাকে। ওই কাঁটা গায়ে বেঁধালে আর রক্ষে নেই।"

বিল্টু বলল, "বুঝেছি। তুমি শজারুর কথা বলছ।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। শজারু। তোমরা যাকে শজারু বলো, আমরা তাকেই সাজা পাখি বলি। এর কাঁটা দিয়ে আমাদের মেয়েরা উল বোনে।"

কথা বলতে-বলতে এবারে ওরা একেবারে পাহাড়ের চুড়োয় উঠে এল। এখান থেকে চারদিকের পার্বত্য প্রকৃতির যে-দৃশ্য ওরা দেখল, তাতে মন ভরে গেল ওদের। পাহাড় তো নয়। যেন মহাসমুদ্রের উন্মত্ত ঢেউ তিষ্ঠ বলে থামিয়ে দিয়েছে কেউ।

গুইরাম বলল, "ওই দ্যাখো, ওই হচ্ছে চিতি পাহাড়, ওই কুঁড়োল। আর ওধারের ওই যে পাহাড়গুলো দেখছ, ওগুলো হচ্ছে ড্রোং-শ্রেণী।" বলে এক

pathagar.net

জায়গায় অল্প সমতলে একটি বিবর্ণ লাল পতাকার সামনে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল গুইরাম।

শুভঙ্কর বলল, "এখানে কোনও দেবতা আছে বুঝি ?"

গুইরাম হেসে বলল, "দেবতা কোথায় নেই বাবা ? আসলে বছর দুই আগে একবার আমি একটু আনন্দ করে চাঁদা-টাঁদা তুলে এখানে চব্বিশ প্রহরার হরিসভা বসিয়েছিলাম। তা ইচ্ছে ছিল বছর-বছরই হরিসভাটা দেব। কিন্তু এইসব জায়গায় গরীব দুঃখী অনুৎসাহী লোকেদের কাছ থেকে চাঁদা তোলাটা যে কী কেলেঙ্কারির ব্যাপার তা বলে বোঝানো যাবে না। এ ছাড়াও হরিসভার দিন কিছু লোক এমন একটা গণ্ডগোল পাকালে যে, বাধ্য হয়েই পরের বছর থেকে বন্ধ করে দিলুম। আমার একার পক্ষে তো ওই ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব নয়।"

শুভঙ্কর বলল, "সে তো বটেই। এসব কাজ একার দ্বারা হয় না।"

গুইরাম বলল, "আসলে ব্যাপার কী জানো, ইদানীং মানুষজনও সব অন্যরকম হয়ে গেছে। ভাল লোকের চেয়ে বদ লোকে ছেয়ে গেছে চারদিক। ভাল কথা বললে মন্দ হয়ে যায়। কথায়-কথায় খেপে ওঠে।"

"কেন, এরকম হল কেন ?"

"সে তোমরা ছোট ছেলে বাবা। তোমাদের আর কত বোঝাব ? ওসব তোমরা বুঝবে না।। আমরা মুখ্যুসুখ্যু মানুষ। কিন্তু সহজ-সরল মানুষ আমরা। তবে এখন কী জানো, আমাদের ভেতরেও বিষ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের কথা চিন্তা করার কেউ নেই। নেতাবাবুরা ভোটের আগে একবার করে আসেন। মঞ্চে উঠে ঝর-ঝর করে কাঁদেন। এমন ভান দেখান, যেন তাঁদের ঘরের বউ-ছেলের চেয়েও আমরাই বেশি আপন। সবই আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু বুঝেই বা করবটা কী ? দিকে-দিকে অরণ্যের নিধন হয় আর আমরা উৎখাত হই। আমরা বাস্তুহারা হতে-হতে আজ এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছি যে, আমাদের থাকার মতো কোনও জায়গা নেই। মাছ যেমন জল ছাড়া বাঁচে না, আমরাও তেমনই অরণ্য ছাড়া বাঁচতে পারি না। আমরা যে অরণ্যেরই সন্তান। আমাদের সেই অরণ্যটুকুও আজ কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। অবশ্য অরণ্যের নিধন আমরাও যে করছি না তা নয়। পেটে টান পড়লেই গাছপালা কেটে বেচে দিচ্ছি। কেউ-কেউ তো চোরা পথে রীতিমত ব্যবসাই শুরু করে দিয়েছে। যাক আমাদের এইসব দুঃখের কথা তোমরা বুঝবে না। তা এইরকম নানাবিধ কারণেই হরিসভাটা বন্ধ হয়ে গেল ! আবার যদি কখনও ঠাকুরের ইচ্ছে হয় তো হবে।"

তিন্নি বলল, "তোমাদের এখানে লোকজন তা হলে এখন আর আগের মতো নেই।"

"ওই তো বললাম দিদিভাই। বদ লোকে একেবারে দেশটা ছেয়ে গেছে। আগে আমরা কত ভাল ছিলুম। বিশ্বাসী ছিলুম। এখন সব বিষিয়ে গেছি। এখন লোকের জিনিস কেড়ে খেতে শিখে গেছি।"

তিন্নি বলল, "আচ্ছা গুইরামদা, শুনেছিলুম তোমাদের এখানে নাকি কে একজন কুখ্যাত ডাকাত আছে, জঙ্গল-শের না কী যেন নাম ?"

গুইরাম হেসে বলল, "ডাকাত ! হাঃ হাঃ। সেদিনের ছোকরা তীর-কাঁড়

pathagar.net

ফেলে বন্দুক ধরেছে। রিভলভার হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তা ওইসব ফুটুনি বাইরে করবে ও, এখানে নয়। বন্দুক ফেলে শুধু হাতে একবার এসে আমার সামনে দাঁড়াক না ও, এক ঝটকায় ওকে চিত করে দেব আমি। অবশ্য বন্দুক-রিভলভার হাতে নিলেও আমাকে ও দারুণ ভয় করে। আমি ওকে হুঁশিয়ার করে বলেছি, তোমার জন্য যেন আমাদের বদনাম না হয়। এই জঙ্গলমহলে কোনওরকম দৌরাত্ম্য চলবে না তোমার। বরং এইখানে যেন কোনও অন্যায় বা অবিচার না ঘটে, সেইদিকে লক্ষ রাখবে। বাইরে তুমি যা ইচ্ছে করো।"

"এখানে তা হলে ও কোনও উপদ্রব করে না?"

"না। তা ছাড়া এখানে ও থাকেই বা কতক্ষণ? কখন আসে কখন যায়, তা টেরও পায় না কেউ। পুলিশের তাড়াতুড়ি খেলে বা চুরি-ডাকাতি করে কিছু পেলে কোনও গুহা-টুহায় লুকিয়ে রাখে। দু-চারদিন থাকে। আবার পালায়। তবে ইদানীং ও একটু বেশি বেপরোয়া হচ্ছে।"

"কীরকম?"

"ওকে ঘিরে কিছু বদ লোকের আনাগোনা এখানে দেখতে পাচ্ছি। কিছুদিন দেখব। তারপর ওর ঘরদোর জ্বালিয়ে দিয়ে মেরে তাড়াব ওকে। ইতিমধ্যে এইখানকারই দু-একটা বদ ছেলেকে টাকাপয়সা দিয়ে হাত করে দলে নিয়েছে ওর।"

তিন্নি হঠাৎই গুইরামকে জড়িয়ে ধরে বলল, "দাদা! আপনি আমাদের দারুণ একটা বিপদ থেকে রক্ষে করুন। আমাদের এই বিপদে একমাত্র আপনি ছাড়া আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না। আমি আপনার ছোট বোন। আর এরা আপনার ভাই। সেই ভেবে আপনি আমাদের সাহায্য করুন।"

গুইরাম বিস্মিত হয়ে বলল, "তোমাদের সাহায্য করব! কিসের বিপদ! সব কথা খুলে বলো আমাকে। যদি আমার সাধ্যের মধ্যে হয় তা হলে নিশ্চয়ই করব।"

শুভঙ্কর বলল, "এতক্ষণ যার কথা হল, অর্থাৎ ওই জঙ্গল-শের। আমরা ওর ব্যাপারেই কিছু বলতে চাই।"

"বলো তো কী ব্যাপার!"

"ওই জঙ্গল-শের আমাকে মেরে ফেলবার জন্য লাথি মেরে চিলকিগড়ের কাছে ডুলুং নদীতে ফেলে দেয়। আর আমার সঙ্গে আমাদেরই দলের একটি মেয়ে ছিল। তাকে সে নিয়ে পালায়।"

বিল্টু আর তিন্নি বলল, "আমরা তারই খোঁজে এখানে এসেছি দাদা। শুনেছি ও নাকি ঠাকরুনপাহাড়ির জঙ্গলে থাকে।"

সেই মুহূর্তে গুইরামের মুখের অবস্থা দেখলে শয়তানও ভয় পেত। শুধু এরাই যা দারুণ উত্তেজনার মধ্যে ছিল বলে পেল না।

গুইরাম বলল, "এ-কথা তোমরা আমাকে এতক্ষণ বলনি কেন? ও যদি এখানে থাকে আর আমার সঙ্গে দেখা হয় তা হলে মা-বঙ্কিণীর দিব্যি, ওর জিভটাকে আমি টেনে বের করে নিয়ে আসব। আমার রাগ জানো না তোমরা। শুধু আমি নই, এখানকার অনেক লোকই এখন রেগে আছে ওর ওপর। ওর জন্য এই ঠাকরুনপাহাড়ির বদনাম হয়ে যাচ্ছে। তুমি শের হচ্ছ। হও গে যাও।

pathagar.net

কিন্তু তোমার দুর্নামের ভাগীদার আমরা হব কেন ?

বিল্টু আর তিন্নি বলল, "আমরা অনেক আশা এবং বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এখানে এসেছি। কিছুই চিনি না, জানি না। তবু এসেছি যদি কারও সাহায্য নিয়ে কোনওরকমে মেয়েটাকে উদ্ধার করতে পারি।"

শুভঙ্কর বলল, "শুধু জঙ্গল-শের নয়, এখানে আমাদের আর-এক শত্রুও এসে জুটেছে এখন। আমরা তারও দুর্দশা দেখতে চাই।"

গুইরাম বলল, "বুঝেছি। তোমরা নিশ্চয়ই শিকারিবাজের কথা বলছ।"

"হ্যাঁ। ঠিক ধরেছ তুমি।"

"এই দুই শয়তানে এই আরণ্যক পরিবেশকে বিষিয়ে তুলেছে। বেশ কিছুদিন ধরেই আমার কানে আসছিল তোমাদের ওই জঙ্গল-শের, মানে আমাদের বুনো, লোকের বউ-ছেলে-মেয়ে চুরি করে এনে জঙ্গলে লুকিয়ে রাখছে। তারপর সুযোগ-সুবিধে মতো বিদেশী লোকদের হাতে বিক্রি করে দিচ্ছে। এখন তোমাদের কথায় সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু শিকারিবাজকে তোমরা চিনলে কী করে ? সে তোমাদের কী করল ?"

ওরা তখন সব কথাই খুলে বলল গুইরামকে। শশিমাস্টারকে হত্যা করা থেকে বিল্টু-তিন্নিকে গুম করার ঘটনা পর্যন্ত সব বলল। বলল না শুধু সোনার গণপতির কথা।

গুইরাম বলল, "তোমাদের মেয়েটাকে যদি ওরা ধরে এনে এখানেই রেখে থাকে আর তাকে যদি ইতিমধ্যে পাচার না করে থাকে, তা হলে যেভাবেই হোক, আমি তাকে ফিরিয়ে আনব। তবে তোমরা কিন্তু বোকার মতো মারাত্মক একটা ভুল করতে যাচ্ছিলে। এইভাবে ওই জঙ্গলে ঢুকতে গেলে ওর লোকেরা যে তোমাদের চিনে ফেলবে বা ধরে নিয়ে যাবে এটা তোমাদের মাথায় এল না ?"

শুভঙ্কর বলল, "আমরা জানতাম অঘটন একটা কিছু ঘটতে পারে। তবুও এসেছিলাম ভগবানকে ভরসা করে। তাই তো তোমাকে পেয়ে গেলাম।"

"ভাগ্যে তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল !"

বিল্টু বলল, "কিন্তু আমরা যে সকলের মুখেই শুনলাম দিনমানে এখানে কোনও ভয় নেই ?"

"তা নেই। তবে কি না সেটা হচ্ছে অন্যের বেলায়। তোমাদের বেলায় নয়। তোমরা তো ওদেরই লক্ষ্য। ওদের শিকার। আর তোমরাই কিনা এইভাবে নিজের থেকে যাচ্ছিলে ওদের হাঁ মুখে ধরা দিতে ? সাহস তো কম নয় তোমাদের !"

"আমরা যে কেন যাচ্ছিলাম সে তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না গুইরামদা। তখন তো ভাবিনি এভাবে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।"

গুইরাম আর কোনও কথা না বলে পাহাড় থেকে নেমে এসে জঙ্গলের দিকে মুখ করে মুখের দু'পাশে হাত রেখে চেঁচিয়ে ডাকল, "পঙ্খী ! এই পঙ্খী, পঙ্খী রে !"

অমনই বনের ভেতর থেকে ঘন কৃষ্ণবর্ণের একটি ছেলে বেরিয়ে এল।

গুইরাম বলল, "এই, হরিবোলদার কাছ থেকে আমার নাম করে তিনটে সাজ নিয়ে আসবি তো। জংলি সাজ। বলবি, আমি চেয়েছি। খুব দরকার।"

ছেলেটি ছুট্টে চলে গেল।

গুইরাম ওদের একটি বড়সড় গাছের আড়ালে ছায়ায় বসিয়ে বলল, "শোনো, আমার ছেলেটাকে তোমাদের সঙ্গে দিচ্ছি। ওর সঙ্গে সাজ পরে তোমরা ঠাকরুন পাহাড়িতে চলে যাও। ওগুলো পরে যেতে তোমাদের অবশ্য একটু অসুবিধে হবে। মানে খুব গরম করবে। কিন্তু এ ছাড়া কোনও উপায় নেই। আমার ছেলেটা ওখানকার সব কিছু চেনে-জানে। তোমরা গিয়ে একটু নজরে রেখো ওদের। আমি সবাইকে সতর্ক করে একটু পরেই লোকজন নিয়ে যাচ্ছি।"

বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর দেখা গেল পঙ্খী খালি হাতেই ফিরে আসছে।

গুইরাম বিরক্ত হয়ে বলল, "কী হল?"

"হরিবোলদা বাড়িতে নেই।"

"ধ্যুত একটা কাজ যদি তোকে দিয়ে হয়।" বলে নিজেই চলে গেল গুইরাম। তারপর হাতে করে কয়েকটি পালকের পোশাক এনে ওদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, এগুলো থেকে একটু বাছাই করে পরে নাও।"

শুভঙ্কর বলল, "এতে তো সবটাই ঢাকা পড়ে যাব আমরা।"

"আমি তো তাই চাইছি। এগুলো আমাদের নাট্য দলের জন্য তৈরি করানো হয়েছিল। শীতকালে মাঝেমধ্যে অবশ্য এগুলো পরে তোমাদের বয়সী ছেলেমেয়েরা শিকারে যায়। তা এগুলো পরে নিলে তোমাদের আসল চেহারা কেউ দেখতে পাবে না। সবাই ভাববে আমাদের এখানকার ছেলেরাই মজা করবার জন্য পরেছে।"

ওরা তা থেকে বেছে একটা ময়ূর, বক ও ভালুকের মুখোশ আঁটা পোশাক পরে নিল।

গুইরাম ওর ছেলেকে কী যেন বলতেই ছেলেটি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। তারপর ওদের দিকে একটু তাকিয়ে দেখে বনের ভেতর ঢুকে গেল। একটু পরেই তীর-কাঁড় নিয়ে বেরিয়ে এসে বলল, "চলো।"

গুইরাম বলল, "তোমরা নির্ভয়ে যাও। আমি একটু পরেই যাচ্ছি। ইতিমধ্যে আমি সতর্ক করে দিচ্ছি সকলকে। তোমরা নিজেরা কিছু করতে যেও না। একটু ওদের চোখে-চোখে রেখো।"

বিল্টু, তিন্নি আর শুভঙ্কর অদম্য উৎসাহে গণপতিকে স্মরণ করে পঙ্খীর পিছু-পিছু পথ চলতে লাগল। এই পোশাকে এই জংলি দেশে এইভাবে গাছের ছায়ায় পথ চলতে ভালই লাগল খুব। অবশ্য গাছের ছায়া সব জায়গায় যে পেল তা নয়। কেননা সূর্য তো এখন মাথার ওপর। তাই গাছপালার ছায়াগুলো ছোট্ট হয়ে সরল ভাবে পড়ছে। সেই ছায়ায় কোনও ঘনত্ব নেই। তার ওপর কী দারুণ গরম করছে এগুলো পরে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘেমে উঠল ওরা। কোথাও কোনও ফাঁক তো নেই। শুধু শ্বাস নেওয়ার জন্য নাকের কাছে একটা গর্ত আর দেখার জন্য দু' চোখে দুটো ফাঁক। তবু আশা এই, নিরাপত্তার ভরসা পাওয়া গেছে।

পথ চলতে-চলতেই আলাপ হল গুইরামের ছেলের সঙ্গে। একটু ল্যাকপ্যাকে সহজ-সরল। ও এখানকার ছেলের দলের মধ্যমণি। সবাই ওকে ভালবাসে। ওর কথা শোনে। ওর সঙ্গে যেতে-যেতে ওরা ওদের দুঃখের কথা সব বলল।

pathagar.net

সব শুনে পঙ্খী বলল, "এই কথা ? এর জন্য গুইরামের আসা দরকার কী ? আমি একাই একশো। আমি তো ওর দরজায় কড়া নাড়ব না। আগে একটা তীর ছুঁড়ব। তারপর ও বেরিয়ে এলেই বলব, "শিগগির মেয়েটাকে বের কর। না হলে তোর কলজেটাকে ফুটো করে দিলুম বলে।"

তিন্নি বলল, "তুমি তোমার বাবার নাম ধরছ পঙ্খী ?"

"তাতে কী হয়েছে। আমরা অমন বলি। তবে নাম ধরে ডাকি না অবশ্য।"

শুভঙ্কর বলল, "কিন্তু তুমি যে এইরকম করবে তাতে যদি ও রেগে গিয়ে গুলি চালায় ?"

"চালাক না। তারপর ? তারপর ওর আর কিছু নেওয়ার থাকবে ?"

বিল্টু বলল, "এই জঙ্গল-শেরের নামে কত কথাই না শুনেছি। এই অঞ্চলের আতঙ্ক ও।"

"আসলে বাইরের লোকেরা ওদের আচমকা উপদ্রবকে ভয় খায়। কিন্তু এখানে তো আমরা ওর সব কিছু জানি। আমরা ভয় পাব কেন ?"

বিল্টু বলল, "তুমি যে আগেই ওকে চার্জ করবে এতে তোমার বাবা রাগ করবেন না ?"

"আরে আমি তো গুইরামেরই ব্যাটা। চলোই না আগে গিয়ে দেখি কে কোথায় কীভাবে আছে। তবে এটুকু বলছি, এ-কাজটা আমার দ্বারাই সম্ভব।"

ওরা আর কোনও কথা না বলে ধীরে-ধীরে পথ চলতে লাগল। যাত্রাপথে দু' চোখ মেলে প্রকৃতির নব-নব রূপ দেখতে লাগল ওরা। গভীর অরণ্যানীর শ্যামলিমায় ওদের চোখ দুটো ভরে উঠল। আহা, কী অপূর্ব সবুজ শোভা ! কত গাছের সমারোহ। তাদের কোনও নাম জানা নেই। এখানে শুধু যে অরণ্য তা তো নয়, সামনে-পেছনে, ডাইনে-বাঁয়ে সমান্তরাল শৈলমালা বাসুকী নাগের ফণার মতো মাথা উঁচিয়ে আছে। পথে যেতে-যেতে পঙ্খীই কিছু-কিছু গাছপালার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল ওদের। শাল, সেগুন, মহুয়া ওদের চেনা। ঘন পত্রের চিহড় লতাও অপরিচিত নয়। অবশ্য শুভঙ্করের কাছে নতুন। পঙ্খী বলে, "ওই হচ্ছে শাল, শিমুল। ওদিকে পিয়াল। আর ওই যে গাছটা দেখছ ওটা হরীতকীর। এপাশে শিরীষ, মহুয়া, কুসুম। এদিকে দেখ মেহগনি গাছ। শিশু গাছ। অর্জুন, পলাশ। সেইসঙ্গে অজস্র বুনো জামের গাছও আছে।"

তিন্নি বলল, "আর ও-ধারের গাছগুলো তো আকাশমণি।"

"ওর পাশেই সারি-সারি ইউক্যালিপটাস।"

ওরা একটা মালভূমির মতো অংশে বাঁক নিয়ে ক্রমশ পাহাড়ে ওঠা শুরু করল। এই পাহাড়ের উঁচু অংশের জঙ্গল এত ঘন যে, এর নীচে সূর্যালোকও প্রবেশ করে কিনা সন্দেহ। এখানে পাহাড়ের কোলে ছোট-ছোট আদিবাসী গ্রাম। সেখানে আদিবাসী ছেলেমেয়েরা খেলা করছে। বুনো জাম কুড়োচ্ছে। কেউ-বা গাছপালার শুকনো ডাল ভেঙে জড়ো করছে। কেউ-কেউ, মানে ওদের চেয়ে একটু বড় যারা, তারা ছোট-ছোট শাল গাছের গায়ে কোপ মেরে গাছ কেটে জ্বালানির কাঠ সংগ্রহ করছে। এইভাবে ওরা অনেকটা পথ যাওয়ার পর পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতেই একটি হ্রদের সামনে এসে পড়ল। দু'পাশের খাঁজ-কাটা পাথরের বুক চিরে হ্রদের আকারে বয়ে চলেছে একটি নদী।

পঙ্খী বলল, "আমরা ঠাকরুনপাহাড়িতে এসে গেলাম।"

ওরা ভাল করে তাকিয়ে দেখল, শুধু পাহাড় আর পাহাড়। তারই মাঝখানে ছোট-ছোট কয়েকটি পর্ণকুটির।

শুভঙ্কর বলল, "এখানে কী এই একটাই গ্রাম?"

পঙ্খী বলল, "একটা কী গো। অনেক গ্রাম আছে এখানে। সবই পাহাড়ি গ্রাম। পাহাড় আর জঙ্গল ছাড়া এখানে তো কিছু নেই। ওই হচ্ছে কুটুচুয়া, ওদিকে ধাঙ্গিচুয়া, ওঁদলচুয়া, ওপাশে মাঝগেড়ে। আর এই দিকে হচ্ছে চিরুগোড়া, চিয়াকুঠি, বাঁশপাহাড়ি, বীরমাদল, পূর্ণাপানি, ঢাঙ্গিকুসুম। ঢাঙ্গিকুসুম হচ্ছে বিহার-বাংলায় বর্ডার। ওদিকে জামাইমারি, জাঁতালবেড়া। আর ওই যে পাহাড়টা দেখছ, ওটা হচ্ছে মাঝ কাঁদনা। ওপাশের পাহাড়টা চেনো?"

সবাই বলল, "না।"

"তোমরা যেদিক থেকে এলে, ওই পাহাড়টা হচ্ছে সেই বেলপাহাড়ির খুব কাছে। ওর নাম কানাইশোর। আষাঢ় মাসের তৃতীয় শনিবার পাহাড়-পুজো হয় ওখানে। বিরাট মেলা বসে। আর ওই হচ্ছে চিটিপাথর, ওদিকে লবণী। ওখানে হলদে মাটি পাওয়া যায়। আর এইপাশে কুটুচুয়া। সাদা মাটির খনি। আর ওই যে দেখছ? ওই হচ্ছে কুঁড়োলপাহাড়ি।"

পঙ্খী তো এক নিশ্বাসে বলে গেল সব। কিন্তু যাদের বলল, তাদের সবই গুলিয়ে গেল। বাপ রে! এত কখনও মনে থাকে? তাই ওরা কতক শুনল, কতক অন্যমনস্কতার জন্য শুনেও শুনতে পেল না। ওদের একমাত্র লক্ষ্য এখন জঙ্গল-শের এবং মউকে উদ্ধার করা। আর সত্যি কথা বলতে কি, ঠাকরুনপাহাড়ির গ্রামে পা দেওয়া মাত্রই ওদের বুকের মধ্যে ধড়ফড়ানি শুরু হয়ে গেছে। কীভাবে যে কী করবে, কী করে মউকে উদ্ধার করবে কিছুই ভেবে পেল না। এই ছদ্মবেশে ওরা অনেকটা নিরাপত্তা পেয়েছে। কিন্তু ওদের নিজেদের নিরাপত্তাটাই তো বড় নয়। ওরা সেই হ্রদের কাছে একবার একটু থমকে দাঁড়াল। এই ঠাকরুনপাহাড়িরই ছোট একটি পাহাড় থেকে দুরন্ত ডুলুং প্রথমে ঝরনার আকারে এবং পরে হ্রদের মতো হয়ে দুর্বার গতিতে খরস্রোতে বয়ে চলেছে। ওরা একটি ছোট্ট সাঁকোয় নদী পার হয়ে ছোট্ট একটি মাটির ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরের দরজায় তালা দেওয়া।

পঙ্খী বলল, "কই, কোথায় তোমাদের জঙ্গল-শের!"

বিল্টু, তিন্নি ও শুভঙ্করের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

গেল কোথায় তবে লোকটা? মউকে নিয়ে কোথায় পালাল?

পঙ্খী বলল, "ঘাবড়াবার কিছুই নেই। হয়তো ও পাহাড়ের গোপন ঘাঁটিতে গেছে।"

ওরা তখন সেখান থেকে এগিয়ে আরও একটু উচ্চস্থানে আর-একটি খোড়ো ঘরের দাওয়ায় উঠল। এটি এই ঠাকরুনপাহাড়ির একমাত্র দোকান। এখানে চা, তেলেভাজা, মুদিখানা সব কিছুই আছে। এমনকী মোটা ধুতি-শাড়িও পাওয়া যায়।

পঙ্খী দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, "বুনোর ঘরে তালা কেন বাসুদা?"

"কে জানে। আজ এক সপ্তাহ তো দেখছি না ওকে। কেন, কী ব্যাপার বলো

pathagar.net

তো ?"

"দরকার ছিল একটু।"

দোকানের একপাশে কয়েকটি অদ্ভুত রকমের ফল জড়ো করা ছিল। শুভঙ্কর সেগুলোর দিকে তাকিয়ে দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, "এগুলো কী জিনিস ?"

"ও হল কড়চা। এর বীজ থেকে তেল হয়। মহুল থেকেই এই কড়চা জন্মায়। কড়চার তেল কুড়ি বছরের পুরনো হলে বাত ও চিতি সাপে কামড়ালে সেরে যায়।"

বিল্টু, তিন্নি বলল, "বলো কী !"

দোকানদার বলল, "তোমরা কারা ?"

পঙ্খী বলল, "ওরা আমার বন্ধু। জঙ্গলে বেড়াতে এসেছে।"

"তা এই গরমে ওই পোশাকগুলো কেন পরিয়েছ বন্ধুদের ?"

"ওদের শখ হয়েছে খুব পরবার। তাই।"

"বেশ, বেশ। তা ওদের তা হলে খনি দেখিয়ে আনো। চুনা পাথরের খনিটা অন্তত দেখুক।"

"বুনোর সঙ্গে দেখা যখন হল না তখন ওই দিকেই নিয়ে যাব। তারপর দেখিয়ে আনব ডুলুং নদীর উৎসটা।"

দোকানের ভেতরে বেঞ্চিতে বসে শক্ত-সমর্থ দু'জন যুবক তখন চা খাচ্ছিল। তারা আড়চোখে একবার এদের দেখেই চায়ের দাম দিয়ে সুট করে কেটে পড়ল। তারপর দোকানের বাইরে গিয়ে চাপা গলায় নিজেদের ভেতর কী সব আলোচনা করে হারিয়ে গেল গহন বনের অন্তরালে।

॥ ১৩ ॥

এই হল ঠাকরুনপাহাড়ি। আতঙ্কের, সৌন্দর্যের এবং কল্পনার। এর নৈসর্গিক সৌন্দর্যের বিবরণ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তিন্নিরাও দোকান থেকে বেরিয়ে এসে পঙ্খীর সঙ্গে এগিয়ে চলল পর্বতাভিযানে। এই পাহাড় ডিঙিয়ে আর-একটা যে পাহাড়, সেই পাহাড়েই নাকি শয়তানের ঘাঁটি। ইতিমধ্যে চুনা পাথরের খনির কাছ থেকে একদঙ্গল আদিবাসী ছেলে এবং কয়েকটি কুকুর ওদের দলে ভিড়ে গেছে। এই ছেলেগুলো সকলেই পঙ্খীর খুব পরিচিত।

এখন ওরা দলবদ্ধ হয়ে পাহাড়ে উঠতে লাগল। সে কী দারুণ হইচই, আর আনন্দ।

তিন্নি বলল, "পঙ্খী ! আর আমাদের এই সাজ পরে থাকার দরকার কী ?"

পঙ্খী বলল, "বাঃ রে। এইবারই তো আমরা আসল জায়গায় যাচ্ছি। এইগুলো পরে থাকলে ওরা তোমাদের চিনতে পারবে না। ভাববে, আমাদেরই কেউ পরেছে শখ করে।"

ওরা প্রথমেই যে ছোট্ট পাহাড়টায় উঠল, তার নাম ঠাকরুনপাহাড়। এই পাহাড়ের নামেই গ্রামের নাম। এই পাহাড়ে ওঠার পথ নেই। সরু ফিতের মতো একটি পথ আগাছায় ঢেকে আছে। তাই ওরা বহু কষ্ট করে গাছের ডাল ধরে লতাগুল্ম মুঠো করে পাথরের খাঁজে পা দিয়ে ওপরে উঠল। অবশ্য সকলের

pathagar.net

আগেই উঠে পড়ল সঙ্গী সেই কুকুরগুলো। এদের চেয়ে ওদের উৎসাহ যেন আরও বেশি। বেশ কিছুটা উঠেছে এমন সময় আচমকা একটি কর্কশ ডাকে শিউরে উঠল ওরা। ওরা মানে বিল্টু, তিন্নি, শুভঙ্কর।

শুভঙ্কর বলল, "কিসের ডাক ওটা?"

পঙ্খী বলল, "ময়ূরের।"

আনন্দে নেচে উঠল শুভঙ্কর। ময়ূর তো ও চিড়িয়াখানাতেই দেখেছে। সেই ময়ূর এই প্রকৃতির স্বর্গরাজ্যে! মুক্ত পরিবেশে! এ যে কল্পনারও অতীত। শুভঙ্কর বলল, "কই! কোথায় ময়ূর! আমাকে দেখাও না ভাই?"

"সে এখন কোথায় কোন গাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে আছে তা কে জানে? এভাবে তো ওদের দেখা পাওয়া মুশকিল।"

একটি আদিবাসী ছেলে হঠাৎই গাছের ডালে একটি ময়ূর দেখে লাফিয়ে উঠল, "ওই, ওই তো।" বলেই পঙ্খীর হাত থেকে তীর-কাঁড় নিয়ে মারতে উদ্যত হল।

পঙ্খী সঙ্গে-সঙ্গে বাধা দিল তাকে। বলল, "করিস কী! ময়ূর মারা বারণ, জানিস না? এক্ষুনি পুলিশ এসে যাবে।"

শুভঙ্কর কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সেই ময়ূরকে দেখতে পেল না। তবে হঠাৎই যা দেখল তা দেখবে বলে ও স্বপ্নেও কখনও ভাবেনি। কোথা থেকে যেন আর-একটা ময়ূর উড়ে এসে পাহাড়ের একটি উঁচু পাথরে বসে পেখম মেলে একপাক ঘুরে নিল। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়েই একটা সাপ মুখে নিয়ে আবার উড়ে বসল গাছের ডালে।

ময়ূর দেখে ওরা আরও একটু ওপরে উঠতেই দেখতে পেল ডুলুং নদীর সেই উৎসটা। একটি নির্মল জলধারা পাহাড়ের একটি ফাটল থেকে কুলু-কুলু করে স্বচ্ছন্দ গতিতে কেমন নেচে-নেচে বেরিয়ে আসছে।

এখানেও পাহাড় ও বনানী ওদের চোখে অপরূপ হয়ে উঠল। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এক-একটি পাথরের ওপর বসে পড়ল এক-একজনে। কুকুরগুলো নিজেদের মধ্যে চেঁচামেচি করতে লাগল।

পঙ্খী বসল সবচেয়ে বড় পাথরে, উঁচুতে বসে বিল্টু, তিন্নি আর শুভঙ্করকে বলল, "এই হচ্ছে ঠাকরুনপাহাড়। পাহাড়ের নীচে গ্রাম। আর পেছনের বনবাদাড়ে ভরা ওই পাহাড়গুলোর গুহাতেই আমাদের অভিযান করতে হবে। ওইখানে অনেক ছোট-ছোট গুহা আছে। সচরাচর কেউ যায় না। যাওয়ার কোনও পথও নেই।

শুভঙ্কর বলল, "তা হলে আমরা যাব কী করে?"

"কষ্ট করে যেতে হবে। গাছপালার ডাল ধরে। পাথরের খাঁজে ভর করে।"

তিন্নি বলল, "ওখানে কেউ যায় না কেন? যাওয়ার পথ তৈরি হলে তো ভারী চমৎকার বেড়ানোর জায়গা হতে পারে ওগুলো।"

"পথ অবশ্যই আছে। তবে কিনা বর্ষার ফলে অনেক আগাছা গজিয়েছে চারদিকে। তাই সে-পথ ঢাকা পড়ে গেছে। বিশেষ করে ওই জায়গাগুলো দুষ্কৃতীদের ঘাঁটি বলে স্থানীয় লোকজন এড়িয়ে চলে জায়গাগুলো। তাই জ্বালানি কাঠের প্রয়োজনে গাছ কাটতেও কেউ যায় না। তবে আমরা যে যাইনি কখনও

pathagar.net

বা যাই না, তা নয়।"

"তোমাদের কিছু বলে না ওরা ?"

"বিশেষ কিছু বলে না। তবে অচেনা লোক গেলে রক্ষে নেই। কোথা থেকে যে লুকিয়ে গুলি করবে, তা টেরও পাবে না কেউ।"

শুভঙ্কর বলল, "তা হলে আমরা যাব কী করে ? যদি ওরা আমাদের দেখে গুলি করে ?"

অন্য ছেলেরা বলল, "হ্যাঁ, করুক না গুলি। মেরে তক্তা বানিয়ে দেব না। তীর মেরে চোখ-মুখ ফুটো করে দেব।"

শুভঙ্কর, বিল্টু ও তিন্নি চোখে-চোখে পরস্পরকে একবার দেখে নিল। শুধু জঙ্গল-শের তো নয়, এই মুহূর্তে ওদের মনে পড়ে গেল শিকারিবাজের কথা। এইরকমই কোনও একটি পরিত্যক্ত গুহার জঠরে নিশ্চয়ই ওর পাপার্জিত অর্থ, সম্পদ লুকনো আছে এবং লুকিয়ে আছে নিজেও। কিন্তু মউ ? মউকেও কি জঙ্গল-শের ওইরকম কোনও একটি গুহায় সত্যিই বন্দী করে রেখেছে ? এ-রহস্যের সমাধান চাইই-চাই। আর সেইজন্যই তো এত কষ্ট করে এখানে আসা। তাই দারুণ কৌতূহলী হয়ে বলল, "আমরা ওখানে যাবই। যত কষ্টই হোক, তবু যাব। দেখব ওই পাহাড়ের গায়ে গুহা আছে। এতদূর এসে আমরা কখনও ফিরে যেতে পারি না।"

পঙ্খী ওর দলের ছেলেদের বলল, "দ্যাখো ভাই, আমাদের এই বন্ধুরা কিন্তু কখনও এ-পথে আসেনি। এমনকী পাহাড় কাকে বলে তাও জানত না এতদিন। আজ এরা শুধু আমার নয়, আমাদের সকলের বন্ধু। তাই আমাদের উচিত এদের সব কিছু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেওয়া।"

সবাই বলল, "হ্যাঁ উচিত তো।"

"কিন্তু এদের কোনও ক্ষতি হলে আমাদের দারুণ বদনাম হয়ে যাবে।"

"এদের কোনও ক্ষতিই হবে না। আমরা থাকতে কেউ ওদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। আমরা আগে-আগে থাকব, ওরা থাকবে পেছনে। মরলে আমরাই আগে মরব।"

পঙ্খী বলল, "এবার তা হলে জেনে রাখো, আমরা ওখানে এতজন গেলে ওরা কিন্তু ভয় পেয়ে আক্রমণ করতে পারে।"

"ওরা আক্রমণ করলে আমরাও পালটা আক্রমণ করব। তীর ছুঁড়ব। পাথর ছুঁড়ব।"

"যদি ওরা গুলি করে ?"

"আমরা একজন কী দু'জন মরব। কিন্তু ওরা সবাই মরবে।"

"ঠিক আছে। এবার তবে তোমাদের আরও একটা কথা জানিয়ে রাখি, যা শুনলে তোমরা সবাই রেগে যাবে ওই শয়তানগুলোর ওপর।"

"কীরকম !"

"আমাদের এই বন্ধুদের দলের একটি মেয়ে নিখোঁজ। ওই গুহাগুলো দেখতে যাওয়ার ছলে আমরা ওখানে তার খোঁজ করব।"

"সে যে ওখানেই আছে তার ঠিক কী ?"

তিন্নি বলল, "থাকলে সে ওখানেই থাকবে। তার কারণ, সে তো নিজে

pathagar.net

থেকে নিখোঁজ হয়নি। একজন লোক জোর করে তাকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। আমাদের এক বন্ধুকে সে লাথি মেরে ডুলুং-এ ফেলে দিয়েছে। আমরা জানতে পেরেছি তার নাম বুনো। তোমরা কি তাকে চেনো ?"

ছেলেরা বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ। চিনি বইকী। ওই তো পাহাড়ের নীচে যে-ঘরটা দেখা যাচ্ছে, ওই ঘরটা তার। কিন্তু সে তো এখানে নেই। আজ ক'দিন হল সে কোথায় গেছে। আমরা কেউ দেখিনি তাকে।"

পঙ্খী বলল, "সেইজন্যই আমরা সন্দেহ করছি সে নিশ্চয়ই পুলিশের ভয়ে ওই পাহাড়ের গুহার ভেতরে লুকিয়ে আছে।"

ছেলেরা বলল, "তা অবশ্য থাকতে পারে।"

তিন্নি বলল, "এ ছাড়া সে ওকে রাখবেই বা কোথায় বলো ? তাই, তোমরা সবাই আমাদের সঙ্গে চলো, যদি খুঁজে পাই মেয়েটিকে।"

ছেলের দল প্রচণ্ড কলরবে হইহই করে এগিয়ে চলল। সকলের আগে-আগে কুকুরগুলো। তাদের পেছনে বীর-বিক্রমে ছেলের দল। কুকুরগুলো যেন বুঝতে পেরে গেছে কোথায় তাদের যেতে হবে। এদের চেয়েও ওদের উৎসাহ যেন আরও বেশি।

ছেলের দলের মধ্যমণি পঙ্খী রইল সকলের আগে। তার পেছনে বাকি ছেলেরা। সবার পেছনে বিল্টু, তিন্নি ও শুভঙ্কর। পঙ্খী ছাড়াও এই ছেলেদের দু-একজনের কাছে তীর-কাঁড় ছিল। ওরা এখন এমনই মারমুখী যে, এই সময় হঠাৎ করে ওদের সামনে কেউ এসে পড়লে তার বুঝি আর রক্ষে নেই।

ওরা এই পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে যখন 'আসল' পাহাড়ের খানিকটা উঠেছে তেমন সময় ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে সেই দুই আদিবাসী তরুণ, যারা চালাঘরের চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিল, তারা বেরিয়ে এল। তারপর ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে ভীষণ মূর্তিতে এমনভাবে এগিয়ে এল যে, দেখলে বুক শুকিয়ে যায়।

শুভঙ্কর, বিল্টু ও তিন্নিকে দেখে ছেলের দল থমকে দাঁড়াল। কুকুরগুলো গর-গর করতে লাগল রাগে। ওরা ধমক দিয়ে বলল, "খবর্দার! এক পা-ও এগোবি না কেউ।"

পঙ্খী বলল, "পথ ছাড় বিশাল। আমরা শিকারে যাচ্ছি, আমাদের যেতে দে।"

পঙ্খীর অমন ভয়ঙ্কর মূর্তি আগে কেউ দ্যাখেনি। এইটুকু ছেলে, কী তার রোখ। যেন কেউটের বাচ্চা ফণা তুলেছে।

বিশাল বলল, "তোদের সঙ্গে ওই তিনজন কে ?"

"তাতে তোর দরকার কী ?"

আর-এক তরুণ, তার নাম চম্পক। বলল, "ওদের বল, ওই সাজা পোশাকগুলো খুলে ফেলতে। আমরা দেখব ওর ভেতরে কারা আছে।"

পঙ্খী বলল, "না। ওরা খুলবে না।"

বিল্টু, তিন্নি, শুভঙ্কর—তিনজনেই তখন আত্মপ্রকাশ করল।

বিশাল বলল, "তোরা কারা! এই অঞ্চলে কখনও তো দেখিনি তোদের। বেশ ভাল ঘরের ছেলেমেয়ে বলেই মনে হচ্ছে। এখানে এই জঙ্গলে কী করতে

pathagar.net

এসেছিস ?"

শুভঙ্কর বলল, "আমরা পাহাড় দেখতে এসেছি।"

"কে পাঠিয়েছে তোদের ?" বিশাল অগ্নিদৃষ্টিতে তাকাল পঙ্খীর দিকে।

পঙ্খী বলল, "দেখছিস কী ! তোর ওই চোখ দুটোকে আমি ভয় করি না। আমাদের এই বন্ধু-দলের একটি মেয়েকে তোদের বুনো চুরি করে এনেছে। এই পাহাড়েরই কোনও গুহাতে লুকিয়ে রেখেছে তাকে। তুই শিগগির আমাদের সঙ্গে গিয়ে তাকে বের করে দিবি চল। না হলে এখান থেকে শুধু হাতে যদি আমাদের ফিরতে হয় তা হলে আগে আমরা বুনোর ঘরে আগুন লাগাব, তারপর তোদের ঘরে। শুধু তাই নয়, কাল সকাল হলেই ঝাড়গ্রাম থেকে পুলিশ আনিয়ে ধরিয়ে দেব তোদের।"

পঙ্খীর কথায় অত্যন্ত রেগে গেল বিশাল। বলল, "পুলিশ এনে তোরা আমাদের ধরিয়ে দিবি ? তারপর কি ভেবেছিস আমরা তোদের ছেড়ে দেব ? গোটা ঠাকরুনপাহাড়িকে জ্বালিয়ে দেব আমরা, তা জানিস ?"

দলের একটি ছেলে তখন একটি পাথর কুড়িয়ে পটাং করে ছুঁড়ে মারল বিশালের কপাল লক্ষ্য করে। এক ঢিলেই কাত। রক্তের ধারা ঝর-ঝর করে ঝরে পড়তেই রুমালে কপাল চেপে পাথরের ওপর ঝুপ করে বসে পড়ল বিশাল।

চম্পক তখন ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই ছেলেটির ওপর।

তাই দেখে পঙ্খীও ছুটে গেল 'তবে রে !' বলে।

চম্পক একটা লাথি মারল পঙ্খীকে। পঙ্খী ছিটকে পড়ল।

ছেলের দল তখন বীর-বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল চম্পকের ওপর। হাতের কাছে যা পেল তাই দিয়ে মারতে লাগল চম্পককে। ক্রুদ্ধ কুকুরগুলোর চিৎকারে তখন চারদিক মুখর হয়ে উঠল। বিশাল কোনওরকমে উঠে দাঁড়িয়েই রিভলভার তাগ করল ওদের দিকে।

সেই মুহূর্তে শুভঙ্করের হাতেও রিভলভার এসে গেছে। শুভঙ্কর একটুও দেরি না করে ট্রিগার টিপল, "ডিসুম।"

বিশালের দেহ লুটিয়ে পড়ল পাথরের বুকে।

এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে হতচকিত সবাই।

শুভঙ্কর রিভলভার হাতে ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেল চম্পকের দিকে।

চম্পক কাঁপতে-কাঁপতে বলল, "দোহাই তোমাদের, আমাকে মেরো না।"

শুভঙ্কর বলল, "আমাদের বাধা না দিলে মারব না। তবে প্রাণে যদি বাঁচতে চাস, তা হলে এক্ষুনি আমাদের মেয়েটাকে ফিরিয়ে দে।"

"তোমরা কোন মেয়ের কথা বলছ আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না ?"

"বুঝতে পারবি। আগে বল, বুনোটা কোথায় লুকিয়ে আছে ?"

"বুনো নেই।"

শুভঙ্কর এক লাথি মারল ওর পেটে।

চম্পকের মুখ দিয়ে 'কোঁক' করে একটা শব্দ বের হল। তারপর অতিকষ্টে বলল, "সত্যি বলছি বুনো নেই। তবে তোমরা চলো। আমি তোমাদের বন্দী গুহায় নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে তোমরা তোমাদের মেয়েকে চিনে নেবে।"

ওরা তখন চম্পককে সঙ্গে নিয়ে ধীরে-ধীরে এগোতে লাগল। চম্পক চলল

pathagar.net

সকলের আগে। তার পেছনে বিল্টু, তিন্নি ও শুভঙ্কর। ছেলের দলও চলল হইহই করে। এমনকী কুকুরগুলোও ওদের সঙ্গ ছাড়ল না।

এদিকে রিভলভারের শব্দে ও হইহল্লা শুনে পাহাড়ের অন্য একটি উঁচু জায়গা থেকে চোখে বাইনোকুলার লাগিয়ে ওদের সবাইকে বেশ ভালভাবে লক্ষ্য করতে লাগল শিকারিবাজ। এই অবেলায় দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে দলবদ্ধ ছেলেদের সঙ্গে বিল্টু, তিন্নি ও শুভঙ্করকে দেখেই তো চোখ কপালে উঠে গেল তার। তার ওপর চম্পকের ওই শোচনীয় অবস্থা ভাবিয়ে তুলল ওকে। শিকারি কল্পনাও করেনি কখনও ওদের এই গোপন ঘাঁটিতে এইভাবে কেউ আসতে পারবে বা নিরীহ গ্রামবাসীদের এই ছেলেরা বিদ্রোহী হবে বলে। শিকারি একবার ভাবল ওর মেশিনগান দিয়ে এক লহমায় শেষ করে দেয় এই আপদগুলোকে, আবার সে-কাজের পরিণাম চিন্তা করে কাঁপতে লাগল থর-থর করে। এই মুহূর্তে কী যে করবে তা ভেবে পেল না শিকারিবাজ। সে বুঝতে পারল ছেলেমেয়েগুলো ক্রমশ এই পাহাড়ের একেবারে দুর্ভেদ্য অংশের দিকেই এগিয়ে আসছে। এবং ওরা এসে পড়লে কোনও কিছুই আর গোপন থাকবে না। উলটে সব লুটপাট হবে। পুলিশ হলে এতক্ষণে গুলি চালাতে সে দ্বিধা করত না। কিন্তু আদিবাসী ছেলেদের গুলি করলে কী যে হতে পারে না তাই ও ভাবতে লাগল। গাছের ডালে হাত-পা বেঁধে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করাও ওদের পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। এই মুহূর্তে বনে-বনান্তরে খবর পৌঁছে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। আর পালাবার পথ পাবে না।

চতুর শিকারিবাজ তাই আর একটুও সময় নষ্ট না করে ছুটে ওর নিজের গুহায় ঢুকে, নেওয়ার মতো যা-যা ছিল, চটপট গুছিয়ে নিল। তারপর একটা মাঝারি সাইজের দেশী ঘোড়ার পিঠে সেগুলো চাপিয়ে নিজেও চেপে বসল। একবার তাকিয়ে দেখল ছেলেগুলোর দিকে। পরে গুহার পেছন দিক দিয়ে আরও ঘন অরণ্যের পথে চুপিসারে রওনা দিল।

কিন্তু বিধি বাম। পালাবার পথ কই ? সবে একটা বাঁক নিয়েছে এমন সময় যা ও দেখতে পেল তাতে রীতিমত ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল ওর শরীর দিয়ে। ও দেখল, এক ভীষণদর্শন বুনো হাতি। পাগলা কিনা কে জানে ? এক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। হাতি তো নয়। খ্যাপা গণেশ। চোখ দুটো যেন জ্বলছে। এতবড় হাতি সচরাচর দেখা যায় না। পাহাড়ের ওপর পাহাড় যেন।

হাতিটা ওকে দেখা মাত্রই পিষে ফেলার জন্য দু' পায়ে ভর দিয়ে দু' পা খাড়া করে লাফিয়ে উঠল।

আর অনভিজ্ঞ মূর্খ শিকারি করল কি, বোকার মতো ওকে একটা গুলি করে বসল। তাও সে-গুলিটা আবার কপালে না লেগে লাগল কানে। আর যায় কোথা। ক্ষিপ্ত বুনো হাতির তখন সে কী প্রচণ্ড গর্জন। 'হ্যার্‌র্‌রো। হ্যার্‌র্‌রো।' সেই ভীষণনাদে পাহাড় ও বনভূমি থর-থর করে কেঁপে উঠল।

বিল্টু, তিন্নি, শুভঙ্কর এবং সেই আদিবাসী ছেলের দল সবাই চমকে উঠল হাতির ডাকে।

পল্লী এই আর্ত গর্জনের অর্থ বোঝে। তাই সে চিৎকার করে উঠল, "পালাও

পালাও। পালাও সব। যে যেখানে আছ, পালাও। বুনো গণেশ খেপেছে। পালাও শিগগির।"

নিমেষে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল সব। প্রাণভয়ে প্রথমেই দৌড়ল কুকুরগুলো। তারপরে ছেলের দল। দারুণ ভয়ে ভীত হয়ে পালাল ওরা।

চম্পকও তখন হাতির ভয়ে কাঁপছে কিন্তু গুলির ভয়ে পালাতে পারছে না। সে ভয়ে-ভয়েই বলল, "তোমরা রয়ে গেলে যে! পাগলা হাতির ডাক শুনতে পাচ্ছ না?"

শুভঙ্কর বলল, "পাচ্ছি তো। কিন্তু আমরা আমাদের মেয়েটিকে না নিয়ে ফিরছি না।"

"এর মধ্যে ওই হাতিটা এসে পড়লে রক্ষে রাখবে না কিন্তু। এখনও সময় আছে, পালাও।"

"আমাদের মেয়েটা কোথায়?"

"ওই যে, গুহার ভেতরে। কিন্তু তোমরা ওখানে যাবে কী করে?"

"যেভাবে তুমি আমাদের নিয়ে যাবে সেইভাবেই যাব।"

"কিন্তু পাগলা হাতিটা ওই দিক থেকেই ডাকছে যে?"

"ডাকুক না। মেয়েটাকে আমাদের চাই।"

"তা হলে চটপট এসো।"

ওরা দ্রুত এগিয়ে চলল চম্পকের সঙ্গে।

এদিকে আহত হাতিটা তখন ভীষণ গর্জন করে ভয়ঙ্কর ক্রোধে প্রতিশোধের স্পৃহা নিয়ে রণমূর্তিতে ছুটে এল শিকারির দিকে। প্রাণভয়ে ভীত শিকারি কোথায় যে লুকোবে কিছু ঠিক করতে না পেরে ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়েই যে-পথে এসেছিল সেই পথে ছুটে চলল। ঘোড়াটাও প্রচণ্ড ভয়ে চিঁহিহিহি করে ডেকে উঠতেই হাতিটা তাকে শুঁড়ে জড়িয়ে মারল এক আছাড়। ঘোড়াটা সবসুদ্ধু উলটে পড়ল পাহাড়ের খাদে। সোনাদানা, টাকার বাণ্ডিল ছত্রাকার হয়ে গেল সব।

আর শিকারিবাজ? বুনো গণেশের তাড়া খেয়ে দিশেহারা হয়ে ছুটতে গিয়ে হঠাৎ সে এমন একটা জায়গায় গিয়ে পড়ল যেখানে তার পালাবার মতো আর কোনও পথ নেই। সে পেছন দিক থেকে পাহাড়েরদেওয়ালআঁকড়ে মুখ বিকৃত করে তার যমকে দেখতে লাগল। উঃ, কী সাঙ্ঘাতিক। ওই আসছে— ওই এলো— আরও— আরও কাছে। সোনার গণপতির হিরের চোখ নয়, জীবন্ত গণপতির জ্বলন্ত চোখ। শুঁড় উঁচিয়ে সগর্জনে বিশাল দুটি দাঁত নিয়ে ছুটে আসছে ওর দিকে। এই মুহূর্তে ওকে শেষ করে দিল বুঝি! না, এইভাবে ওই দানবের পায়ে পিষে মরার চেয়ে অন্য মৃত্যু বরং ভাল। তাই খ্যাপা গণেশ ওর আরও কাছে আসার আগেই ও চোখ বুজে পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ল পাশের খাদে। ওর অন্তিম আর্তনাদের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি হয়ে ঘুরে ফিরল চারদিকে।

ইতিমধ্যে জঙ্গলের চারদিক থেকে দলে-দলে হাতি বেরিয়ে আসতে লাগল হুড়মুড় করে। বুনো হাতির এই দলটি দূরের কোনও বনভূমি থেকেই সম্ভবত পথভ্রষ্ট হয়ে এসে পড়েছে এখানে।

বিল্টু, তিন্নি, শুভঙ্কর তখন চম্পককে নিয়ে গুহার একেবারে কাছাকাছি।

ওদিকে ঠাকরুনপাহাড়ের মাথায় গুইরামও তার দলবল নিয়ে হাজির। কত আদিবাসী যে জড়ো হয়েছে তার যেন ঠিক নেই। গুইরাম সেখান থেকেই চিৎকার করে বলল, "খোকাবাবুরা, তোমরা এ কী করছ! পালিয়ে এসো শিগগির। বুনো হাতিকে বিশ্বাস নেই। ওরা তোমাদের দেখলেই তাড়া করবে। পিষে ফেলবে একেবারে।"

বিল্টুরা হাত নেড়ে জানাল, আমরা এখনও নিরাপদ আছি। বা আমরা প্রাণের মায়া ত্যাগ করেছি।

চারদিক থেকে তখন টিন, ক্যানেস্তারা ইত্যাদি বাজানো হচ্ছে ঢকঢক করে। এ-অঞ্চলের প্রথাই এই, বুনো শুয়োর বা হাতির দল এসে পড়লে এইভাবে শব্দ করা হয়। সেই শব্দের চোটে তখন কান পাতা দায়।

বিল্টুরা গুহার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই চম্পক বলল, "এই সেই গুহা।"

ওরা দেখল একটা বড় আকারের গুহার নীচ থেকে ওপর পর্যন্ত বড়-বড় পাথর এমনভাবে সাজানো যে, কোনও জন্তুজানোয়ারের পক্ষেই সেই গুহার ভেতরে ঢুকে পড়া সম্ভব নয়। বানর, হনুমান বা সরীসৃপ জাতীয় কিছুর কথা আলাদা। গুহার উপরিভাগে সামান্য একটু ফাঁক। সেই দিক দিয়েই ঢুকতে হবে ও বেরোতে হবে।

শুভঙ্কর বলল, "আমরা এর ভেতরে ঢুকব কী করে?"

চম্পক তাড়াতাড়ি একটি গাছের ডালের সঙ্গে বেঁধে রাখা দড়ির মইটা ঝুলিয়ে দিল ওদের দিকে, "তাড়াতাড়ি করো।"

ওরা তিনজনই এক জোটে ওপরে ওঠা শুরু করল। শুভঙ্কর উঠেই তিন্নির হাত ধরল। তারপরে বিল্টুর।

চম্পকও তখন ওঠা শুরু করেছে। তবে তাকে আর বেশি উঠতে হল না। সবে খানিকটা উঠেছে, এমন সময় সেই আহত মত্ত হাতিটা ছুটে এসে শুঁড়ে করে জড়িয়ে ধরল ওকে। ধরেই এক আছাড়। তারপর পায়ে করে দলে পিষে একদম শেষ করে দিল। দিয়েই শুরু করল আবার প্রচণ্ড চিৎকার।

শুভঙ্কর দড়ির মইটা গুটিয়ে নিয়ে ভেতরদিকে ঝুলিয়ে দিল। এখন মউকে উদ্ধার করতে হবে, সেইসঙ্গে আত্মরক্ষাও। সারারাত এখানে থেকে ভোরবেলা রওনা দেবে সকলে। না হলে এখন এই হাতির উপদ্রব এবং রাতের অন্ধকার দুই-ই ওদের পক্ষে বিপজ্জনক। শুধু একটা হাতি তো নয়, হাতির একটা দল খেপে গিয়ে ছুটোছুটি করছে চারদিকে।

ওরা এক-এক করে মই বেয়ে গুহার ভেতরে নেমে মউকে খুঁজতে লাগল। গুহাটি বেশ প্রশস্ত। এক কোণে ছোট্ট একটি চিমনি লণ্ঠন টিম-টিম করে জ্বলছে। তারই আলোয় ওরা দেখল কতকগুলি অসহায় ছেলেমেয়ে লোহার চেন দিয়ে হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। নানা বয়সের ছেলেমেয়ে সবই কিন্তু না। তাদের ভেতরে আসলজনই নেই। অর্থাৎ কিনা যার জন্য এখানে আসা সেই মউকেই দেখা গেল না তাদের ভেতর।

তিন্নি দু' হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল এবার।

বিল্টু ওর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলল, "কেঁদে কী করবি বল? আমরা তো চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখিনি। যার কপালে যা আছে তা তো হবেই।"

pathagar.net

শুভঙ্কর বলল, "এত কষ্ট করে, জীবন বিপন্ন করে এখানে এসে এই ফল ? ঠিক আছে, এই যদি হয় তা হলে মানস-কৈলাসের রাবণ হ্রদে নয়, ওই সোনার গণপতিকে আমি পেঁকো পুকুরে ছুঁড়ে ফেলব।"

বিল্টু একবার তাকিয়ে দেখল শুভঙ্করকে। সেই দেখার মধ্যে কী ভাব ফুটে উঠল তা ঠিক বোঝা গেল না।

এদিকে লৌহ-শৃঙ্খলে বন্দিনী মেয়েরা এবং ছেলেরা কাতর কণ্ঠে ওদের বলতে লাগল, "তোমরা কারা ভাই ? এখানে কী করে এলে ? খিদেয়-তেষ্টায় ছটফট করছি আমরা। আমাদের এই শিকলগুলো দয়া করে কেটে দাও।"

কিন্তু লোহার শিকল শুধু হাতে তো কাটব বললেই কাটা যায় না। তার ওপর প্রত্যেককে পাকে-পাকে জড়িয়ে তালা মেরেছে।

শুভঙ্কর বলল, "ভয় নেই। তোমরা সবাই মুক্তি পাবে। আমরা তোমাদের মুক্তি দেব বলেই এসেছি। কিন্তু তালার চাবিটা কার কাছে বা কোথায় আছে বলতে পারো ?"

"চাবি তো ওদের কাছে।"

"চাবি না পেলে কী করে খুলব ?"

তিন্নি বলল, "একটা পেরেক অথবা তালাটা ভাঙার মতো একটা ভারী পাথর পেলেও হয়।"

বিল্টু আর তিন্নি তখন আলো নিয়ে চারদিক খুঁজতে লাগল। খুঁজতে-খুঁজতে হঠাৎই এক জায়গায় একটি মরচে-ধরা পেরেক কুড়িয়ে পেল ওরা। বিল্টু সেই পেরেকটা এনে তালার মধ্যে ঢুকিয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করতেই খুট করে খুলে গেল তালাটা।

তালা খুলতেই চেন খুলে দেওয়া সহজ হয়ে গেল। মুক্তি পেল সকলেই। মুক্তির আনন্দ বড় আনন্দ। ছেলেমেয়েগুলো যেন হাতের মুঠোয় স্বর্গ পেল। তবে এখন মুক্তি পেলেও তো বাইরে বেরনো যাবে না, উন্মত্ত হাতির দল চারদিকে ছুটোছুটি করছে তখন।

শুভঙ্কর দড়ির মই বেয়ে আর-একবার ওপরে উঠে বাইরের অবস্থাটা দেখল। দূরের ঠাকরুনপাহাড়ির পাহাড়ে ও গ্রামে শুধু মশালের আগুন নিয়ে লোকজন ছুটোছুটি করছে। চারদিক থেকে সমানে ভেসে আসছে টিন পেটানোর শব্দ। সেইসঙ্গে শোনা যাচ্ছে মত্ত হাতির ভীষণ গর্জন। সেই ভয়ঙ্কর শব্দে আতঙ্কিত চারদিক। তাই দেখে বাইরে বেরনোর সব আশা ছেড়ে দিয়ে আবার নেমে এল ও। বলল, "নাঃ, আজ আর এখান থেকে পালাবার কোনও পথ নেই। বাইরে বেরোলেই অবধারিত মৃত্যু। এসো, আমরা সবাই বরং রাত জেগে বসে-বসে গল্প করি।"

বিল্টু বলল, "বাইরেকার অবস্থা তা হলে খুবই খারাপ ?"

"খুব খারাপ। তবে এখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা তো জেনে গেছে। তারা দেখেছে যে আমরা এখানে আছি। তাই পরিস্থিতি শান্ত হলে ওরাই এসে উদ্ধার করবে আমাদের।"

বিল্টু, তিন্নি ও শুভঙ্কর সদ্য-মুক্ত ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে বসে এবার আলাপ-পরিচয়ে মেতে উঠল। তাদের অপহৃত হওয়ার বা তাদের ওপর অকথ্য

pathagar.net

অত্যাচারের মর্মন্তুদ কাহিনী মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগল ওরা।

এইভাবে সারাটা রাত ওরা কাটিয়ে দিল প্রবল উত্তেজনায়। কারও চোখেই ঘুম এল না। এদের সঙ্গেই কথোপকথনে ওরা জানতে পারল, দু-তিনদিনের মধ্যে কোনও নতুন ছেলেমেয়ে এখানে আসেনি। তাই মউয়ের ব্যাপারটা রহস্যময়ই রয়ে গেল।

ভোরের আলো ফুটে ওঠার পর গুহার বাইরে থেকে একটা প্রচণ্ড কোলাহল ওদের কানে আসতে লাগল। ওরা বুঝতে পারল নিশ্চয়ই কোনও উদ্ধারকারী দল ওদের খোঁজে এখানে এসেছে।

শুভঙ্কর একটুও দেরি না করে সেই দড়ির মই বেয়ে ওপরে উঠেই দেখল শ'য়ে-শ'য়ে আদিবাসী লাঠিসোঁটা নিয়ে হাজির হয়েছে সেখানে। তাদের নেতৃত্বের পুরোভাগে রয়েছে গুইরাম মাহাতো। সেইসঙ্গে চারদিক ঘিরে আছে অসংখ্য পুলিশ। আর সেই পুলিশের মাঝখানে সসম্মানে মাথা উঁচু করে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তাঁকে দেখেই চমকে উঠল শুভঙ্কর। আনন্দে-উত্তেজনায় কী যে করবে ও তা ভেবে পেল না। গুহার ভেতরে মুখ করে সে চিৎকার করে বলল, "ওরে তোরা জেনে রাখ, আর আমাদের কোনও ভয় নেই। আমার বাপি এসে গেছেন। কী মজা!"

শুভঙ্করের কথায় উল্লসিত হয়ে সবাই ছুটে এল হইহই করে। তারপর সেই ঝোলানো দড়ির মই ধরে এক-এক করে ওপরে উঠল। এবং ওই একইভাবে নীচে নামল সকলে।

ডি· এস· পি· শিবশঙ্কর দত্ত ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন ছেলেকে। বললেন, "তুই ভাল আছিস তো বাবা? কোথাও কোনও আঘাত পাসনি?"

শুভঙ্কর বলল, "আমি খুব ভাল আছি। কিন্তু তুমি কি করে জানলে আমরা এখানে আছি?"

"উঃ, তুই যা ভাবিয়ে দিয়েছিলি না আমাদের!"

"তা তো দিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি খবর পেলে কী করে?"

"কী করে পেলাম? এই দ্যাখ তবে।" বলে বড় একটি গাছের আড়াল থেকে যার হাত ধরে টেনে আনলেন তাকে দেখেই তো চমকের পর চমক।

বিস্মিত শুভঙ্কর বলল, "এ কী মউ! তুমি এখানে? আমরা তোমার খোঁজেই এখানে এসেছি।"

শিবশঙ্করবাবু বললেন, "এই মেয়েটিই তো খবর দিয়ে আমাদের আনাল। তবে তোকে যে ফিরে পাব, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। তোকে না সেই কুখ্যাত ডাকাতটা জলে ফেলে দিয়েছিল?"

"হ্যাঁ বাপি। আমি কোনওরকমে প্রাণে বেঁচে গেছি। কিন্তু চিন্তা হচ্ছিল মউয়ের জন্য।"

এমন সময় গুইরাম মাহাতো ভিড় কাটিয়ে এসে বলল, "আমি আপনাকে বলিনি সার! আপনার ছেলে বেঁচে আছে। ওরা আমাকে সব কথা বলেছে। তাই তো আমি সাহস করে বলতে পারলুম আপনাকে যে, আপনার ছেলে মরেনি।"

তিন্নি তখন মউকে জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ করে কাঁদছে।

pathagar.net

বিল্টু তিন্নিকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "ছিঃ কাঁদিস না। এখন কি কান্নাকাটির সময় ? আজ আমাদের কত আনন্দের দিন বল তো ? আমরা সবাই সবাইকে ফিরে পেলাম। এর চেয়ে সুখের আর কী আছে ?"

শুভঙ্কর মউকে বলল, "কিন্তু ওই শয়তান জঙ্গল-শেরটার হাত থেকে তুমি কী করে রক্ষা পেলে মউ ? কে তোমাকে বাঁচাল ?"

মউ বলল, "কেউ আমাকে বাঁচায়নি। কেউ এসে রক্ষা করেনি। জঙ্গল-শেরকে আমি খুন করেছি। তবে প্রাণে বেঁচেছি গণপতির দয়ায়।"

"কীরকম শুনি ?"

"তোমাকে তো জঙ্গল-শের লাথি মেরে ফেলে দিল। তারপর আমি ওকে প্রচণ্ড রকমের বাধা দিতে শুরু করলাম। ও আমার একটা হাত এমনই শক্ত করে ধরে রইল যে, আমি সে-হাত কিছুতেই ছাড়াতে পারলাম না। দুরন্ত ডুলুংয়ের প্রবল জলস্রোতে লক্ষ্যহীনভাবে ভেসে চলল ভেলাটা। তারই গতিবেগে আমরা টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম ভেলার ওপর। আর সেই ফাঁকেই আমার গুপ্তস্থান থেকে ছুরিটা বের করে ওকে এতটুকুও সতর্ক হওয়ার সুযোগ না দিয়ে গলার নলিটা দু' ফাঁক করে দিলাম ওর। দিয়ে তোমাকে যেভাবে লাথি মেরে ফেলে দিয়েছিল ঠিক সেইভাবেই লাথি মেরে ফেলে দিলাম ওকে। ওর দেহটা স্রোতে ভেসে কোথায় যেন তলিয়ে গেল। এদিকে আমাদের দাপাদাপিতে লগিটাও কখন পড়ে গেছে জলে। তাই কোনওভাবেই ভেলাটাকে আমি ভেসে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে পারলাম না। অতএব ভাগ্যের হাতে সব কিছু ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতে-থাকতে এক সময় রোহিণীর কাছে ডুলুং যেখানে সুবর্ণরেখায় পড়ছে সেইখানে ধাক্কা খেয়ে ভাঙনের গায়ে ঘন কাশবনের গোছা ধরে কোনওরকমে তীরে নামি। তারপর গ্রামবাসীদের সাহায্য নিয়ে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করি ও সব কথা খুলে বলি। ইতিমধ্যে তোমার বাবা ঘাটশিলা থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে সব কিছু জেনে তোমার খোঁজে এসে পড়েছিলেন। তাই এত সহজে পিতাপুত্রের মিলন হল।"

আদিবাসীরা তখন সবাই এসে পাকড়েছে শিবশঙ্করবাবুকে। বলল, "দেখুন বাবু, আমরা গরিব হতে পারি, তবে অসৎ নই। তাই বলি, আপনারা সর্বাগ্রে ওই পাহাড়ের ওই গুহাগুলোকে বোজাবার ব্যবস্থা করুন। না হলে ওগুলো থাকলেই যতসব চোর-ডাকাতের দল এসে ঘাঁটি করবে ওখানে। আর বদনাম হবে আমাদের। বরং ওইগুলো বুজিয়ে এইখানে এই যে খনিটা আছে এটাকে আবার কাটাবার ব্যবস্থা করুন। তাতে করে আমরা বা আমাদের ছেলেপুলেরা একটু কাজটাজ পাব। আমরা খুব গরিব, দুঃখী লোক বাবু।"

শিবশঙ্করবাবু বললেন, "বেশ, বেশ। বেশ কথা বলেছ তোমরা। আমি নিজে চিঠি লিখে বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয়কে জানাব, যাতে তিনি সদয় হয়ে তোমাদের পাশে এসে দাঁড়ান।"

গুইরাম বলল, "আর খবরের কাগজওয়ালাদেরও একটু বলবেন বাবু, যাতে এই জায়গাটার নামটামগুলো একটু ছেপে দেয়।"

"তা হলে ?"

"তা হলে কলকাতা থেকে বাবুরা সব এখানে বেড়াতে আসবেন। আসবেন

pathagar.net

পিকনিক করতে। আর এই গরিব গুইরাম মাহাতোর দোকানে কেনাবেচা হবে। বেলপাহাড়িতে একটি বেলগাছও নেই অথচ সেখানকার ঢাক খুব বাজে। আর এই ঠাকরুনপাহাড়ি প্রকৃতির স্বর্গরাজ্য। কিন্তু এর নাম কেউ জানে না।"

শিবশঙ্করবাবু বললেন, "ঠিক আছে। কাগজওয়ালাদেরও তোমাদের জন্য কিছু করতে বলে দেব আমি। তবে একটিমাত্র শর্তে।"

"বলুন কী শর্ত?"

"শহর থেকে লোকজন এলে তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব কিন্তু তোমাদেরকেই নিতে হবে। তাদের যাতে কোনও বিপদ-আপদ না হয় বা কেউ তাদের সঙ্গে যেন দুর্ব্যবহার না করে সে-দিকটা তোমাদের দেখতে হবে।"

"নিশ্চয়ই দেখব। আমরা কথা দিলাম। এই যে আপনাদের ছেলেমেয়েগুলো এখানে এল, আমরা থাকতে তাদের কোনও কষ্ট হয়েছে কী? আপনি আসার আগে আমরা তো নিজে থেকেই ওদের সাহায্য করব বলেই তৈরি হয়েছিলাম।"

শিবশঙ্করবাবু গুইরাম মাহাতোর পিঠ চাপড়ে বললেন, "ধন্যবাদ। আমি খুব খুশি হয়েছি তোমাদের কাজে।" বলে সকলকে নিয়ে ধীরে-ধীরে এগোতে লাগলেন ঠাকরুনপাহাড়ির দিকে। যেতে-যেতে এখানকার পুলিশ অফিসারদের বললেন, "এরা কিন্তু একটা কথা ঠিকই বলেছে। ওই গুহাগুলোর দিকে এবার আপনারা নজর দিন। হয় ওগুলোকে উড়িয়ে দিন ডিনামাইট দিয়ে, অথবা পাথর সাজিয়ে মুখগুলো ব্লক করে দিন। তা হলে এইসব দুষ্টচক্রের প্রভাব অনেক কমে যাবে।"

শিবশঙ্করবাবুর সঙ্গে ওখানকার পুলিশ অফিসাররাও একমত হলেন সবাই। বললেন, "হ্যাঁ। ইমিডিয়েটলি একটা স্টেপ নিতে হবে।" বলে অল্প কিছু পথ হেঁটে ওঁরা গ্রামে এসে পৌঁছলেন। ঠাকরুনপাহাড়ির তখন সে কী দারুণ অবস্থা। মত্ত হাতির দল কাল সারারাত ধরে চারদিক লণ্ডভণ্ড করেছে। ঘরবাড়ি ভেঙেচুরে খেতের ফসল নষ্ট করেছে। যা-তা কাণ্ড করেছে সব।"

যাই হোক, এখন সব শান্ত। ওদের একত্রিত হওয়া, মউকে ফিরে পাওয়া, জঙ্গল-শেরের মৃত্যুসংবাদ পাওয়া, সব খবরই ভাল। শুধু শিকারিবাজেরই যা কোনও খবর নেই। তবে ওর সেই ঘোড়াটার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হওয়ায় শিকারির অন্তিম পরিণতি সম্বন্ধে সকলেই একটা ধারণা করতে পেরেছে। তবু আজ সারাদিন এবং আগামী কয়েকটা দিন ধরে চলবে শুধু খানাতল্লাশি আর অনুসন্ধান। কেননা শিকারির ডেডবডি খুঁজে বের করতেই হবে।

ঠাকরুনপাহাড়িতে এসে হ্রদের আকারে বয়ে যাওয়া ডুলুং-এর জলে মুখ-হাত ধুয়ে নিল সকলে।

চালাঘরের সেই দোকানটি আর নেই। তাই বড়সড় একটি মহুয়া গাছের নীচে বসে ওরা মুড়ি, তেলেভাজা ও চা খেল।

এখানেই পল্মী ও তার দলবল অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য।

শুভঙ্করের হাতে যে ক'টা টাকা ছিল, পল্মীর হাতে দিয়ে দিল। বলল, "এগুলো তোমার কাছে রাখো। এই দিয়ে একদিন তুমি তোমার বন্ধুদের নিয়ে মাংস-ভাত খেয়ে পিকনিক কোরো।"

বিল্টুও ওর কাছে যা ছিল তাই দিল।

pathagar.net

পঙ্খী তো প্রথমে কিছুতেই নেবে না। তারপর ওর বাবা গুইরাম বলতেই নিয়ে নিল।

ডুলুং-এর ওপারে দুটি জিপ ও একটি ভ্যান অপেক্ষা করছিল ওদের নিয়ে যাওয়ার জন্য।

শিবশঙ্করবাবু বিল্টু, তিন্নি, শুভঙ্কর ও মউকে নিয়ে একটি জিপে গিয়ে বসলেন।

সেইসব বন্দী ছেলেমেয়ে যারা সদ্য মুক্ত হয়েছে, তারা বসল ভ্যানের ভেতর। পুলিশের সাহায্য নিয়েই ওরা এখন যে-যার বাড়িতে ফিরে যাবে।

ভ্যান ছাড়ার দেরি ছিল। তাই ডি· এস· পি-র জিপ আগেই ছেড়ে দিল।

বিল্টুরা যাওয়ার সময় হাত নেড়ে বিদায় অভিনন্দন জানাল সকলকে। শুভঙ্কর উৎসাহের চোটে বলে উঠল, "গণপতি বাপ্পা (মোরয়া) মরিয়া।"মউ ছাড়া সবাই বলল, "বাপ্পা মরিয়া, বাপ্পা মরিয়া।"

পুলিশের জিপ পার্বত্য পথে চাকার ঘর্ষণে ঘড়ঘড় শব্দ তুলে ছুটে চলল বেলপাহাড়ির দিকে।

যেতে-যেতে শিবশঙ্করবাবু বললেন, "যাক। ক'দিনে বেশ খেলাটা তোমরা দেখালে। কবেকার কী একটা ডায়েরি পেয়ে বোকার মতো কী কাণ্ডটাই না করলে তোমরা!"

শুভঙ্করের চোখ কপালে উঠে গেল, "সর্বনাশ! ডায়েরির কথা বাপি জানলেন কী করে? তা হলে তো সোনার গণপতির কথাও জেনেছেন।"

শুভঙ্কর মউয়ের দিকে তাকাল।

মউ চোখের ভাষায় মিনতি জানিয়ে বলল, "আমিই বলেছি।"

বিল্টু আর তিন্নি শুভঙ্করকে দেখল।

শিবশঙ্করবাবু বললেন, "ওসব দুর্লভ সামগ্রী কি এতদিন থাকে? ও-জিনিস কবেই লুটে নিয়ে গেছে ডাকাতরা। কাজেই তোমরা খুঁজে সারা হয়ে গেলেও ও জিনিস পাবে না। আর মাথামোটা ডাকাতগুলো হাজার চেষ্টাতেও নাগাল পাবে না ওর। আরে বাবা, ওটা যে সত্যিই ডায়েরি, তারই বা প্রমাণ কী? এমনও তো হতে পারে ভদ্রলোকের লেখার বাতিক ছিল, উনি কোনও অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী লিখছিলেন।

মউ বলল, "না জেঠু। ও-ডায়েরি তো আপনি পড়েননি। তাই পুলিশের মুখে শুনে আপনি এ-কথা বলছেন।"

"ডায়েরিটা আছে তোমাদের কাছে?"

"আছে। আমার কাছেই আছে। আমার বাড়িতে খুব একটা গোপন জায়গায় আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি।"

"আমায় দেখিও তো মা।"

মউ বলল, "আপনাকে নিশ্চয়ই দেখাব। আপনি আশা করি আজই আমাদের বাড়ি পৌঁছে দেবেন।"

"তা তো দেবো।"

তিন্নি বলল, "আপনি গেলে আমার বাবা-মা খুব খুশি হবেন। কিন্তু বাবা যে এখন কী অবস্থায় আছেন তা কে জানে?"

pathagar.net

শুভঙ্কর বলল, "তবে বাপি, ওই শিকারিবাজের সন্ধান কিন্তু আমাদের চাই।"

মউ বলল, "আমি পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেব বলে ওর বুক চিরে রক্তপান করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলাম।"

শিবশঙ্করবাবু বললেন, "ওর সন্ধান কী করে পাবে ? এতক্ষণে হয়তো বাঘের পেটেই ঢুকে গেছে ও। কাল সারারাত বুনো হাতির উপদ্রব যা গেছে তাতেই ও শেষ হয়েছে।"

শুভঙ্কর বলল, "এই জঙ্গলে এত হাতি কোথায় যে ছিল কিছুই তো ভেবে পাচ্ছি না।"

তিন্নি বলল, "কী ভয়ানক চেহারা তাদের।"

শিবশঙ্করবাবু বললেন, "আসলে ওগুলো এখানকার হাতি নয়। এই জঙ্গলে অত হাতি থাকলে সকলেরই জানা থাকত। এগুলো বিহারের দলমা পাহাড় থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। কিছুদিন আগে এই হাতিগুলো শালবনি থানার মিরগা অঞ্চলের আগাবাড়ি জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। এদের দলে মোট ষাটটি হাতি আছে। গত বুধবার রাতে ওই হাতির দল ওখানকার ধানজমির ক্ষতি করে ঘরবাড়ি ভেঙে প্রচণ্ড তাণ্ডব চালায়। তারপর স্থানীয় লোকজন মশাল-টশাল জ্বেলে ক্যানেস্তারা বাজিয়ে ওদের তাড়া দিলে ওই হাতির দল সাতচোলে গিয়ে আশ্রয় নেয়।"

শুভঙ্কর বলল, "তুমি কী করে জানলে বাপি ?"

"এ তো সবাই জানে। এ-নিয়ে কাগজে প্রচণ্ড লেখালেখি হচ্ছে। সেখান থেকে হাতির পাল টিলপুরা, মণ্ডলকুপির, ঘুড়ি, উড়ানি, ভাউদির গ্রাম ধ্বংস করে ফসল নষ্ট করে। এইভাবে তাড়া খেতে-খেতেই এরা এখানে এসে হাজির হয়েছে।"

বেলপাহাড়ি আসতেই শিবশঙ্করবাবু জিপ দাঁড় করালেন। তারপর একটা দোকান থেকে কিছু মিষ্টি আনিয়ে খেতে দিলেন সকলকে। বললেন, "আর-একটু জলযোগ করে নাও সব। কেননা ঝাড়গ্রাম পৌঁছতে এখনও সময় লাগবে অনেক। ততক্ষণে খিদে পেয়ে যাবে।"

শুভঙ্কর বলল, "আমরা এখনই ঝাড়গ্রামে যাচ্ছি না বাপি। তার আগে শিলদায় একবার নামতে হবে। ওখানে তিন্নির দিদিমা আমাদের জন্য দারুণ চিন্তা করছেন। আমরা তাঁর সঙ্গে দেখা না করে যাব না।"

মউ বলল, "ভালই হল। তিন্নির দিদিমার ওখানেই দুপুরের খাওয়াটা সেরে নেওয়া যাবে। ও, আমি দু'জনে মিলে রান্না করে সকলকে খাওয়াব আজ।"

বিল্টু বলল, "তুমি রান্না করলে সে-রান্নায় আর মুখ দিতে হবে না কাউকে।"

শিবশঙ্করবাবু বললেন, "অনেক দেরি হয়ে যাবে না ?"

তিন্নি বলল, "হোক। আমরা খেয়েদেয়ে বাসেই যাব। আপনি জিপটাকে ছেড়ে দিন।"

জিপের ড্রাইভার বলল, "সেই ভাল। আপনারা এখানেই বিশ্রাম করুন। আমি বরং ওড়গঙ্গায় আমার এক বন্ধুর বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। এখন সকাল ন'টা। আমি বারোটা-একটা নাগাদ আসব।"

"অসুবিধে হবে না ?"

pathagar.net

"আমার ওপর নির্দেশ আছে এই জিপ আপনি যতক্ষণ ইচ্ছে ব্যবহার করতে পারবেন। কাজেই দরকার হলে আমি আপনাদের ধলভূমগড়েও পৌঁছে দিয়ে আসব।"

বেলপাহাড়ি থেকে শিলদার দূরত্ব বেশি নয়। তাই ওরা কথা বলতে-বলতেই শিলদায় পৌঁছে গেল। ওদের যথাস্থানে নামিয়ে দিয়ে ড্রাইভার সেলাম জানিয়ে চলে গেল ওড়গঙ্গায়।

শিবশঙ্করবাবু বললেন, "আমি অবশ্য এদিকে বেশ কয়েকবার এসেছি। শিলদা, বেলপাহাড়ি, মাতাজুড়ি, ভুলাভেদায়। এমনকী কাঁকড়াঝোরেও গেছি। তবে সবই ওই সরকারি কাজে। তাই ঘুরে দেখবার সময় কিছু পাইনি।"

তিন্নি বলল, "আমাদের এই শিলদা কিন্তু খুব নামকরা জায়গা।"

শুভঙ্কর বলল, "কী আছে এখানে?"

"তা জানি না। শুনেছি।"

শিবশঙ্করবাবু বললেন, "কী তুমি চাও? প্রাকৃতিক সৌন্দর্য? সেটা অবশ্য এখন আর পাবে না। তবে এক সময় ছিল। এখন এই অঞ্চলের মধ্যে শিলদা খুবই উন্নতমানের জায়গা। জমজমাট বাজার, স্কুল, কলেজ, কী নেই? আর ধর্মের দিক থেকেও মূলত এই অঞ্চলগুলো হচ্ছে শৈব-শাক্ত অঞ্চল। শিবেরই প্রাধান্য চারদিকে। এখানে-ওখানে ঘুরলে পাথরের অনেক নন্দীমূর্তি (ষাঁড়) চোখে পড়বে। এ ছাড়া আরও জেনে রাখো, এই অঞ্চল একদা জঙ্গলমহলের 'চোয়াড় বিদ্রোহের' ঘাঁটি ছিল। এর পুরনো নাম 'ঝটিবনি'। এখনও এখানে অসংখ্য মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। রাজবাড়ির গড় আছে। রানি কিশোরীমণির রাজত্বকালের (১৭৪২ শকাব্দের) একটি লিপিও আছে এক প্রাচীন মন্দিরে।"

তিন্নি বলল, "এখানে বিজয়া দশমীর দিন বড় একটা মেলা বসে। সেই মেলায় ভৈরব-ভৈরবীর মিলন হয়। ঘাটশিলায় যে রঙ্কিণী আছেন তাঁর বেদিতে বেঁদা পরব হয়। সেই বেঁদা পরবেরই সমাপ্তি হয় 'পাতাবেঁদায়'। এখানকার ওড়গঙ্গা গ্রামে। দেবী রঙ্কিণীকে ওইদিন এখানে নিয়ে আসা হয়।"

বিল্টু বলল, "ওড়গঙ্গা এখান থেকে কতদূর?"

"বেশি দূরে নয়। আমরা হেঁটেই যাই। আসলে এই উৎসবটা হচ্ছে অরণ্যবাসীদের উৎসব।"

ওরা কথা বলতে-বলতেই তিন্নির মামার বাড়িতে চলে এল।

দিদিমা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন তিন্নিকে। তিন্নি বলল, "মামারা ফিরেছে?"

"না। তবে খবর পাঠিয়েছে তোর বাবা ভাল আছে।"

তাই শুনে সে কী আনন্দ তিন্নির।

দিদিমা শিবশঙ্করবাবুকে খাতির করে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

ওরাও সকলে গেল।

শুভঙ্কর চুপিচুপি ওর বাবাকে বলল, "এদের অবস্থা ভাল নয় বাপি। তুমি কিছু টাকা দাও। দোকান-বাজার করতে হবে তো।"

শিবশঙ্করবাবু বললেন, "বেশ তো। খুব ভাল কথা। দিদিমার কাছ থেকে একটা থলি-টলি নে। তারপর চল আমরা সবাই মিলে হইহই করে

pathagar.net

দোকান-বাজার করে আনি।"

বিল্টু, শুভঙ্কর দু'জনেই লাফিয়ে উঠল।

এই মুহূর্তে শিবশঙ্করবাবুকে দেখলে কে বলবে যে, তিনি একজন অতবড় পুলিশ অফিসার।

বাজারের থলি নিয়ে বিল্টু, শুভঙ্কর ও শিবশঙ্করবাবু চলে যেতেই তিন্নি ছুটে গিয়ে দিদিমার ঠাকুরঘরে ঢুকে দেখে নিল সোনার গণপতি যথাস্থানে আছেন কি না। গিয়ে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে মউয়ের গলা জড়িয়ে বলল, "এতক্ষণ বলিনি। এইবার তোকে একটা সুখবর দিই। আমাদের অভিযান ব্যর্থ হয়নি।"

"কেন ? আমরা সবাই প্রাণে বেঁচে ফিরে এসেছি বলে ? আমরা ব্যর্থই। যে গণপতির জন্য এত কাণ্ড, সেই গণপতি তো উদ্ধার করতে পারলাম না। আর আমার প্রতিজ্ঞাপূরণও হল না। শিকারির বুক চিরে রক্তপান না করা পর্যন্ত আমার শান্তি হবে না।"

"তোর শেষের ইচ্ছেটা পূরণ হবে না কোনওদিনই। কেননা শিকারি এখন বাঘের শিকার। তবে সোনার গণপতি কিন্তু আমাদের হাতে।"

আনন্দের উচ্ছ্বাসে লাফিয়ে উঠল মউ, "তিন্নি! কী বলছিস তুই ? নিজের কানকেও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে!"

"সত্যিই বলছি রে। সোনার গণপতিকে আমরা এক রোমাঞ্চকর পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে উদ্ধার করেছি।"

"কীভাবে ?"

"সেসব কথা বলতে সময় লাগবে। দুর্যোগ কেটে গেছে। আজ রাতে আমরা দুই বন্ধুতে গল্প করব। আজই তো আমরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। তবে এ-কথা জেঠু যেন না জানতে পারেন। শুভদা আমাকে মানা করে দিয়েছেন বলতে।"

"কিন্তু ওটা এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার সময় তো উনি জানতে পারবেন।"

"না। ওটাকে ভাল করে কলার পেটো দিয়ে মুড়ে রেখেছি। তা ছাড়া একটা ব্যাগের ভেতর ওটাকে এমনভাবে নেব যে, উনি বুঝতে পারবেন না।"

"ওটা এখন তা হলে কার জিম্মায় থাকবে ?"

"আমার তো খুব ইচ্ছে গণপতিকে আমার কাছেই রাখি। দেখি বিল্টুদা কী বলে। গণপতির আসল মালিক তো বিল্টুদাই।"

ওরা যখন এইসব আলোচনা করছে, শিবশঙ্করবাবু তখন বিল্টু ও শুভঙ্করকে নিয়ে বাজার থেকে ফিরে এসেছেন। বাজারের সঙ্গে কী বড় একটা মাছও কিনে এনেছেন। দেখে খুব আনন্দ হল। শুধু তাই নয়। শিবশঙ্করবাবু বাজার থেকে এমন এক মহিলাকেও ধরে এনেছেন, যাকে দিয়ে মাছ কোটানো, বটনা বাটানো, জল তোলানো, এমনকী রান্নার কাজও করানো হবে।

তাই রীতিমত পিকনিকের মেজাজ ফুটে উঠল দিদিমার বাড়িতে। রান্নার কাজে অবশ্য তিন্নি আর মউ খুবই সহযোগিতা করল।

তারপর দুপুরের খাওয়াদাওয়া শেষ হলে সামান্য একটু বিশ্রাম নিতে না নিতেই জিপ এসে হাজির হল। ইতিমধ্যে ওদের গোপন আলোচনায় স্থির হল সোনার গণপতি আর ধলভূমগড়ে নয়, এখন থেকে শুভঙ্করের কাছেই থাকবে। কেননা ওই অমূল্য সম্পদ লুকিয়ে রাখার পক্ষে ওদের বাড়ির চেয়ে নিরাপদ

pathagar.net

জায়গা আর কোথাও নেই। শুভঙ্করের নিজস্ব ঘর আছে। সেই ঘরেরই কোনও গুপ্ত স্থানে ও সযত্নে ওটাকে লুকিয়ে রাখবে। এবং বিল্টু,শুভঙ্কর দু'জনেই ওটার রক্ষণাবেক্ষণ করবে।

জিপের হর্ন শুনে তৈরি হয়ে নিল ওরা। শিবশঙ্করবাবু তিন্নি ও মউকে ধলভূমগড়ে পৌঁছে দিয়েই ডাউন ইস্পাত এক্সপ্রেসে হাওড়ায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কেননা বাড়িতে শুভর মা এবং ঠাকুমা দারুণ ভাবনাচিন্তা করছেন।

তিন্নির দিদিমা আবার এসে নাতনিকে বুকে নিয়ে শুরু করলেন কান্নাকাটি। ওরা সকলে দিদিমাকে প্রণাম করে একটা ঝোলা ব্যাগে গণপতি নিয়ে জিপে উঠে বসল। শিলদার রাঙা মাটির বুকে ধুলোর ঝড় উড়িয়ে পুলিশের জিপ এগিয়ে চলল ধলভূমগড়ের দিকে।

॥ ১৪ ॥

এর পর বেশ কয়েকটা মাস কেটে গেছে। সোনার গণপতি এখন বহাল তবিয়তেই লুকিয়ে আছেন শুভঙ্করের শোবার ঘরে। অতি সযতনে শুভঙ্কর তাকে এমনভাবে লুকিয়ে রেখেছে যে, টেরই পায়নি কেউ। অবশ্য টের পাওয়ার মতো আছেটাই বা কে? মা-ঠাকুরমা নীচের ঘরে থাকেন। বাবা থাকেন কর্মস্থলে। তাই গণপতির বৃত্তান্ত একমাত্র বিল্টু ছাড়া আর কেউ জানে না।

বিল্টু রোজই আসে শুভঙ্করের সঙ্গে দেখা করতে। ও এলে গণপতিকে লুকনো জায়গা থেকে বের করে শুভঙ্কর। তারপর লুকিয়ে নিয়ে আসা ফুলের মালা পরায়। ধূপ জ্বালে। ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে প্রার্থনা করে। ওরা বলে, "হে গণপতি! আমাদের মানসযাত্রা যেন সার্থক হয়। শুধু তুমি, তোমারই কাজে যাওয়ার জন্য এই উপায়টুকু করে দাও। ওই দূর তীর্থে যাওয়ার মতো আর্থিক সঙ্গতি আমাদের নেই। তুমি দয়া না করলে আমাদের এই অভিযান ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

সোনার গণপতি কথা বলতে পারেন না। তাই হিরের চোখে জ্বল-জ্বল করে চেয়ে থাকেন। এই অপরূপ সুন্দর সুঠাম শরীরের শিল্পকর্মটি কে যে করেছিলেন তা কে জানে? শুভঙ্কর ও বিল্টু অপলকে সেইদিকে চেয়ে থাকে। বারবার দেখেও যেন আশ মেটে না।

আর্থিক সঙ্গতি না থাকলেও ওরা দু'জনেই প্রচণ্ড আশাবাদী। তাই হাল ছাড়ে না। এই সমস্ত পথের বর্ণনামূলক যত রাজ্যের বই এনে পড়ে দু'জনে। পড়তে-পড়তে সেই কল্পনার জগৎ ওদের চোখের সামনে ছায়াছবির মতো ভেসে ওঠে। গাইডবুকের প্রতিটি নির্দেশিকাই ওদের মনের মধ্যে গেঁথে যায়।

ইতিমধ্যে গণপতির কৃপায় কেন কে জানে বিল্টুর বাবারও মনের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ওর জ্যাঠামশাই, যিনি অসমে থাকেন, তিনি মারা গেছেন। ওই বাড়ি বিক্রির মতলব ত্যাগ করেছেন ওর বাবা।

তিন্নির বাবাও হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছেন ঘরে। আর তিন্নি রোজ রাতেই প্রায় স্বপ্ন দ্যাখে গণপতিকে। ও দ্যাখে, চারদিকে বরফের পাহাড়,

তারই মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে একটি নদী। সেই নদীতে রুপোর নৌকোয় সোনার গণপতি মাঝি হয়ে দাঁড় বাইছেন। আর পত্রহীন গাছগুলি ফুলভারে নত হয়ে ঝুঁকে আছে নদীর বুকে। সোনার গণপতির মাথায়, তিন্নির মাথায়, টুপটাপ করে সেই গাছ থেকে একটি-দুটি করে ফুল ঝরে পড়ছে। তিন্নির বুক এক স্বর্গীয় সুখে ভরে ওঠে। কখনও ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। স্বপ্নের জাল ছিঁড়ে যায়। মা বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরেন মেয়েকে, "কী হল! কী হল তিন্নি!"

তিন্নি বলে, "কই, কিছু না তো।"

"কী জানি মা। আজ কিছুদিন ধরেই দেখছি তুই যেন কেমন হয়ে গেছিস।"

"আমি রোজ রাত্রে একটা স্বপ্ন দেখি মা।"

"কী স্বপ্ন?"

তিন্নি উত্তর না দিয়ে মায়ের বুকে মুখ লুকোয়। মা মেয়েকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে শঙ্কা-শিহরে ভরে ওঠেন।

ওদিকে মউয়ের বাড়ির পরিস্থিতিও এখন স্বাভাবিক। দুর্যোগের মেঘ হঠাৎই যেমন দেখা দিয়েছিল, তেমনই হঠাৎ করেই কেটে গেছে। ওর মা-ও তাই একমাত্র মেয়েটিকে অবলম্বন করে স্বামীর শোক ভুলে নতুন উদ্যমে ব্রতী হয়েছেন জীবনধারণের কাজে। স্বামীর পেনশনের সামান্য টাকার ওপর নির্ভর না করে কিছু ছেলেমেয়ে পড়িয়ে এবং সেলাই-বোনার কাজ শিখিয়ে মোটামুটি ভাবে দিন গুজরান করছেন। মউয়ের চঞ্চলতাও এখন কেটে গেছে অনেক। আর সে চঞ্চলা তটিনীর মতো উচ্ছল হয়ে ধলভূমগড়ের উপলভূমিতে কলকল করে না। নিত্য নতুন পোশাক পরে চোখে চশমা লাগিয়ে সাইকেল চেপে তোলপাড় করে না দূরের বনভূমি। সে এখন শান্ত, ধীর। বিল্টু ও শুভঙ্করের সঙ্গ ওর ভাল লেগেছে। কতবড় লোকের ছেলে শুভঙ্কর। ওর বাবা কতবড় পুলিশ অফিসার। অথচ কোনও অহঙ্কার নেই। দেমাক নেই। শুভঙ্করের আবির্ভাব ওর মনের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ও শুধু স্বপ্ন দ্যাখে, কবে সেই দুর্বার অভিযানের ডাক এসে পৌঁছবে। ওরা কী সত্যিই পারবে যেতে? সে যে অনেক দূরের পথ। অনেক, অনেক টাকার ব্যাপার। তবু আশায়-আশায় দিন গোনে। পিওনের পদধ্বনি শুনে দৌড়ে যায়। মাঝেমধ্যে চিঠি দেয় বিল্টু, শুভঙ্করকে। সাঙ্কেতিক চিঠি। তার ভেতর দিয়েই জানতে চায় ওরা মানসযাত্রার পরিকল্পনা কতদূর এগোল। ওরাও প্রত্যুত্তর দেয়, সময় হলেই ডাক পাবে। সেই দিনের জন্য তৈরি থেকো।

এদিকে সোনার গণপতিকে নিয়ে মানসযাত্রার কোনও পরিকল্পনাই যখন বাস্তবায়িত হচ্ছিল না তখন হঠাৎই একদিন ভাগ্যের আকাশটা ফর্সা হয়ে গেল। বিল্টু আর শুভঙ্কর ঘুরতে-ঘুরতে সেদিন উদ্দেশ্যবিহীন ভাবেই শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে এসে হাজির হল। একটি গাছতলায় ঘাসের ওপর বসে বাদামের খোসা ছাড়িয়ে খাচ্ছে এমন সময় দেখা হয়ে গেল ওদেরই এক পুরনো বন্ধু শ্যামসুন্দর মালানির সঙ্গে। অবাঙালি হলেও ওরা এমন চমৎকার বাংলা বলত যে, কেউ না জানলে বুঝতেই পারত না ওরা অবাঙালি। ওর বাবা আর· সি· মালানি ছিলেন অত্যন্ত ভালমানুষ। কিছুদিন শুভঙ্করদের পাড়ায় বাস করেছিলেন। তারপর বড়বাজারের দিকে উঠে যান। তা সেই সময়েই শ্যামের

pathagar.net

সঙ্গে ওদের বন্ধুত্ব।

এই শ্যাম ছেলেটি ছিল বরাবরই খামখেয়ালি। হয়তো এখনও। সবাই বলত, ওর মাথায় ছিট আছে। তা যাই থাকুক না কেন, বেশ সুন্দর সুঠাম চেহারার ছেলে। দেখলে ভাল লাগে। একসময় বেশ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এখন পাড়া ছেড়ে চলে যাওয়ায় যোগাযোগটা ছিন্ন হয়েছে। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। কত আর বয়স, চোদ্দ কি পনেরো। কিন্তু এই বয়সেই ও বাড়ি থেকে পালিয়ে নানা দেশ ঘুরে তাক লাগিয়ে দিয়েছে সকলকে। অগাধ পয়সা ওদের। দুটি সিনেমা হল, একটি কারখানা ছাড়াও বড়বাজারের পগেয়া পট্টিতে কীসবের যেন ব্যবসা আছে ওদের। তা শ্যামের কাজই ছিল হাতে কিছু টাকাপয়সা এসে পড়লে কাউকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ একদিন উধাও হয়ে যাওয়া। যাওয়ার সময় অবশ্য একটা চিঠিও রেখে যেত—"আমার জন্য দুঃখ কোরো না। এক বন্ধুর সঙ্গে পুরী যাচ্ছি। হপ্তাখানেকের মধ্যেই ফিরব।" ওর মা-বাবা জানেন, এক হপ্তা কেন এক মাসের মধ্যেও এ-ছেলে ফিরবে না। তবে না ফিরলেও ছেলের রেজিস্ট্রি করা চিঠি অবশ্য একটা আসবেই কিছুদিনের মধ্যে— নাগপুর অথবা কানপুর থেকে। তাতে লেখা থাকবে—"শিগগির নীচের ঠিকানায় কিছু টাকা পাঠাও। না হলে খেতে পাব না। টাকা পেলেই ঘরে ফিরব।" বাবা টাকা পাঠাবেন কিন্তু ছেলের ঘরে ফেরবার আশা করবেন না। কেননা তিনি জানেন এবারে চিঠি আসবে বোম্বাই কিংবা কাশ্মির থেকে। তা এই হল শ্যাম। শ্যামসুন্দর মালানি। পলাতক, ভবঘুরে। অথচ ছেলের মতো একটি ছেলে।

শ্যামকে দেখেই তো বিল্টু ও শুভঙ্কর লাফিয়ে উঠল আনন্দে।

শ্যামও ওদের দেখতে পেয়ে কাছে এল। তারপর ধপ করে বসে পড়ল ওদের পাশেই, ঘাসের ওপর।

শুভঙ্কর বলল, "কী ব্যাপার! খবর কী তোমার? ঘোরা-টোরা কেমন চলছে?"

শ্যাম বলল, "এই তো কিছুদিন হল কালাপানি থেকে আসছি।"

"কালাপানি মানে? আন্দামান?"

"আরে না, না। লিপুলেখ, গারবিয়াং, কালাপানি। নাম শোনোনি?"

"শুনিনি মানে? পড়ে-পড়ে মুখস্থ হয়ে গেছে নামগুলো। তা ওদিকে কী করতে গিয়েছিলে?"

"কী করতে আবার। এমনিই বেড়াতে। আসলে টারগেট ছিল শোর উপত্যকায় পিথোরাগড় যাওয়ার। তা যেতে-যেতেই মতলব পালটে গেল।"

শুভঙ্কর করুণ চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আমাদেরও খুব ইচ্ছে করে। মনে হয় তোমার মতো একদিন সব কিছু ছেড়ে চলে যাই।"

"তা যাও না। কে আর বাধা দিচ্ছে তোমাদের?"

"পারি না। কোনও উপায় যে নেই।"

"ওসব বাজে কথা। ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। আসলে তোমরা হচ্ছ কুয়োর ব্যাঙ। এই কুয়ো ছেড়ে বেরোবে না কোথাও।"

বিল্টু বলল, "তা নয়। আমরা তো তোমার মতো নিরুদ্দেশ হয়ে কখনও বেরোইনি। তবে তুমি যদি আমাদের একটু পথ-ঘাটের হদিস বলে দাও তো

pathagar.net

চেষ্টা করে দেখতে পারি।"

বিল্টু শুভঙ্করের দিকে আড়চোখে একবার তাকাল।

শুভঙ্করও তাকাল বিল্টুর দিকে।

শ্যাম বলল, "পথের হদিস বলে দিলেই কি যেতে পারবে তোমরা ? আমার তো ধারণা হাওড়ার পাশে লিলুয়া নামে একটা যে স্টেশন আছে, তাও বোধ হয় তোমরা জানো না। আর দূরপাল্লার রেলগাড়ি যে কীরকম তাও কখনও দ্যাখোনি।"

শুভঙ্কর বলল, "তোমার ধারণা যথার্থই। তবে কিনা এই কিছুদিন আগে আমরা ইস্পাত এক্সপ্রেসে চেপে ধলভূমগড় থেকে ঘুরে এসেছি। তা ছাড়া সত্যি বলতে কি, তুমি যে-পথে গিয়েছিলে এবার ওই পথেই একটা বিশেষ কাজে যেতে হবে আমাদের। এবং তুমি যেভাবে যাও, ঠিক সেইভাবে। বাড়ি থেকে পালিয়ে।"

শুভঙ্করের কথায় চমকে উঠল শ্যাম। বলল, "বলো কী ! এমন কী কাজ রে ভাই যে, একেবারে পালিয়েই যেতে হবে। আমার কথাটা ছেড়ে দাও। আমি হচ্ছি ভবঘুরে বাউণ্ডুলে। কিন্তু তুমি হলে একজন নামকরা পুলিশ অফিসারের ছেলে। তোমার তো পালানোও বিপদ। হাওয়ায় খবর চলে যাবে। আর ট্রেনের কামরায় পা রাখবার আগেই ধরা পড়ে যাবে।"

শুভঙ্কর বলল, "সে-কথা ঠিক। তবু যেতে হবে। তার কারণ বিল্টুর দাদামশাইয়ের ইচ্ছানুসারে তাঁর কয়েকটি ব্যক্তিগত এবং মূল্যবান সামগ্রী আমরা রাবণ হ্রদে ফেলতে যাব। বিল্টুরই যাওয়ার কথা। কিন্তু আমি ওকে একা কী করে ছাড়ি বলো ?"

"সেটা তো ওর বাবাই করতে পারেন ?"

"উনি যাবেন না।"

"তাই নাকি ? ভাল কথা। তোমরা দু'জনেই যাচ্ছ, না আর কেউ যেতে পারে ?"

"হয়তো আমাদের সঙ্গে আরও দু'জন বন্ধু যাবে।"

শ্যাম একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "তা হলে কবে যাচ্ছ তোমরা ?"

শুভঙ্কর বলল, "তা কী করে বলব ! আগে পথঘাট জানি। টাকাপয়সা জোগাড় করি, তবে তো।"

শ্যাম হোহো করে হেসে বলল, "টাকাপয়সারই জোগাড় হয়নি তোমাদের আর তোমরা কিনা তিব্বতে যাওয়ার পরিকল্পনা করছ ? হাসালে ভাই।"

বিল্টু বলল, "আমরা কি তোমার মতো বড়লোকের ছেলে ? তবে এটা আমাদের বাসনা। সম্ভব হলে যাব। না হলে যাব না।"

"কী করে সম্ভব হবে ? কত টাকা লাগবে জানো ? ও তোমরা কিছুতেই জোগাড় করতে পারবে না।"

বিল্টু-শুভঙ্কর একসঙ্গে বলল, "কত টাকা !"

"আমি যেভাবে যাই, সেভাবে গেলে দশ হাজার টাকা। তা না হলে পাঁচ হাজার। দু'জনে গেলে ডবল। চারজনে গেলে তারও বেশি। মোট কথা বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা পকেটে নিয়ে তবেই ঘর থেকে বেরোতে হবে

pathagar.net

তোমাদের।"

বিল্টু-শুভঙ্করের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। ওরা বলল, "তা হলে আর হল না।" বলে বলল, "চলো, এবার ফেরা যাক।"

ওরা উঠে পড়ল। তারপর শ্যামের সঙ্গে গল্প করতে-করতে এগিয়ে চলল সেই বিখ্যাত বটগাছগুলোর দিকে। ওইখানেই একটি দোকানের কাছে গিয়ে শ্যাম বলল, "এনি কোল্ড ড্রিঙ্কস?"

বিল্টু বলল, "খাওয়ালে খেতে পারি। মন্দ কী!"

শুভঙ্কর বলল, "তুমি ভাগ্যবান ছেলে ভাই। তোমাকে দেখলেও আনন্দ। এই বয়সে কত দেশ ঘুরে নিলে। অথচ আমাদের ছোট্ট একটু স্বপ্ন, তাও সফল হতে চায় না।"

কোল্ড ড্রিঙ্কস খেতে-খেতেই শ্যাম বলল, "কয়েক মাস আগেও যদি তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা হত তা হলে কোনও ভাবনাই থাকত না। তোমাদের ওই জিনিসগুলো আমিই রাবণ হ্রদে ফেলে দিয়ে আসতাম। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। অনেক দেরি হয়ে গেছে।"

"সবই কপাল ভাই। আমরা কি জানতাম যে, তুমি যাবে। তা হলে তো আমরাই গিয়ে দেখা করতাম তোমার সঙ্গে। তা ছাড়া যখন তুমি আমাদের পাড়ায় ছিলে তখন চোখের সামনে থেকেও কেউ টের পেতাম না কবে কখন কোথায় তুমি যাচ্ছ কি না-যাচ্ছ। এখনই বা জানতাম কী করে?"

শুভঙ্করের কথায় হোহো করে হেসে উঠল শ্যাম। তারপর কিছুক্ষণ একটু গম্ভীর হয়ে থেকে একসময় বলল, "তোমরা কি সত্যিই যাবে?"

"ইচ্ছে তো আছে। কিন্তু অত টাকা কোথায় পাব আমরা?"

"টাকার কথা পরে চিন্তা করবে। ইচ্ছে যদি থাকে উপায় তা হলে হবেই। এখন বলো, যাবে কি না?"

"যাব।"

"সাব্বাশ। একটা কথা সব সময়ে জেনে রাখবে, মন টানলেই ধন হয়। এই যে সাধু-সন্ন্যাসীরা একটি ফুটো কড়িও সঙ্গে না রেখে কীরকম দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ট্যাঁকে টাকা নেই বলে কি কোথাও যাওয়া আটকাচ্ছে ওঁদের?"

"কিন্তু আমরা কি ওইভাবে যেতে পারব ভাই? ওইভাবে যেতে গেলে যে অর্ধেক জীবন জেলেই কাটাতে হবে আমাদের।"

"আরে ওটা একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরলাম আমি। তোমরা ওইভাবে যাবে কেন? তোমরা তোমাদের মতো করেই যাবে।"

"টাকা কোথায় পাব?"

"টাকার ব্যবস্থা আমিই করে দেব। তবে একটা কথা, টাকা পাওয়ার পর যেন কোনও অজুহাত দেখিয়ে বলে বোসো না যে, যেতে পারবে না। তা হলে কিন্তু বন্ধু-বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। আর টাকাও আমি ফিরিয়ে নেব। কোনওরকম দু'নম্বরি

pathagar.net

ব্যাপার চলবে না আমার সঙ্গে।"

বিল্টু-শুভঙ্কর যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়ে গেল। বলল, "কী বলছ কী ? তাই কখনও পারি ? আমরা কবে থেকে হাঁ করে বসে আছি। আর তুমি বলছ কিনা যদি না-যাই ? সত্যি, কী বলে যে ধন্যবাদ দেব তোমায়।"

শ্যাম হাসল। বলল, "ধন্যবাদ দাও আর নাই দাও, টাকার ব্যবস্থা যখন আমি করে দেব বলেছি তখন নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।"

"কিন্তু অত টাকা তুমি কীভাবে জোগাড় করবে শ্যাম ?"

"ডাকাতি করব। আমি অনেকদিন ধরে একটা মওকা খুঁজছিলাম। কিন্তু কিছুতেই সুবিধে করতে পারছিলাম না। এইবার মনে হচ্ছে সেটা সাকসেসফুল হবে। তবে কারবারের শুরুতেই কিন্তু বলে দিচ্ছি যা পাব তার হাফ-হাফ শেয়ার।"

যেটুকু আশার আলো দেখা দিয়েছিল মনের কোণে, সেটুকুও নিভে গেল নিমেষের মধ্যে। শুভঙ্করের মুখটা কালো হয়ে গেল। বলল, "দ্যাখো ভাই ! তুমি বোধ হয় আমাদের চিনতে ভুল করেছ। সেইজন্যই ওইরকম একটা প্রস্তাব করতে পারলে। আমাদের টাকার দরকার নেই। কোনওরকম খারাপ কাজ আমরা করতে চাই না।"

শ্যাম বলল, "কী আশ্চর্য ! তোমরা চটে গেলে কেন ? খারাপ কাজ করতে চাও না সেটা খুব ভাল কথা। কিন্তু ভাল কাজটা তো করতে পারো ? তাতে টাকাও অনেক। সে-টাকার ভাগও দিতে হবে না কাউকে।"

শুভঙ্কর বলল, "তোমার ভাল কাজটা কী শুনি ?"

"কাজটা আমার নয়, তোমাদের। তোমরা এক কাজ করো, দু'জনেই একটা করে লটারির টিকিট কাটো। ফার্স্ট প্রাইজ যদি লাগে তা হলে যাওয়া তোমাদের আটকায় কে ?"

বিল্টু বলল, "এ-পর্যন্ত আমরা বোধ হয় পঞ্চাশটা টিকিট কেটেছি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। কাগজ মিলিয়ে দেখি সব ফক্কা। ধারেকাছেও যায়নি একটা টিকিট।"

"তা হলেই বোঝো। সোজা রাস্তায় চললে ভগবানও মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকেন। কিন্তু আমার হাতে যদি হাত মেলাও তা হলে দেখবে মা লক্ষ্মী একেবারে কোলে উঠে বসেছেন।"

শুভঙ্কর বলল, "কিন্তু ভাই, আমাকে তোমার সঙ্গে হাত মেলাতে গেলে সব সময় চিন্তা করতে হবে আমি একজন ডি· এস· পি-র ছেলে।"

"তা বটে। তবে আমি তো একজন বিজনেসম্যানের ছেলে। তাই ওইসব অসার চিন্তা আমার মাথায় আসে না। তোমার বাবা সামান্য দু-চার হাজার টাকার সরকারি কাজ করেন। আর আমার বাবা লাখ-লাখ টাকা ইনকাম-ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে কালো টাকার পাহাড় গড়েন। আমাদের গদি-ভর্তি টাকা।"

শুভঙ্কর বলল, "ওগুলো টাকা নয়। কালো পাপ। ও বেশিদিন থাকবে না।"

"ঠিক বলেছ ভাই। তোমার দেখছি অল্প বয়সেই তত্ত্বজ্ঞান এসে গেছে। তা আমাকে একটু বুঝিয়ে দাও দেখি, শ্রীকৃষ্ণ তো শুনেছি ভগবান ছিলেন। তাঁর রাজকোষের টাকাগুলোও কি কালো টাকা ছিল ? না-হলে তাঁর যদুবংশই বা

ধ্বংস হল কেন আর দ্বারকার রাজ-ঐশ্বর্যই বা ধুলোয় লুটোল কী করে ?"

শুভঙ্কর চুপ।

শ্যাম বলল, "বন্ধু হে ! এ-জগতে পাপ-পুণ্য কিছুই থাকে না। কাজেই ওইসব ভেবে মনকে দুর্বল কোরো না। যা বলছি তাই করো।"

শুভঙ্কর বলল, "তোমার যুক্তি তোমারই থাক। তোমরা আরও বড়লোক হও। আমরা আসি।"

শ্যাম বলল, "আরে ছো-ছো। আমরা আবার বড়লোক কবে থেকে হলুম ? আমি তো জানি রামমোহন, বিদ্যাসাগর—এঁরাই হলেন বড়লোক। আমরা হচ্ছি ধনী লোক। বুদ্ধির প্যাঁচে মেহনত করে মা লক্ষ্মীকে হাতের মুঠোয় ধরেছি।"

শুভঙ্কর আর বিল্টু কোনও কথা না বলে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল।

শ্যাম বলল, "যাচ্ছ যাও। তবে আমার প্রস্তাবটা নিলে পারতে। এতে তোমাদেরও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হত। আমারও লাভ হত। ঠিক আছে। আমি তা হলে অন্য পথ দেখি।"

বিল্টু এবার থমকে দাঁড়িয়ে কঠিন গলায় বলল, "আমি রাজি। আমার জীবন দিয়েও যদি আমি এ-কাজ করতে পারি, তা হলে কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না।"

শ্যাম বলল, "আরে জীবনই যদি দাও তা হলে আর মানস-যাত্রায় যাবে কী করে ? না,না, অত ঝুঁকি নিতে হবে না। তোমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে দিনে ডাকাতি। কী বলি আগে শোনো, তারপর হ্যাঁ-না করবে।"

শুভঙ্কর বলল, "বেশ, বলো তবে শুনি। প্রস্তাবটা যদি মনে ধরে তা হলে একবার চেষ্টা করে দেখব।"

ওরা আবার এসে একটু নির্জনে বসল।

শ্যাম বলল, "শোনো, তোমাদের মতো আমারও টাকার খুব প্রয়োজন। কিন্তু সেই টাকা কী করে পাওয়া যায় তা নিয়ে ভাবনার আর অন্ত ছিল না। অনেক ভেবেচিন্তে যখন একটা মতলব ঠিক করলাম ঠিক সেই সময়েই তোমরা এলে।"

বিল্টু বলল, "তোমার বাবার তো অনেক টাকা। তবু তোমার টাকার চিন্তা ? তোমার বাবার কাছে চাইলেই তো পারো।"

"সব জিনিস চেয়ে পাওয়া যায় না ভাই। তা ছাড়া এ দু-পাঁচ হাজারের ব্যাপার নয়। বিশ-পঁচিশ বা তারও বেশি টাকার দরকার। অত টাকা বাবা আমাকে কিছুতেই দেবেন না।"

"কিন্তু তুমি অত টাকা নিয়ে কী করবে ?"

"বিলেত যাব।"

"বিলেত যাবে ?"

"হ্যাঁ। এক ট্র্যাভেল এজেন্সির সঙ্গে আমি কথা বলে সব ঠিক করে ফেলেছি। টাকাটা পেলেই রওনা দেব আমি। আর এও বলে রাখছি, একবার যদি যেতে পারি তা হলে এই পোড়া দেশে আর ফিরছি না।"

শুভঙ্কর হেসে বলল, "ফেরা না-ফেরাটা কি মনে করেছ তোমার হাতে ?"

"আলবত। অন্যের সঙ্গে আমার তুলনা কোরো না। আমি যদি মনে করি ফিরব না, তা হলে পৃথিবীর কোনও দেশে এমন কেউ নেই যে, আমার ইচ্ছের

pathagar.net

বিরুদ্ধে আমাকে ফেরত পাঠায়।"

শুভঙ্কর বুঝল এ পাগলের সঙ্গে বৃথা বাক্যব্যয় করে লাভ নেই। তবু বলল, "দেখো শ্যাম! তুমি তোমার মা-বাবার একমাত্র সন্তান। অগাধ সম্পত্তি তোমার। এসব তুমি ভোগ করো। তুমি কেন এইভাবে বিদেশে-বিভুঁইয়ে বেঘোরে মরতে চলেছ?"

"দেখো, আমি যা মনে করেছি তা আমি করবই। তা ছাড়াও আর-একটা কাজ করব আমি।"

"কী কাজ?"

"ফজিরবাজারের পানওলা পঞ্চাদার কথা তোমার মনে আছে?"

"হ্যাঁ।"

"সেই পঞ্চাদা কিছুদিন আগে অভাবের তাড়নায়..."

"সে কী!"

"তাঁর একমাত্র মেয়ে কালী।"

"মনে আছে বইকী। অত কালো মেয়ে আমি কখনও দেখিনি।"

"ও এখন লোকের বাড়ি কাজ করছে। ওর কষ্ট যদি দ্যাখো তো চোখে জল এসে যাবে তোমার। আমি ওর বিয়ে দেব।"

"কী পাগল তুমি। কালী তো একেবারে বাচ্চা মেয়ে। দশ-বারো বছর বয়স মাত্র। কে বিয়ে করবে ওকে?"

"কে করবে তা জানি না। তবে ওর জন্য আমাকে কিছু করতেই হবে। ভাবতে পারো ওইটুকু একটা মেয়ে দু'মুঠো ভাতের জন্য লোকের বাড়ি বাসন মাজছে। এ-দৃশ্য দেখা যায়?"

"না। দেখা যায় না। কিন্তু এইরকম দুর্ভাগ্য নিয়ে তো অনেকেই জন্মাচ্ছে। কত মেয়ের দুঃখ দূর করবে তুমি?"

"কালীকে আমি অত্যন্ত স্নেহ করি।"

"আমরাও করি। তা ওকে তুমি তোমাদের বাড়িতেই নিয়ে গিয়ে রাখো না কেন?"

"আমি নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমার বাবা ওকে রাখতে রাজি হননি।"

"এটা অবশ্য উনি ঠিক করেননি।"

"তাই বলি কি শোনো, এই টাকাগুলো আমার বাবার কাছ থেকেই আদায় করতে হবে। কালীর বিয়ের টাকা, আমার বিলেত যাওয়ার খরচ, তোমাদের মানস-যাত্রার সমস্ত খরচ-খরচা,সব আদায় করতে হবে। ওই টাকার সমুদ্র থেকে কৌশলে এক ঘটি ডুবিয়ে নিতে পারলেই দেখবে সকল মুশকিলের আসান হয়ে গেছে।"

বিল্টু বলল, "কিন্তু অত টাকা কীভাবে আদায় করবে সে-নিয়ে কোনও ভাবনা-চিন্তা করেছ?"

"করেছি বইকী। আজ আমি বাড়ি ফিরব না। তোমাদের দু'জনের যার হোক বাড়িতে আমি থাকব। নাটকটা এমন হবে যেন আমি গুম হয়েছি। তোমরা আমার মুক্তির বিনিময়ে আমার বাবার কাছ থেকে এক লাখ টাকা মুক্তিপণ চাইবে। ছেলের জীবনের বিনিময়ে সে-টাকা বাবা দেবেনই। ব্যস। টাকা

pathagar.net

পেলেই কেল্লা ফতে। সকলের স্বার্থই সিদ্ধ হবে।"

"কিন্তু তোমার বাবা যদি টাকা দেওয়ার বদলে পুলিশে খবর দেন?"

"আমার বাবা পুলিশ এবং ইনকাম ট্যাক্সের অফিসারদের অত্যন্ত ঘৃণা করেন।"

"কিন্তু তিনি তো আমাদের চেনেন। টাকা নিতে গিয়ে ধরা পড়ে যাই যদি?"

"আরে ধ্যাত। তোমাদের দ্বারা কিচ্ছু হবে না। টাকা যেখানে নিয়ে আসবেন বাবা, তোমরা সেখানে আড়ালে কোথাও লুকিয়ে থাকবে। আমি কাঁদতে-কাঁদতে বাবার হাত থেকে টাকার থলিটা নিয়ে এসে তোমাদের হাতে তুলে দেব। আর তোমরা গা-ঢাকা দেবে। পরে আমি তোমাদের হাতে হাত মিলিয়ে আমার ভাগটা নিয়ে যাব।"

শুভঙ্কর বলল, "শয়তান ছেলে। এত অধঃপতন হয়েছে তোমার? শেষকালে কিনা তুমি তোমার বাবাকে ব্ল্যাকমেল করতে চলেছ?"

শ্যাম বলল, "কী আশ্চর্য! এ ছাড়া অন্য কোনও পথ তো খোলা নেই। বাবার সম্পত্তি মানে আমারই সম্পত্তি। অন্যের ঘরে গিয়ে সিন্দুক ভাঙার চেয়ে নিজের ঘরে ডাকাতি করা ভাল নয় কি?"

শুভঙ্কর বলল, "এ অন্যায়। যা ভাল বোঝ তোমরা দু'জনে কোরো। আমাকে এর মধ্যে জড়িও না।"

বিল্টু বলল, "এই সুযোগ আমি কিন্তু কাজে লাগাতে ছাড়ব না। তার কারণ, আমার লক্ষ্যে আমাকে পৌঁছতেই হবে।"

শ্যাম বলল, "আপাতত শুভঙ্করদের বাড়িতেই যাওয়া যাক। ওদের তো ফোন আছে। ওদের বাড়ি থেকেই ফোনে কাজ হবে।"

এই ব্যাপারটায় শুভঙ্করের অন্তরে সায় না দিলেও ওদের দু'জনকেই বাড়িতে নিয়ে এল ও।

আসা মাত্রই কাজ। শ্যাম ওদের বাড়ির টেলিফোন নম্বরটা একটা কাগজে লিখে দিতেই বিল্টু ডায়াল ঘুরিয়ে ফোন করল।

ওদিক থেকে সাড়া এল, "হ্যাল্লো···।"

বিল্টু বলল, "জিরো ফোর টু জিরো সিক্স?"

"ও ইয়েস। বতাইয়ে।"

অমনই শ্যাম ওর হাত থেকে টেলিফোনটা নিয়ে কাঁদো-কাঁদো সুরে বলল, "বাবা! আমার জীবন বিপন্ন। আমি বেলেঘাটার একটি পোড়োবাড়িতে আছি। তুমি কাল রাত দশটার সময় শিবপুর মন্দিরতলায় জোড়া মন্দিরের সামনে এক লাখ টাকা নিয়ে অপেক্ষা করবে। ওরা টাকা পেলেই মুক্তি দেবে আমাকে। না হলে মেরে ফেলবে আমায়।"

বিল্টু এবার শ্যামের হাত থেকে টেলিফোনটা কেড়ে নিয়ে বলল, "টাকাটা আনবেন। না হলে ছেলেকে ফেরত পাবেন না। আর-একটা কথা, পুলিশে খবর দেওয়ার চেষ্টা করবেন না কিন্তু।" বলেই রিসিভার নামিয়ে রাখল।

সে-রাতে শ্যাম বিল্টুর সঙ্গেই ওদের বাড়িতে শুতে গেল।

আর শুভঙ্কর? এক নিদারুণ অপরাধবোধে ওর মনের ভেতরটা যেন তোলপাড় করতে লাগল।

পরদিন সন্ধের পর থেকেই শিবপুর মন্দিরতলার [illegible] মন্দিরের আশেপাশে ঘুরঘুর করতে লাগল বিল্টু আর শ্যাম। ঘনঘন ঘড়ি দেখতে লাগল। ইদানীং হাওড়া শহরে সন্ধের পর লোডশেডিংয়ের দাপটে কোনও গেরস্তের ঘরে বা রাস্তাঘাটে আলো জ্বলে না। তাই পথঘাটও আটটার পরে ফাঁকা হয়ে গেল এবং ওদেরও আনন্দের অবধি রইল না।

ওরা ঘোরাফেরা করতে লাগল আর ঘনঘন তাকাতে লাগল ঘড়ির দিকে।

রাত দশটা।

একেবারে ঠিক সময়টিতেই মালানিজি এসে হাজির হলেন।

বিল্টুকে মন্দিরের পেছনে লুকিয়ে রেখে ধীরে-ধীরে এগিয়ে এল শ্যাম। কাঁদো-কাঁদো মুখে দক্ষ অভিনেতার মতো এসে বলল, "টাকা এনেছ বাবা! তুমি না এলে আজ আমাকে মরতেই হত। ওরা ওই মন্দিরের পেছনে লুকিয়ে আছে।"

মালানিজি গম্ভীর গলায় অ্যাটাচিটা ছেলের হাতে দিয়ে বললেন, "জলদি করো। রুপিয়া দে কর অ্যাটাচি লেকে চলা আও। যাও।"

আনন্দে শ্যামের বুক তখন ভরে উঠেছে। সে তাড়াতাড়ি অ্যাটাচিটা নিয়ে বিল্টুর কাছে গিয়ে বলল, "কেল্লা ফতে। তোর ঝোলা ব্যাগের মধ্যে টাকাগুলো পুরে নে। অ্যাটাচিটা বাবাকে ফেরত দিতে হবে।"

বিল্টু অ্যাটাচিটা হাতে নিয়ে মন্দিরের চাতালে রেখে সেটা খুলতেই কেলেঙ্কারির চরম। কোথায় টাকা? তার জায়গায় সাত-আটটা কোলাব্যাঙ ঝপাঝপ করে লাফিয়ে পড়ল গায়ের ওপর। ওরা দু'জনেই তখন চেঁচিয়ে উঠল ভয়ে।

আশপাশের বাড়ি থেকেও অনেকেই তখন হ্যারিকেন, টর্চ ইত্যাদি নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন, "কী হয়েছে? কী হয়েছে ভাই? কে চেঁচায়?"

বিল্টু তো চোখের পলকে হাওয়া।

আর শ্যাম মাথা হেঁট করে অ্যাটাচি নিয়ে ফিরে এল ওর বাবার কাছে। যেই না আসা অমনই ঠাস করে গালে এক চড়।

ব্যাপারটা যে কী হল কিছুই বুঝতে পারল না শ্যাম। তাই সে গালে হাত দিয়ে হকচকিয়ে গেল।

মালানিজি অগ্নিদৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, "শয়তান! তুম মুঝে টক্কর মারনা চাতে হো? চলো, ঘর চলো। আজ সে তুমহারা বাহার নিকালনা একদম বন্ধ।" বলেই হাতের নড়া ধরে শ্যামকে টেনে ঢোকালেন ট্যাক্সিতে।

ট্যাক্সি শিবপুর বাজার হয়ে জি· টি· রোডে এসে পড়ল।

এদিকে বিল্টুও করল কি, ওখান থেকে পালিয়ে বাড়ি ফিরল না। সোজা এসে হাজির হল শুভঙ্করদের বাড়িতে।

শুভঙ্করের মা, ঠাকুমা সকলেই অবাক, "এ কী বিল্টু! তুমি এই এত রাতে?"

বিল্টু বানিয়েই বলল, "একজনদের বাড়ি নেমন্তন্ন ছিল কিনা, তাই খেয়ে ফিরতে রাত হয়ে গেল। এত রাতে বাড়ি যাই কী করে? ওইজন্য শুভর কাছেই চলে এলাম।"

"তা বেশ করেছ বাবা! [illegible] তোমার বাড়িতে ভাববে না তো?"

pathagar.net

"না। আমার বলাই আছে। বেশি রাত হলে নাও ফিরতে পারি।"

"খুব ভাল কথা। এইরকম অবস্থার কথা সব সময় বাড়িতে জানিয়ে রাখা উচিত।"

সে-রাতে বিল্টু আর শুভঙ্কর পাশাপাশি শুয়ে অনেকক্ষণ জেগে রইল। বিল্টুর চোখে জল। সে বারবার ফলাও করে বলতে লাগল জোড়া মন্দিরের ঘটনাটা। মালানিজি কীভাবে ওদের ঠকালেন, তা বলতে-বলতেই হতাশায় ভেঙে পড়ল বিল্টু।

শুভঙ্কর বলল, "মালানিজির আর দোষ কী বলো ? বারবার ছেলের অন্যায় আবদার সহ্য করতে-করতেই এইরকম কঠোর হয়ে গিয়েছেন তিনি। ছেলের দুষ্টুবুদ্ধি তাঁর চেয়ে ভাল আর কে বুঝবে ? তা ঠিক আছে। গণপতি যা করেন মঙ্গলের জন্যই।"

বিল্টু রেগেমেগে বলল, "ছাই।" বলে পাশ ফিরে শুল। এর পর দীর্ঘ নীরবতা।

এক সময় গভীর ঘুমে ডুবে গেল দু'জনেই।

পরদিন সকালে যখন ব্রেকফাস্টের পর দু'জনে গত রাতের ঘটনাটা নিয়ে আলোচনা করছে তেমন সময় আর-এক নাটক।

মা এসে বললেন, "শুভ ! একবার নীচে আয় তো বাবা। কে এক ভদ্রলোক তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

শুভঙ্কর বলল, "কে মা ?"

"কী জানি বাবা। তবে মুখটা যেন কেমন চেনা-চেনা লাগছে।"

বিল্টু তাকাল শুভঙ্করের দিকে।

শুভঙ্কর বলল, "ঘাবড়াস না, বোস। দেখি কী ব্যাপার।" বলে নীচে এসেই সাদর আহ্বান জানাল ভদ্রলোককে, "আসুন মালানিজি ! আসুন, আসুন। শ্যাম কই ?"

"উসকো নাম মাত লে না। ওর নাম শুনলে আমার দিমাক ঠিক থাকে না।"

"আসুন, ওপরে আসুন।"

মালানিজি শুভঙ্করের সঙ্গে ওপরে উঠলেন।

বিল্টু তো ভূত দেখার মতো চমকে উঠল মালানিজিকে দেখে। সে যে কী করবে, কী করে মুখ ঢাকবে, কিছু ভেবে পেল না। তবে মালানিজি কিন্তু ভ্রূক্ষেপও করলেন না সেদিকে। তার কারণ, তিনি তো কাল রাতে দেখেননি বিল্টুকে। কিন্তু বিল্টু দেখেছে মালানিজিকে। তাই ধরা পড়ার ভয়ে এতটুকু হয়ে গেল ওর মুখ। তা ছাড়া বলা যায় না শ্যাম যদি চাপের মুখে বলে থাকে ওর কথা, তা হলেই তো কেলেঙ্কারির চরম। মিষ্টি-মিষ্টি করে হয়তো বেশ দু-এক কথা শুনিয়ে দেবেন মালানিজি।

যাই হোক, ওই ধরনের কোনও অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হল না ওকে।

শুভঙ্কর মালানিজিকে সোফায় বসিয়ে বলল, "বলুন, কিছু যদি বলার থাকে আপনার।"

"কী বলব বাবা ! বলার কোনও ভাষা নেই। আমার ছেলের মতো ধুর

pathagar.net

লেড়কা যেন আর কারও ঘরে না জন্মায়।"

"ওর ওপর রাগ করে কী করবেন ? আসলে ও তো বরাবরই এইরকম। সবই ওর খেয়ালিপনা।"

"তুমি যদি আমাকে আগে থেকে ফোন করে সব কিছু না জানাতে, তা হলে হয়তো আমি ওর কথায় বিসোয়াস করে ওর চাহিদামতো এক লাখ রুপিয়াই ওকে দিয়ে দিতাম।"

"ভাগ্যে ও আমাদের কাছে প্রস্তাবটা করেছিল।"

"ইউ আর রিয়্যালি গুড বয়। শ্যামের মুখে আমি তোমাদের ব্যাপারে সব কিছু শুনেছি। তোমাদের খুব রুপিয়ার জরুরত আছে, তাই না ?"

"আপনি ঠিকই শুনেছেন।"

"তোমরা যেভাবে নিজেদের লোভ কন্ট্রোল করেছ তার জন্য তোমাদের নিশ্চয়ই কিছু পাওয়া উচিত। আমি বিশ হাজার রুপিয়া তোমাদের দিচ্ছি। এই নিয়ে তোমরা যেখানে যাওয়ার, চলে যাও।"

"কিন্তু ...।"

"এর মধ্যে কোনও কিন্তু-ফিন্তু নেই। যেখানে আমার এক লাখ রুপিয়া বরবাদ হয়ে যাচ্ছিল সেখানে এই ক'টা টাকা তোমাদের হাতে তুলে দিলে ক্ষতি কী ? বিশেষ করে তোমরা যে আমার কী উপকার করেছ তা কী বলব। শ্যাম আমার একমাত্র ছেলে। ও যদি সত্যি-সত্যি ফরেন কান্ট্রিতে চলে যেত তা হলে কী হত বলো তো ? না খেতে পেয়ে বেঘোরে মরত ছেলেটা।"

শুভঙ্কর আর বিল্টু নিরুত্তর।

মালানিজি সত্যি-সত্যিই তাঁর অ্যাটাচি থেকে একশো টাকার কয়েকটি বান্ডিল বের করে ওদের দিকে এগিয়ে দিলেন।

শুভঙ্কর হাত পেতে সেই টাকা নিয়ে বলল, "আমাদের খুবই টাকার প্রয়োজন ছিল মালানিজি। তাই কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব তা ভেবে পাচ্ছি না। তবে খুব হিসেব করেই খরচ করব আমরা। যা বাঁচবে তা আবার আপনাকেই ফিরিয়ে দেব।"

"নেহি। এ রুপিয়া হাম তুম দোনো কো বরাবরকে লিয়ে দে দিয়া। এর থেকে কুছু আমি ফেরত নিব না।"

বিল্টু তো অভিভূত। বলল, "সত্যি ! আপনার মতো মানুষ হয় না ! আর শুভও যা করেছে তা যে কী ভাল করেছে, এখন বুঝতে পারছি। ও যে ভেতরে-ভেতরে সব কথা আপনাকে জানিয়ে দিয়েছে তা কিন্তু আমাকে ও বলেনি।"

শুভঙ্কর বলল, "এবার আপনার কাছে আমার একটি বিনীত নিবেদন আছে।"

"বলে ফ্যালো।"

"দেখুন, টাকাটা না চাইতেই পেয়েছি বলে খুব ভাল লাগছে। কিন্তু আমাদের একটা অনুরোধ যদি রাখেন তা হলে কিন্তু দারুণ খুশি হব।"

"আরে বাবা ফরমাইয়ে তো।"

"আপনি যদি শ্যামের ভাল চান, ওর মন ঘরের দিকে টেনে রাখতে চান, তা হলে ওর একটা দুর্বল জায়গায় আপনি একটু উদার হোন।"

pathagar.net

"কীরকম !"

"আপনি ওই কালী মেয়েটিকে আপনার বাড়িতে নিয়ে আসুন। মেয়েটিকে দারুণ ভালবাসে ও। আমরাও ভালবাসি। ঠিক ছোট্ট বোনটির মতো। দশ বছরের পুঁচকে মেয়ে, অথচ কী দারুণ চটপটে। কেউ কোথাও নেই বেচারির। আপনার ঘরে আশ্রয় পেলে মেয়েটা বেঁচে যায়।"

"লেকিন···।"

"এর মধ্যে কোনও লেকিন-ফেকিন আনবেন না। ও ঘরে এলে শ্যাম ওকে নিয়ে এমন মেতে উঠবে যে, ভাবতেও পারবেন না। ওর জন্য জান দিয়ে দেবে শ্যাম। আপনি ওকে পালন করুন। লেখাপড়া শেখান। বড় হলে বিয়ে-থা দিন। সেটা কিন্তু একটা মহৎ কাজ হবে।"

"কোনও পুলিশি ঝামেলা হোবে না তো ? পরের মেয়েকে ঘরে আনতে আমার খুব ডর লাগে বাবা।"

"না না। ওসব কোনও ভয় নেই। আর থানা-পুলিশের ব্যাপার যদিও কিছু ঘটে, সেটা আমার ওপরে ছেড়ে দিন। আমি বাবাকে বলে সামলে নেব।"

"বেশ। তোমরা যখন এত করে বলছ তখন একটু ভেবে দেখব। আমার তো মেয়ে নেই। একটা ওইরকম থাকলে ক্ষতি কী ?"

"তা ছাড়া মেয়েটা খুব অনুগত। দেখবেন এখন, সারাদিনের পর আপনি এসে যখন বিশ্রাম নেবেন ও তখন কীরকম আপনার গা-হাত-পা টিপে দেবে। কুটকুট করে মাথার পাকা চুল তুলবে। মোট কথা, বসে খাবে না ও।"

শুভঙ্করের কথায় মালানিজি এবার হা-হা করে হেসে উঠলেন।

শুভঙ্কর বলল, "মেয়েটি আপনার আদরযত্ন পেলে দেখবেন শ্যামেরও কত পরিবর্তন হয়েছে। ওর দুষ্টুবুদ্ধিও কমে যাবে অনেক।"

"না-না। ওর কুছ ভি বদল হোবে না। তবে আমি বাড়ি গিয়ে এক্ষুনি মেয়েটাকে আনাচ্ছি।" বলে মালানিজি উঠতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় মা এলেন চায়ের কাপ নিয়ে।

মা ঘরে ঢুকেই টাকার বান্ডিলগুলো দেখে অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, "এ কী! এত টাকা এখানে কোত্থেকে এল ?"

আচমকা এ-প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই মুশকিল। তবু শুভঙ্কর একটু বুদ্ধি খরচা করে বলল, "মালানিজির এই টাকাগুলো চুরি গিয়েছিল মা। কাল রাতে বিল্টুই এগুলো উদ্ধার করেছে। তাই ওঁকে ডাকিয়ে এনে ওঁর টাকা ফেরত দিচ্ছি আমরা।"

"কিন্তু কাল রাতে বিল্টু তো নেমন্তন্নবাড়ি থেকে খেয়ে ফিরল। তা ছাড়া ও তো এল শুধু হাতে।"

"হ্যাঁ টাকাটা বিয়ে বাড়িতেই চুরি গিয়েছিল। আর ওগুলো ও প্যান্টের পকেটে জামার ভেতর করে নিয়ে এসেছিল।"

"শোনো শুভঙ্কর! ছেলেমেয়ে নষ্ট হয় বাবা-মা'র দোষে। আমাকে তুমি সেরকম মা পাওনি যে, যার খুশি তাই বুঝিয়ে যাবে। নিশ্চয়ই তুমি আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছ। আমি মা। আমাকে সব কথা সত্যি করে বলো।"

শুভঙ্কর কী যে বলবে কিছু ভেবে পেল না। এমন অনেক কথা আছে যা

pathagar.net

কাউকেই বলা যায় না।

বিল্টু বলল, "হ্যাঁ কাকিমা! ও-টাকা আমিই এনেছিলাম।"

"তা হলে কাল রাত্রে সে-কথা আমি জানতে পারিনি কেন?"

"না, মানে কাল রাত্রে ফোনেই আমরা ওঁকে জানিয়েছি। তাই তো আজ উনি এসেছেন।"

মালানিজি বললেন, "এরা ঠিকই বলছে মাজি!"

মা বললেন, "আমি কিন্তু বিশ্বাস করছি না। আমার মনে হচ্ছে আপনি এদের টাকা দিয়ে অন্য কোনও কিছু করাতে চাইছেন।"

শুভঙ্কর বলল, "মা!"

মালানিজি একটুও আহত না হয়ে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, "মা! আপনার কাছে মিথ্যে কথা বলব না। কাল আমার এক লাখ রুপিয়া বরবাদ হয়ে যাচ্ছিল। শুধুমাত্র আপনার লেড়কার জন্যেই সেই টাকা আমি ফেরত পাই। তাই সামান্য কিছু টাকা ওদের মিষ্টি খেতে দিচ্ছিলাম।"

"ভুল করছিলেন। ওই টাকাগুলো সামান্য টাকা নয়। অত টাকার মিষ্টি খেলে ছেলের পেট খারাপ করবে। আমার ছেলের জন্য যদি সত্যিই আপনি কোনও বড় রকমের ক্ষতির হাত থেকে বেঁচে গিয়ে থাকেন, তার জন্যে এক বাক্স মিষ্টিই তো যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এত টাকা! না না! এ আপনি নিয়ে যান। তা ছাড়া এই বয়সের ছেলের হাতে কেউ এত টাকা তুলে দেয় কখনও?"

শুভঙ্কর বলল, "মা!"

"তুই থাম। খবরদার, হাত দিবি না ওই টাকায়। ভাগ্যে আমি এসে পড়লাম। না হলে কী যে হত! তুই ভুলে যাস না শুভ, তোর বাবা একজন নামকরা পুলিশ অফিসার। আমাদের দেশে পুলিশের চরিত্রে অনেক কলঙ্ক আছে। কিন্তু তুই হয়তো জানিস না, আজ পর্যন্ত তোর বাবা নিজের মাইনের টাকাটি ছাড়া একটি পয়সাও নেননি কারও কাছ থেকে। তার ছেলে হয়ে কিনা তুই··· ?"

মালানিজি শুভঙ্করের মাকে প্রণাম করে বললেন, "আপ মুঝে মাফ কর দিজিয়ে মাজি। এইরকম ভুল আমি আর কখনও করব না।" বলে টাকাগুলো অ্যাটাচিতে পুরে যেমন এসেছিলেন তেমনই চলে গেলেন।

বিল্টু-শুভঙ্কর দু'জনেই হাঁ করে রইল।

॥ ১৫ ॥

অতগুলো টাকা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার বেদনায় ওরা দু'জনে কী যে করবে কিছু ঠিক করতে পারল না। সমস্ত আশা-ভরসা এক লহমায় জল হয়ে গেল। বিল্টু তো হতাশায় ভেঙে পড়ে কাঁদতে লাগল ঝরঝর করে।

শুভঙ্কর বলল, "কাঁদিস না বিল্টু। গণপতির ওপর ভরসা রাখ। আসলে কোনও অন্যায় বা অপরাধের মধ্য দিয়ে হয়তো তিনি কোথাও আমাদের নিয়ে যেতে চান না বলেই এরকমটা করলেন।"

"তোর এই কথাগুলো শুনলে আমার গা-পিত্তি জ্বলে যায়।"

"হতাশ হোস না। গণপতির ওপর ভরসা রাখ। দেখবি উদ্দেশ্য একদিন সিদ্ধ হবেই। আগাগোড়া ঘটনাগুলো দেখছিস না, সাজানো-গোছানো নাটকের মতো সুযোগগুলো হাজার দুর্যোগের ফাঁক দিয়ে কেমন একটু-একটু করে নিয়ে আসছে ? উনি যখন এককথায় এইভাবে অত টাকার ব্যবস্থা করে দিলেন, তখন আমাদের অন্তরের ডাক নিশ্চয়ই উনি শুনেছেন। তা ছাড়া চিন্তা করতে পারিস, ওই দুর্লভ মূর্তি আমাদের ঘরে আছে, এ কি ভাবা যায় ?"

"কিন্তু টাকার ব্যবস্থা হলেও সে-টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা তো উড়েই গেল পাখির মতো।"

"না রে বোকা, না। মালানিজির কাছ থেকে ও-টাকা আদায় আমরা করবই।"

"কীভাবে করবি ?"

"ধার হিসেবে।"

"ধার। কিন্তু সেই ধার আমরা শোধ করব কী করে ?"

"কেন, বড় হয়ে চাকরি করে মাইনের টাকা থেকে কিছু-কিছু করে শোধ করব। এখন তুই এক কাজ কর। পুরোপুরিভাবে যাওয়ার জন্যে তৈরি হ। তিন্নি আর মউকে খবর দে। পারলে তুই নিজে গিয়ে ওদের নিয়ে আয়। তবে খুব সাবধান। কারও বাড়িতে কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায়। সবাই জানবে ওরা কালীঘাট, চিড়িয়াখানা দেখবার জন্যে আমাদের এখানে বেড়াতে এসেছে।"

"টাকাটা হাতে না পেয়েই ওদের আনতে যাওয়াটা কি ঠিক হবে ?"

"টাকার ভারটা আপাতত আমার হাতেই ছেড়ে দে। ও-ব্যাপারটা আমি মালানিজির সঙ্গেই বুঝে নেব। আপাতত কিছু টাকা তোকে আমি দিচ্ছি। সেটা নিয়ে কাল সকালেই তুই ধলভূমগড় চলে যা। গিয়ে ওদের নিয়ে আয়। সঙ্গে শীতবস্ত্র নিতে যেন না ভোলে। কেননা ওসব দেশে ঠাণ্ডা খুব।"

শুভঙ্কর ইতিমধ্যেই ভেতরে-ভেতরে কিছু টাকা জমিয়ে ফেলেছিল। তবে তা খুব সামান্যই। শুভঙ্কর তার থেকে দু'শো টাকা বিল্টুকে দিল। তারপর টেলিফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে ফোন করল মালানিজিকে।

ফোনটা ধরল শ্যাম। শুভঙ্করের গলা শুনেই তো ফেটে পড়ল বোমার মতো। বলল, "বিশ্বাসঘাতক ! তুই আমার বাড়া ভাতে ছাই দিলি শেষকালে ?"

"কেন, কী হল ?"

"এ-কথা জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করছে না ? কেন তুই ফোন করে বাবাকে সব কথা জানিয়ে দিলি ? এখন এমন হয়েছে যে, বাবা রেগে আগুন হয়ে আছেন আমার ওপর। তবে তুই বাবাকে বুঝিয়ে একটা কাজ ভাল করেছিস, তোর জন্যেই কালীটার একটা হিল্লে হয়ে গেল।"

"বলিস কীরে !"

"হ্যাঁ। একটু আগেই ওকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছি।"

"সেজন্যে অন্তত আমাকে একটা ধন্যবাদ দে।"

"দিলাম। তা বকুরাম, ভালমানুষি দেখিয়ে অত টাকা ফেরত দিতে গেলি কেন ?"

"আরে, আমরা ফেরত দিইনি। আসলে আমার মা তো জানেন না ব্যাপারটা, তাই ভুল বুঝে ওই কাজ করেছেন। তা যাক। কিছু টাকা সত্যিই আমাদের দরকার। এ-ব্যাপারে তোর বাবার সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে চাই। আর

pathagar.net

সেইসঙ্গে চাই তোর একটু পরামর্শ।"

"চলে আয়।"

"তোদের ঠিকানাটা কী বল তো ? ঠিক কীভাবে যাব সেটা আমাকে একটু বুঝিয়ে দে।"

শ্যাম ঠিকানা বলে সব কিছুই বুঝিয়ে দিল।

শুভঙ্কর রিসিভার নামিয়ে বিল্টুকে বলল, "আমি তা হলে মালানিজির সঙ্গে দেখা করে আসি ?"

"কী কথা হল তোর সঙ্গে ?"

"যা হল তা তো শুনতেই পেলি।"

"আমিও তোর সঙ্গে যাব। মনটা আমার দারুণ উদ্বিগ্ন হয়ে আছে রে।"

"তুই ধলভূমগড়ে যাবি না ?"

"সে তো কাল। তা ছাড়া ওখানে যাওয়ার সত্যিই কোনও দরকার আছে কী ? ওদের একটা রেজেস্ট্রি চিঠি দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।"

"না, যায় না। হাজার হলেও মেয়ে তো ওরা। পথে-ঘাটে কত কী বিপদ-আপদ হতে পারে। তা ছাড়া মউ কখনও শহরে আসেনি। তিন্নি সেই কবে নাকি একবার এসেছিল তোদের বাড়িতে, যদি ঠিকানা খুঁজে না পায় ? আমরা যে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে ওদের নিয়ে আসব সেও তো জানতে পারব না কোন গাড়িতে আসছে না আসছে। তাই বলি কি, তুই কাল হোক পরশু হোক চলে যা। ওরা এসে দিনকতক এখানে থাকলে আমরা ওদের ধলভূমগড়ে পৌঁছে দিয়ে আসছি বলে আমাদের গন্তব্যে পালাব। মাসখানেকের ব্যাপার। বাড়িতে চিঠি দিয়ে একেবারে কাজ হাসিল করে ফিরে আসব। কেউ টেরও পাবে না আমরা কোথায় গিয়ে কী করে এলাম।"

"দি আইডিয়া। আমি তা হলে কালই সকালের গাড়িতে যাব।"

"এখন তা হলে চল মালানিজির বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।"

শুভঙ্কর আর বিল্টু একটুও দেরি না করে বড়বাজারে মালানিজির বাড়িতে এসে হাজির হল।

শ্যাম ওদের দু'জনকে ঘরে বসিয়ে ওর মাকে ডেকে আনল।

ছোট্ট মেয়ে কালী এখনই ওদের পরিবারের সঙ্গে মিশে গেছে। তাই কালী এসে চা-বিস্কুট দিল।

কিছুক্ষণ গাল-গল্পে সময় কেটে গেল।

খানিক বাদে মালানিজি এলেন। এসে হাসিমুখে বসলেন ওদের সামনে। বললেন, "আমি জানতাম তোমরা আসবে। রুপিয়া চাহিয়ে তো ?"

শুভঙ্কর বলল, "হ্যাঁ। ঠিক ধরেছেন আপনি। তবে অত টাকা নয়। আপনি বরং হাজার পাঁচেক টাকা আমাদের দিন। অবশ্যই ধার হিসেবে। পরে বড় হয়ে ওই টাকা আমরা আপনাকে শোধ করে দেব।"

শ্যাম বলল, "না না, পাঁচ হাজার নয়। পাঁচ হাজার টাকায় কী হবে শুনি ?"

মালানিজি ধমক দিলেন ছেলেকে, "বদতমিজ, চুপ রহো তুম। ফালতু বকোয়াস মাত করো।"

শুভঙ্কর বলল, "আপাতত আপনি ওই টাকাই দিন না। পরে দরকার হলে আবার চেয়ে নেব। আসলে আমরা এমন একটা কাজে যাচ্ছি যে, না গেলে

pathagar.net

নয়।"

"লেকিন তোমরা শোচো তো। যদি ওই দূর দেশে গিয়ে তোমাদের কোনও ক্ষতি হয়, তখন আমি কিন্তু জড়িয়ে পড়ব।"

"মোটেই না। আপনি আমাদের টাকা দিয়েছেন তার প্রমাণ কী ? টাকা তো আপনি আমার মায়ের সামনে থেকেই ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন।"

"তা অবশ্য এনেছি।"

শ্যাম বলল, "তোরা কিন্তু খুব ভুল করছিস। চারজনে যাবি, আর টাকা নিচ্ছিস মাত্র পাঁচ হাজার ? এ কি হরিদ্বার নাকি ? তোরা আরও পাঁচ হাজার টাকার ট্রাভেলার্স চেক অন্তত সঙ্গে নে। না হলে কিন্তু কেলেঙ্কারির চরম হবে।"

মালানিজি এবার একটু চিন্তা করে বললেন, "হ্যাঁ, তাই করো। যেতে যখন হবেই তখন একটু বেশি করেই টাকা-পয়সা সঙ্গে নেওয়া ভাল।"

বিল্টু বলল, "আসলে অনেক টাকা তো। তাই বোধ হয় সঙ্কোচ হচ্ছে শুভর। তা আপনি যখন দিচ্ছেন তখন একটু বেশি করেই দিন। তবে বাজে খরচ করব না আমরা। আমাদের কাজ শেষ হলেই আমরা ফিরে আসব। আর যে টাকা ফিরে আসবে তা আপনাকে ফিরিয়ে দেব।"

শ্যাম বলল, "তোমরা ঘুঘুও দ্যাখোনি ঘুঘুর ফাঁদও দ্যাখোনি। টাকা ফিরে আসবে ? ওই টাকাতেই অর্ধেক রাস্তায় গিয়ে মা-মা করতে হবে তোমাদের। কেননা, যত তাড়াতাড়িই করো না কেন, তোমরা এক মাসের আগে ফিরতে পারবে না। মাথাপিছু দু' হাজার টাকায় কী হবে ? পথ-খরচাতেই তো মেরে দেবে তোমাদের। এক মাস ধরে খাবেটা কী ?"

শুভঙ্কর বলল, "তোমার কথা সত্যিই ফেলবার নয়। খুবই যুক্তিসঙ্গত। তবে কিনা আমিও প্রচুর বই-টই পড়েছি। ও-পথে খাবার আছেটাই বা কী ? রামদানা আর রুটি ছাড়া কিছুই তো মেলে না।"

যাই হোক। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলছে দেখে শ্যাম আর কিছু বলল না।

মালানিজিও গুনে-গুনে ওদের দশ হাজার টাকা দিয়ে দিলেন। ঠিক হল পাঁচ হাজার টাকা ভাঙিয়ে ওরা টিকিট করবে, সঙ্গে রাখবে। আর পাঁচ হাজার টাকার ট্রাভেলার্স চেক সঙ্গে নেবে অতিরিক্ত প্রয়োজনের জন্য।

টাকা পাওয়ার পর শ্যামের সঙ্গে ওরা আলোচনায় বসল। ওদের একটু নিরিবিলিতে বসিয়ে শ্যাম ওদের বুঝিয়ে দিল কীভাবে কী করতে হবে না হবে, কীভাবে যেতে হবে। যতই ওরা বইয়ে পড়ুক না কেন, তবুও শ্যামের অভিজ্ঞতা অন্যরকম। ওরা জানে এই পথের প্রথম অভিযান শুরু হবে টনকপুর থেকে। ভারত-নেপাল সীমান্তের টনকপুর হল সারদা নদীর তীরে এক স্বপ্ননগরী। হাওড়া থেকে পঞ্জাব মেলে লখনউ এবং সেখান থেকে নৈনি এক্সপ্রেসে টনকপুর অথবা হাওড়া থেকে জম্মু-তাওয়াইতে বেরিলি গিয়ে সেখান থেকে বাসে টনকপুর যাওয়া যায়।

শ্যাম বলল, "আমার মতে বলে ভাই তোমরা জম্মু-তাওয়াইতেই যাও। আজ বেলা দশটায় চাপলে পরদিন দুপুরে বেরিলি পৌঁছে যাবে। ওখান থেকে টনকপুর খুব একটা বেশি দূরে নয়।"

শুভঙ্কর বলল, "তা হয়তো নয়। তবে টিকিট কাটার কী হবে ? আমরা তো

pathagar.net

কখনও ওইসব দূরপাল্লার গাড়ির টিকিট কাটিনি। কীভাবে রিজার্ভ করতে হয় না হয়, কিছুই জানি না আমরা। তুমি ভাই একটু টিকিটের ব্যবস্থাটা করে দাও আমাদের।"

শ্যাম বলল, "এখন তো টিকিট কাটার কোনও ঝামেলা নেই। হাওড়া-শিয়ালদা-ফেয়ারলি প্লেস যে-কোনও কম্পিউটারাইজ্‌ড বুকিং কাউন্টারে গিয়ে নিজের নাম, বয়স, কবে যেতে চাও, কোন গাড়িতে যেতে চাও, সব জানিয়ে একটা ফর্ম পূরণ করে দিলেই তোমাদের টিকিট পেয়ে যাবে। অবশ্য যদি ওইদিনের টিকিট থাকে। না হলে যেদিনের থাকবে সেদিনের নাও। তোমাদের তো তাড়া কিছু নেই। যাওয়া নিয়ে কথা।"

"তবু ভাই টিকিটের ব্যবস্থাটা তুমিই করে দাও। না হলে আমরা পারব না। একবার সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দাও। তারপর আর অসুবিধে হবে না।"

বিল্টু বলল, "বিশেষ করে তুমি যখন ওই পথের প্রাক্তন যাত্রী, তখন তোমার অভিজ্ঞ হাতের টিকিট হলে আমাদের কাছে সেটা অত্যন্ত হিতকর হবে।"

শুভঙ্কর বলল, "না হলে যতই তুমি বুঝিয়ে দাও না কেন তবু টিকিট কাটবার সময় বা গাড়িতে ওঠার সময় হাত-পা কাঁপবে আমাদের।"

শ্যাম বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। আর বলতে হবে না। এই প্রথমবার তো। তোমাদের একটু দেখিয়ে-শুনিয়ে দেওয়াই ভাল। না হলে কী করতে কী করে বসবে তার ঠিক কী ? বিশেষ করে শুধু যাওয়ার ব্যাপার নয়। ফিরে আসার ব্যাপারও আছে।" বলে একটু চা-জলখাবারের ব্যবস্থা করে এল শ্যাম।

শ্যামের মা খানিক বাদেই ওদের জন্য ডিশ ভর্তি হালুয়া, নোন্‌তা বিস্কুট আর চা নিয়ে এলেন।

খেতে-খেতে অনেক গল্প হল।

সেসব ওই দূরান্তরের কৈলাস-মানসের। কীভাবে কত কষ্ট করে কোন কৌশলে বিনা পাসপোর্টে শ্যাম ওখানে গিয়েছিল, তা সবিস্তারে খুলে বলল। তারপর ওদের সঙ্গে নিয়ে সোজা চলে এল ফেয়ারলি প্লেসে। হেঁটে-হেঁটেই এল। এসে রিজার্ভেশন স্লিপ ফিলআপ করে সামান্য কিছুক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে কাউন্টারে এগিয়ে দিতেই পেয়ে গেল টিকিট। একই টিকিট, চারজনের চারটে বার্থ। টিকিটটা শুভঙ্করের হাতে দিয়ে শ্যাম বুঝিয়ে দিল কীভাবে গাড়িতে উঠতে হবে। আর এও বলে দিল; অযথা এদিক-সেদিক না করে এস-ওয়ান বগি দেখে উঠে পড়তে। সম্ভবত বগিটা থাকবে এঞ্জিনের দিকে।

বিল্টু ও শুভঙ্কর টিকিটটা হাতে পেয়ে কী যে করবে কিছু ঠিক করতে পারল না। সত্যি, শ্যামের কাছে ওদের কৃতজ্ঞতার আর শেষ নেই।

শুভঙ্করের প্রস্তাবমতো পরদিন সকালের ইস্পাত এক্সপ্রেসে বিল্টু রওনা হয়ে গেল তিন্নি ও মউকে নিয়ে আসতে। ঠিক হল ওরা এসে দিনকতক এখানে থাকবে। তারপর সুদূরে পাড়ি দেওয়ার আগে বিল্টু ও শুভঙ্কর ওদের ধলভূমগড়ে পৌঁছে দিয়ে আসবার নাম করে সেই যে বেরোবে বাড়ি থেকে, একেবারে চারজনে চেপে বসবে পঞ্জাব মেলে। জুনের চার তারিখে ওই গাড়িতেই ওদের রিজার্ভেশন। লখনউ হয়ে নৈনি এক্সপ্রেসের টিকিট ওরা

pathagar.net

পায়নি। তাই আরও এগিয়ে ওরা নামবে বেরিলিতে। সেখান থেকে টনকপুর নাকি খুব একটা দূরের পথ নয়। সে যাই হোক, আনন্দে উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠল শুভঙ্কর।

বিল্টুর বাড়িতে কড়াকড়ি একদমই নেই। আর এইসব ব্যাপারে ওরা এতদূর যে এগিয়েছে তাও কেউ জানে না। অবশ্য শুভঙ্করের বাড়িতেও জানে না কেউ। তবে মুশকিল হল, কোনও অজুহাতেই মায়ের আলমারি থেকে শুভঙ্কর ওর শীতের পোশাকগুলো বের করতে পারল না। জোরাজুরি করেনি ও। তাই দুশ্চিন্তারও আর শেষ নেই। কেননা, যদি কোনওরকমে ওর চালাকিটা ধরতে পারেন মা, তা হলে কিন্তু সব চাল ভেস্তে যাবে। আসল পরিকল্পনাটাই মাটি হয়ে যাবে তা হলে।

শুভঙ্কর এই ঘোর সঙ্কটে সোনার গণপতির চরণ বন্দনা করে বারবার ডাকতে লাগল তাঁকে। বলতে লাগল, "হে সিদ্ধিদাতা! যেভাবেই হোক, তুমি সর্ব বিঘ্ন নাশ করে তোমার কাজে নিযুক্ত করো আমাদের। শেষরক্ষাটা যেন হয়। একবার ঘরের বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়তে পারলে আমরা তোমাকে নির্ভর করেই এগিয়ে চলব দূরের তীর্থপথে। রাবণ হ্রদের গভীর কালো জলে তোমাকে সযত্নে রেখে আসব আমরা। সেই সময় আমাদের রক্ষা করবার জন্য তোমাকে সদা জাগ্রত থাকতে হবে।"

শুভঙ্কর যে শুধু গণপতির কাছে প্রার্থনাই করেছে তা নয়, ভেতরে-ভেতরে অনেক কাজও করে ফেলেছে। বিভিন্ন ধরনের বই-টই পড়ে যেটুকু জেনেছে, তাতেই বিভিন্ন রকমের ক্রিম, ওষুধপত্তর ইত্যাদি সব কিছুই কিনেছে।

তবে কিনা সকল মুশকিলের আসান যিনি করে থাকেন সেই সিদ্ধিদাতা এক্ষেত্রেও মুশকিল আসান করে দিলেন। দিন দুই পরে একদিন সন্ধেবেলা বিল্টুর সঙ্গে তিন্নি আর মউ এসে হাজির হতেই আবহাওয়ার আমূল পরিবর্তন ঘটল।

মা-ঠাকুরমা দু'জনেই তো অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ওদের মুখের দিকে।

মা বললেন, "এরা কারা! চিনলাম না তো?"

শুভঙ্কর বলল, "না চিনলেও চিনতে হবে তোমাকে। বলো দেখি এরা কে?"

বিল্টু বলল, "বলতেই হবে আপনাকে।"

মা বললেন, "বুঝেছি। এরা নিশ্চয়ই ধলভূমগড়ের সেই দুষ্টু মেয়ে দুটো?"

শুভঙ্কর বলল, "ঠিক বলেছ।"

"কী যেন নাম ওদের? তিন্নি আর মউ। এ তো দেখছি লক্ষ্মী-সরস্বতী। একেবারে পটের ছবি থেকে বেরিয়ে এসেছে গো। এসো মা, এসো।"

তিন্নি আর মউ শুভঙ্করের মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। ঠাকুরমাকেও প্রণাম করল।

তিন্নি ফ্রক পরেছে। মউ পরেছে প্যান্ট-শার্ট।

ওরা নিজেরাই নিজেদের পরিচয় দিল।

"আমার নাম তিন্নি।"

"আমার নাম মউ।"

মা হেসে বললেন, "বেশ। কিন্তু তোমরা এতসব জিনিসপত্তর বয়ে এনেছ কী

pathagar.net

করতে ? আমাদের এখানে কি কিছুই নেই ?"

শুভঙ্কর বলল, "বা রে। তোমার ঘরে তো শুধু ছেলে। মেয়ে আছে কি ? ওদের পোশাক-আশাক লাগবে না ? ওরা কলকাতা দেখতে এসেছে। চারদিক ঘুরবে, বেড়াবে। দিনকতক থাকবে, তারপর যাবে। তবে ভয় নেই। আমাদের এখানে থাকবে না। বিল্টুদের বাড়িতেই থাকবে। আর আমাদের বাড়ি মাঝেমধ্যে বেড়াতে আসবে। জানো মা, এই তিন্নি না ঠাকুর-দেবতা ভালবাসে খুব। ওদের বাগানের গাছ থেকে ফুল তুলে কী সুন্দর মালা গেঁথে ঠাকুরকে পরায়। আর এই যে দেখছ মউ, এ কিন্তু দারুণ ডানপিটে।"

"বড় হও, তোমার মতো দুষ্টুকে শায়েস্তা করবার জন্য ..." কী বলতে গিয়েও থেমে গেলেন।

তিন্নি-মউ দু'জনেই হেসে উঠল মায়ের কথা শুনে।

মা বললেন, "তা শোনো, একটা কথা আমি আগেই বলে রাখি, এই ভর সন্ধেবেলা যখন আমার বাড়িতে এসেছে তখন আর কারও বাড়িতে নয়, আমার এখানেই থাকবে এরা।"

বিল্টু বলল, "না না। তা কী করে হয় ? আমার কত আশা, ওরা আমাদের বাড়ি থাকবে। ওদের সঙ্গে সেইরকমই তো কথা ছিল আমার।"

"যার সঙ্গে যেরকম কথাই থাক, প্রথমেই যখন তোমাদের বাড়িতে নিয়ে যাওনি, তখন আর কিছুতেই যেতে দেব না এখান থেকে।"

ঠাকুরমা বললেন, "তা ছাড়া আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা। কারা যে কোন ছলে কার বাড়িতে এসে হাজির হয় তা কি কেউ বলতে পারে বাবা ?"

মা বললেন, "আমার যে কত শখ ছিল একটি মেয়ের। এই দুষ্টুটার দুষ্টুমির চোটে তো অস্থির হয়ে উঠেছি। কাজেই এদের কখনও আমি হাতছাড়া করি ? তা ছাড়া আমার এখানে তো কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। তিনজনে তিন ঘরে শুয়ে থাকি। এখন দিনকতক তবু একসঙ্গে একটু শুয়ে-বসে গল্প করে বাঁচব।"

বিল্টু বলল, " তা হলে এই কথাই রইল। তিন্নি আর মউ আপনার এখানেই থাকবে। আমাদের বাড়িতে অবশ্য থাকার খুবই অসুবিধে হত। নেহাত আসতে চাইল তাই নিয়ে এলাম। এখন একটু চা খাইয়ে দিন, কেটে পড়ি।"

"কেটে কোথায় পড়বে ? ওসব হবে না। আজ রাত্রিবেলা এখানে খাওয়া-দাওয়া করে তারপর যেখানে ইচ্ছে যাবে। এখন সব মুখ-হাত ধোও। আমি চা করি।" বলে তিন্নি আর মউকে বললেন, "এসো, মা এসো। পাশের ঘরে গিয়ে গাড়ির জামাকাপড়গুলো ছেড়ে ফ্যালো দেখি আগে।"

মা-ঠাকুরমা তিন্নি ও মউকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে যেতেই শুভঙ্কর বলল, "বুদ্ধু, আজই ওদের এখানে নিয়ে আসতে কে বলল তোকে ? দু-একদিন তোদের বাড়িতে রেখে তারপরে আনতে পারতিস তো ?"

"কী করব বল ? তুই তো জানিস আমাদের ঘরের অভাব। মেয়ে দুটো তবু আরামে থাকবে এখানে। তা ছাড়া যখন আনতাম তখনই তো এই কাণ্ড হত !"

"তা অবশ্য হত। আসলে ভয়টা আমার অন্য কিছুর নয়। চৌঠা জুন আমাদের যাওয়া। সেইদিন যদি মা এইরকম জেদ ধরে বসেন যেতে দেবেন না

pathagar.net

বলে, তা হলে কী কেলেঙ্কারিটা হবে বল দেখি ?"

"এটা অবশ্য তুই ঠিক বলেছিস। তবে যাওয়ার দু'দিন আগে আমি বরং ওদের এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাব আমাদের বাড়িতে।"

"পারবি তো ?"

"পারতেই হবে।"

মা আবার এলেন, "বিল্টু ! তুমি মুখ-হাত ধুয়ে নাও। আমি চা বসিয়েছি। তারপর দু' বন্ধুতে মিলে একবার বাইরে গিয়ে দোকান-বাজারটা করে নিয়ে এসো। সত্যি, কী ভাল যে লাগছে আমার ! কতদিন লোকজন আসেনি বাড়িতে।"

মার কথামতো বিল্টু বাথরুমে গেল। তারপর ফিরে এসেই দেখল ডিশ-ভর্তি হালুয়া, বিস্কুট আর চা একদম রেডি।

তিন্নি আর মউও ততক্ষণ নতুন সাজে সেজেছে। ওরাও বাথরুমে গিয়ে মুখ-হাত ধুয়ে এসে একসঙ্গে খেতে বসল।

মা-ঠাকুরমা চায়ের টেবিলে ওদের সঙ্গে নানান গল্প জুড়ে দিলেন।

ঠাকুরমা বললেন, "খোকাও অনেকদিন আসেনি। আমি আজই খোকাকে আসতে বলছি। তোমরা এসেছ শুনলে শত কাজ ফেলেও সে ছুটে আসবে। কত কথা যে বলেছে সে তোমাদের সম্বন্ধে। তবে তোমরা যে আসবে এ-কথা আগে জানা থাকলে জানিয়েই রাখতাম ওকে।"

এই সময় মউ চট করে একটা উপস্থিত বুদ্ধি মাথায় এনে বলল, "আসলে এই গরমে আমাদের তো আসবার কথা নয়। আমার বড়মামা থাকেন লখনউ। উনি চিঠি লিখেছেন আমাদের, তাঁর ওখানে যেতে।"

মা বললেন, "ওমা ! এই গরমে লখনউ। সে তো জানি উত্তরপ্রদেশে। সেখানে নাকি লু বয়।"

"আপনি ঠিকই জানেন। লখনউ হল উত্তরপ্রদেশের রাজধানী। তা আমরা তো লখনউতে থাকব না। চার জুন আমরা এখান থেকে যাব। পরদিন লখনউ পৌঁছব বিকেলে। ওইদিনই আমরা রাতের গাড়িতে চেপে চলে যাব কাঠগোদাম। সেখান থেকে নৈনিতাল। ওখানে এখন আরামদায়ক শীত।"

"বলো কী ! চার জুন তো এসেই গেল প্রায়। আমি ভাবলাম কোথায় তোমরা এখানে কিছুদিন থাকবে, তোমাদের নিয়ে কালীঘাট-দক্ষিণেশ্বর করব।"

"এখন তো আমরা দশদিন আছি। ওখানে আর ক'দিন থাকব ? খুব জোর এক সপ্তাহ। তারপর আবার এখানে আসব। একমাস থাকব আমরা।"

ঠাকুরমা বললেন, "থাকবে তো ?"

"বা রে। থাকব বলেই তো এসেছি।"

মা বললেন, "একমাস কেন ? যতদিন ইচ্ছে থাকো।"

মউয়ের কথায় বিল্টু আর শুভঙ্কর আশার আলো দেখতে পেল। কেননা এর পরে ওদের সঙ্গে নৈনিতাল যাওয়ার জেদ ধরলে মা-ঠাকুরমা চট করে না করতে পারবেন না।

চা পর্ব শেষ হলে মায়ের ইচ্ছামতো কেনাকাটা করতে বেরোল ওরা। কত কী-র ফর্দ দিয়েছেন মা। কেনাকাটা করে ওরা যখন ফিরল তখন আর-এক

pathagar.net

দৃশ্য। ওরা দেখল দিব্যি রান্নাঘরের দরজায় বসে দুষ্টু মেয়ে দুটো মায়ের সঙ্গে গল্প করতে-করতে ময়দা মাখতে বসে গেছে।

মা এবং ঠাকুরমার আদর-যত্নে তিন্নি আর মউ অভিভূত। এখানে আসার পর দু-চারটে দিন যে কীভাবে কাটল ওদের, তা ওরা টেরও পেল না। সারাটা দিন ওরা নানান কাজে ব্যস্ত থাকে আর বিকেল হলেই বিল্টু-শুভঙ্করের সঙ্গে শিবপুর ফেরিঘাটে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসে। ওরা চার মাথা এক হয়ে নানারকম যুক্তি করে কীভাবে কী করবে না করবে এইসব নিয়ে। ওদের এত উদ্যম এবং সুযোগ সত্ত্বেও দুশ্চিন্তার কিন্তু শেষ নেই। ওরা তো বেরিলি হয়ে সোজা চলে যাবে টনকপুর। তারপর সেখান থেকে চম্পাওয়াত, লোহাঘাট পেরিয়ে পিথোরাগড়, তারপরেই কোনাড়ি চিনি, আস্কোট হয়ে ধরচুলা। খুব জোর হয়তো ওরা ধোলিগঙ্গা ও কালী নদীর সঙ্গমে তাওয়াঘাট পেরিয়ে গারবিয়াং পর্যন্ত যাবে। কিন্তু তারপরে এর আগে অথবা পরে কোথায় যে আটকাবে ওদের, তা তো জানে না। তিব্বতে ঢুকবে কী করে ? আর তিব্বতে না ঢুকতে পারলে তো রাবণ হ্রদে পৌঁছনো যাবে না। অথচ সীমান্তে এখন অতন্দ্র প্রহরা। ভয়ানক কড়াকড়ি। কোনওরকমেই সেনাবাহিনীর নজর এড়িয়ে বহিরাগতদের তিব্বতে প্রবেশ করার উপায়টি নেই। তা হলে ?

তিন্নি বলল, "উপায় আছে।"

মউ বলল, "কীরকম !"

"আমাদের ভেতর থেকে যে-কোনও একজনকে ঘরের মায়া ত্যাগ করে জীবন বিপন্ন করেও চোরাপথে ঢুকে যেতে হবে ওদের নজর এড়িয়ে, অথবা সীমান্তের বাধা অতিক্রম করে। মনে রাখতে হবে, যে যাবে সে আর ফিরে আসবে না। যে যাবে সে মরিয়া হয়েই যাবে।"

শুভঙ্কর বলল, "কে যাবে ?"

তিন্নি বলল, "আমি যাব।"

বিল্টু বলল, "না, আমি যাব।"

মউ বলল, "উঁহু, আমি যাব।"

শুভঙ্কর বলল, "বাঃ রে, তা হলে আমি কী দোষ করলাম ?"

মউ বলল, "শোনো, অনাগত ভবিষ্যৎকে কল্পনা করে তার সিদ্ধান্ত এখন থেকেই নিয়ো না। এই দুর্গম পন্থায় যাত্রা শুরু করলে পথই একসময় আমাদের আসল পথের দিশা পাইয়ে দেবে। তখন আমরা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা ঠিকই নিতে পারব। দরকার হলে টস হবে। তেমন বুঝলে চারজনেই চলে যাব সীমান্তের ওপারে। কিন্তু ওসব চিন্তা থাক। এখন আমি কী বলি শোনো। এই অভিযানটা বড় যা-তা অভিযান নয়। তোমরা ছেলে, তোমাদের জন্য চিন্তা নেই। কিন্তু আমরা মেয়ে। আমাদের বিপদ পদে-পদে। তাই আমি ঠিক করেছি যাওয়ার আগে কলকাতার কোনও বিউটি পারলারে গিয়ে আমরা চুল ছেঁটে ছেলে সেজে আসব। ছেলেদের পোশাক পরব। এমনভাবে আমরা সাজব যাতে কেউ আমাদের মেয়ে বলে মনে করতে না পারে। সবাই জানবে আমরা ছেলে।"

তিন্নি বলল, "এ-যুক্তিটা তো মন্দ নয়। কিন্তু আমরা ছেলেদের পোশাক পাব কোথায় ?"

"তৈরি করাতে হবে। একইরকম পোশাক হবে সকলের।"

শুভঙ্কর বলল, "লিণ্ডসে স্ট্রিটের কাছে এইরকম পোশাক তৈরির অনেক দোকান আছে।"

মউ বলল, "জিন্‌সের হওয়া চাই কিন্তু।"

"তাই হবে। ভাল চাইনিজ বিউটি পারলারও আছে ওখানে। বাবার সঙ্গে একবার নিউ মার্কেটে বেড়াতে গিয়ে দেখে এসেছি।"

"তা হলে আর দেরি কোরো না। কালই চলো যাই, অর্ডার দিয়ে আসি।"

"এই বুদ্ধিটা যে মউ দিয়েছে এটা ভাল বুদ্ধি। ওরা ছেলে সাজলে সবাই ভাববে আমরা চার বন্ধুতে বেড়াতে এসেছি বুঝি। এর ওপর ওরা চোখে সান গ্লাস লাগিয়ে মাথায় টুপি পরে থাকলে কারও সাধ্য নেই যে ওদের চিনতে পারে। আর সেখানে যার সঙ্গে যা কিছু কথা বলার তা আমরাই দু'জনে বলব। ওরা একমাত্র আমাদের সঙ্গে ছাড়া কোনও অবস্থাতেই কারও সঙ্গে কথা বলবে না।"

বিল্টু লাফিয়ে উঠল, "হুর্‌রে।"

মউ বলল, "দেখলে তো কেমন বুদ্ধিটা বাতলালাম ?"

বিল্টু বলল, "সত্যি বলতে কি, আমরা যাচ্ছিলাম বটে কিন্তু তিন্নি ও মউয়ের ব্যাপারে আমার দুশ্চিন্তা ছিল। সেটার সমাধান যে এভাবে হবে তা ভাবতেও পারিনি।"

এতক্ষণে তিন্নি বলল, "মেয়েরাও তা হলে ঘটে কিছু বুদ্ধি রাখে।"

ওরা সন্ধে পর্যন্ত গঙ্গার ধারে বসে এইসব আলোচনা করে যখন ঘরে ফিরল তখন সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। ঘরে ফিরেই দেখল শিবশঙ্করবাবু অপ্রত্যাশিতভাবে এসে বসে আছেন।

তিন্নি ও মউ প্রণাম করল শিবশঙ্করবাবুকে।

শুভঙ্কর বলল, "বাপি, তুমি হঠাৎ ?"

"কেন, আসতে নেই ?"

"না না। তা কেন ? তুমি এসেছ খুব ভাল হয়েছে বাপি। তিন্নি এসেছে, মউ এসেছে। কত আনন্দ। এর মধ্যে তোমাকে পেয়ে যে কী ভাল লাগছে আমার।"

"তা ওরা যে এসেছে আমাকে একবার জানাতে পারিসনি তো। ভাগ্যিস মা আমাকে ফোন করেছিলেন। তাই তো জানতে পারলাম।"

শুভঙ্কর বলল, "ফোন আমিও তোমাকে করতাম বাপি। তার কারণ একটি বিশেষ ব্যাপারে আমার কিছু টাকা আর তোমার অনুমতির দরকার।"

"কী ব্যাপার !"

"তিন্নি আর মউ নৈনিতাল যাচ্ছে। মউয়ের বড়মামা থাকেন লখনউতে। উনি নিয়ে যাবেন। বিল্টু যাবে। আমিও যাব বাপি ওদের সঙ্গে ?"

"নিশ্চয়ই যাবে। এ আর এমন কী ?"

শুভঙ্করের মা সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে এলেন, "ছেলে বলল, আর তুমিও অমনই রাজি হয়ে গেলে ? এই জুন মাসের গরমে ওদিকে কেউ যায় ?"

pathagar.net

"কেন যাবে না ? তা ছাড়া ওরা তো যাচ্ছে নৈনিতাল। সেখানে এখন কার্তিক মাসের ঠাণ্ডা।"

"সত্যি, তুমি পারও বটে।"

"শোনো তা হলে বলি, আমার ছেলের ব্যাপারে কোনও ভয়-ভীতিই আর আমার নেই। ভেতরে-ভেতরে ও যে কত বড় হয়ে গেছে তা টেরও পাইনি। ওকে দেখে আমার নিজের কৈশোর বয়সের কথা মনে পড়ছে। আমিই কি কম ছিলুম ? তবে ধলভূমগড় থেকে চিলকিগড়ের জঙ্গল পার হয়ে ঠাকরুনপাহাড় পর্যন্ত যে কিনা জীবন বিপন্ন করে এগিয়ে যেতে পারে, তার পক্ষে নৈনিতাল বেড়াতে যাওয়াটা একটা তুচ্ছ ব্যাপার।"

"তবু আমার ভয় করে।"

"নেহাত মায়ের অসুবিধে তাই। না হলে তোমাকেও বলতাম সঙ্গে যেতে। আর দু-একটা বছর যাক, তারপর নিয়মিত ট্রেনিং দেব ওকে। একটুআধটু শ্যুটিং তো ও জানে। এর পর রাইফেল শ্যুটিংটা রপ্ত করিয়ে দেব। পুলিশের উচ্চ পদে আজকের দিনে ওর মতো সাহসী ছেলেরই দরকার।"

মা আর কোনও কথা বললেন না।

তিন্নি ও মউকে নিয়ে শুভঙ্কর ওপরের ঘরে চলে গেল। তারপর অনেকক্ষণ ধরে খোশগল্পে মেতে রইল ওরা। বাপিও এলেন এক সময়। নৈনিতাল যাওয়ার ব্যাপারে বাপির উৎসাহও বড় কম নয়। উনি পথঘাটের বর্ণনা, সেখানে গিয়ে কোথায় কী দেখবার আছে, সব বলে দিলেন। সবচেয়ে বড় কথা, নিউ মার্কেটের বিউটি পারলারে গিয়ে তিন্নি ও মউয়ের চুল কেটে আসা এবং ছেলেদের পোশাক পরার ব্যাপারটাকে তিনি খুব বেশি গুরুত্ব দিলেন।

পরদিন সকালে বিল্টু, শুভঙ্কর, তিন্নি আর মউকে নিয়ে শিবশঙ্করবাবু নিজেই চললেন নিউ মার্কেট বেড়াতে। উনি সঙ্গে থাকায় ভালই হল। ওদের আর খোঁজাখুঁজি করতে হল না কোনও কিছু। প্রথমেই বিউটি পারলারে গিয়ে চুলগুলোর ব্যবস্থা করা হল। চুল কাটার পর তিন্নি আর মউকে আরও ভাল লাগল দেখতে। এর পর রেডিমেড পোশাক। প্যান্ট, শার্ট, মায় টুপিটি পর্যন্ত কেনা হয়ে গেল। নিউ মার্কেট থেকে বেরিয়ে একটি বড় হোটেলে খেয়েদেয়ে বাড়ি ফিরে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই সারাদিনের সমস্ত আনন্দের স্মৃতি ম্লান হয়ে গেল। এক জরুরি বার্তা এসেছে। শিবশঙ্করবাবুকে এক্ষুনি তাঁর কর্মস্থলে চলে যেতে হবে।

বার্তা শুনে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন শিবশঙ্করবাবু। তাঁর দু' চোখে যেন আগুন ছুটতে লাগল।

দু'জন সাদা পোশাকের পুলিশ এসেছিল শিবশঙ্করবাবুকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

শিবশঙ্করবাবু বললেন, "কখন ঘটল ব্যাপারটা ?"

"সকাল দশটার সময়।"

"কোয়ার্টারের আর কারও কোনও ক্ষতি হয়নি তো ?"

"না। চাকরটাই যা শুধু মারা গেছে। আসলে পেট্রল বোমা ছুঁড়েছিল তো

pathagar.net

ওরা।"

"ওদের টারগেট ছিলাম আমি। কিন্তু আমি যে নেই সেটা বোধ হয় জানত না।"

"খুব জানত। একটা চিঠিও দিয়ে গেছে আপনার নামে।"

"কই দেখি চিঠিটা?"

হাত পেতে চিঠি নিয়ে সেটা পড়েই বোমার মতো ফেটে পড়লেন শিবশঙ্করবাবু, "শয়তানগুলোর মাথা থেকে ওই ভূত কিছুতেই নামছে না দেখছি, বারবার সেই একই আবদার 'সোনার গণপতি'। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না ওই ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ের পরেও লোকটা বেঁচে আছে কী করে?"

এতক্ষণে কথা বলল শুভঙ্কর, "তুমি কার কথা বলছ বাপি?"

শিবশঙ্করবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, "শিকারিবাজের।"

"শিকারিবাজ! সে তো মরে গেছে।"

শিবশঙ্করবাবু হাসলেন। বললেন, "সেটা তো আমরা অনুমান করেছিলাম। অনেক চেষ্টা করেও ওর ডেড বডি আমরা পাইনি। তাই ধরে নিয়েছিলাম ও বোধ হয় বাঘের পেটেই গেছে। কিন্তু এখন দেখছি শয়তানের মৃত্যু নেই।"

তিন্নি আর মউয়ের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেলেও মুহূর্তমধ্যে মউয়ের চোখ দুটো বাঘিনীর মতো জ্বলে উঠল। ওর চোখের তারায়-তারায় নেচে উঠল প্রতিশোধের অগ্নিশিখা।

শিবশঙ্করবাবুকে যেতে হবে। কেননা তাঁরই কোয়ার্টারে হামলাটা হয়েছে। অতএব দায়িত্ব একটা আছেই। তাই চটপট তৈরি হয়ে নিলেন। যাওয়ার আগে একবার তিনি শুভঙ্করকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "শোনো শুভঙ্কর, আমি জানি আমার কাছে তুমি কোনও কিছুই লুকোবে না। তবু বলি, সত্যি-সত্যিই কি সোনার গণপতির ব্যাপারে তোমরা কিছু জানো?"

শুভঙ্কর বলল, "সোনার গণপতি আমাদের কাছেও রহস্যময়।"

"শিকারিবাজের কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস ওটা তোমাদের কাছেই আছে। তোমরা ওটাকে সকলের চোখের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছ কোথাও।"

"ওর এরকম ধারণা হওয়ার কারণ?"

"জানি না। যাই হোক, ওর শ্যেনদৃষ্টি যখন তোমাদের দিকে তখন খুব সাবধানে চলাফেরা করবে তোমরা। বিশেষ করে তিন্নি আর মউ পরের মেয়ে। এখানে এসে কিছু যদি হয়ে যায় তা হলে কিন্তু লজ্জার শেষ থাকবে না।"

শুভঙ্কর বলল, "তুমি নিশ্চিন্তে যেতে পারো বাপি। আমি ঠিক নিজেকে রক্ষা করতে পারব। সাপ যখন এতদিন বাদে আবার গর্ত থেকে বেরিয়েছে তখন ছোবল একটা দেবেই। আমি সতর্ক থাকব।"

শিবশঙ্করবাবু চলে গেলেন।

শুভঙ্করের চোখ দুটো ছলছলিয়ে উঠল।

তিন্নি ওর রুমাল দিয়ে শুভঙ্করের চোখের কোল দুটো মুছিয়ে দিয়ে বলল, "তুমি কাঁদছ শুভদা?"

"কই না তো।"

"এই তো, তোমার চোখে জল।"

pathagar.net

"আসলে বাপিকে আমি বড্ড ভালবাসি তিন্নি। আমার বাপির মতো মানুষ হয় না। আমার বড় ভয় করে, যদি ওরা একা পেয়ে বাপির কিছু করে বসে। একবার উনি বেঁচে গেছেন ওখানে ছিলেন না বলে। কিন্তু এবারে যদি কিছু হয় ?"

"না না। ওঁকে মারবার উদ্দেশ্য থাকলে উনি না থাকা অবস্থায় ওইসব করত না ওরা !"

"মউ বলল, "না করলেই ভাল।"

শুভঙ্কর বলল, "এখন ভালয়-ভালয় জিনিসটা যথাস্থানে দিয়ে আসতে পারলে বাঁচি।"

ওরা বিষণ্ণমনে ওপরের ঘরে গিয়ে নানারকম আলোচনা করতে লাগল। আলোচনার বিষয়বস্তু হল, শিকারিবাজ কি জানতে পেরেছে ওরা চার জুন পঞ্জাব মেলে যাচ্ছে চলে ?"

মউ বলল, "যদি শয়তানটা জেনে থাকে আর আমাদের পিছু নেয় তা হলে কিন্তু সোনার গণপতি আমাদের হারাতে হবে। কেননা আমরা মাত্র চারজন। ওরা যে কতজন তা জানি না। ওরা কোন ছদ্মবেশে কীভাবে আসবে, তার ঠিক কী ?"

শুভঙ্কর বলল, "গাড়িতেও কিন্তু আমাদের খুব সাবধানে যেতে হবে। একসঙ্গে সবাই মিলে ঘুমোলে চলবে না। দু'জন ঘুমোলে দু'জন জাগব।"

"হ্যাঁ। ওইরকমই করতে হবে। কিন্তু সেইদিন পর্যন্ত আমরা কি নিজেদের ঠিকভাবে রাখতে পারব ?"

"পারতেই হবে। আর আমার মনে হয় তোমরা দু'জনে কাল থেকে কেউ আর বাড়ির বাইরে বেরোবে না। তার কারণ, এমনিতেই তো চুল কাটার ফলে তোমাদের মুখের আদল একেবারেই পালটে গেছে। এর ওপর ছেলেদের পোশাক পরলে চেনে কার সাধ্যি। বিল্টু আর আমিও অন্যরকম মেকাপ নিয়ে নেব। সেইসঙ্গে আমাদের যাত্রার রুটটাকেও ঘুরিয়ে দেব একটু।"

"কীরকম !"

"আমাদের তো বেরিলি থেকে টনকপুর চম্পাওয়াত হয়ে যাওয়ার কথা। তার জায়গায় আমরা করব কি. কাঠগোদাম থেকে নৈনিতাল হয়ে আলমোড়ার ভেতর দিয়ে লোহাঘাট ছুঁয়ে পিথোরাগড় যাব।"

"তাতে লাভ ?"

"যদি ওরা আমাদের পরিকল্পনা টের পেয়ে থাকে তা হলে থিতিয়ে যাবে।"

অনেকক্ষণ ধরে এইসব আলোচনা করে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে শুতে গেল ওরা। তিন্নি আর মউ মায়ের কাছে শোয়। ওরা নীচেই শুল। আর শুভঙ্কর একা শোয় ওপরের ঘরে, তাই ওপরের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দারুণ চিন্তা মাথায় নিয়ে শুয়ে পড়ল চুপচাপ।

কিন্তু শুলেই কি ঘুম আসে ? তা যদি আসত তা হলে লোকে ঘুমের ওষুধ খেত না। বিশেষ করে দুশ্চিন্তা একবার মাথায় এলে সহজে ঘুম আসে না। শুভঙ্কর বিছানায় শুয়েও তাই এপাশ-ওপাশ করতে লাগল।

pathagar.net

রাত তখন কত তা কে জানে ? শুভদের বাড়ির পেছন দিক থেকে কালো

পোশাক পরা একজন লোক চতুর বেড়ালের মতো পাইপ বেয়ে কার্নিসে পা দিয়ে দোতলার ছাদে উঠল। সিঁড়ির দরজাটা খোলা ছিল বলে বারান্দায় নামতে একটুও অসুবিধে হল না তার। টর্চের আলোয় পা টিপে-টিপে সে এগিয়ে গেল শুভঙ্করের ঘরের দিকে।

এত রাতে এই লোক এখানে কেন ? এর মনের মধ্যে কোনও দুরভিসন্ধি নেই তো ? লোকটি খোলা জানলা দিয়ে উঁকি মেরে ঘরের ভেতর টর্চ ফেলে যেই না কিছু দেখতে যাবে অমনই মাথায় একটা প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে বসে পড়ল সেখানে।

সঙ্গে-সঙ্গে কে যেন বলল, "খুব বেশি লাগেনি তো ?"

লোকটি অতি কষ্টে বলল, "কে ?"

"আরে ! যার বাড়িতে এসেছ এত কষ্ট করে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে, আমি সে।" কথা শেষ হওয়া মাত্র আলোয় ভরে উঠল বারান্দাটা।

শুভঙ্কর এগিয়ে গিয়ে কালো পোশাক টেনে খুলল লোকটির। সম্পূর্ণ অচেনা মুখ। তবে মুখের কাঠিন্যে বোঝা যায় লোকটি খুব একটা সুবিধের লোক নয়।

লোকটি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল শুভঙ্করের দিকে। সে দৃষ্টিতে ভয় এবং বিস্ময় দুটোই ছিল।

শুভঙ্কর হাসি-হাসি মুখে বলল, "আমি জানতাম তুমি আসবে।"

লোকটির মুখে কোনও কথা নেই। হয়তো বাধা দেওয়ার ক্ষমতাও নেই তার। ফ্যালফ্যাল করে শুধু তাকিয়েই রইল শুভঙ্করের মুখের দিকে।

শুভঙ্করের বাঁ হাতে তখন লোহার রড আর ডান হাতে চকচক করছে একটি পয়েন্ট থ্রি রিভলভার। শুভঙ্কর এবার একটু গম্ভীর গলায় বলল, "তোমার শিকারি বাবা নিশ্চয়ই জানে যে আমার কাছে আমি বাজে জিনিস রাখি না।"

লোকটি এবার উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল।

শুভঙ্কর বলল, "এত তাড়াতাড়ি উঠবে কী ! এত রাতে এত কষ্ট করে এত দূরে এসেছ, আগে তোমার অভ্যর্থনাটা ঠিকমতো করি, তবে তো তুমি যাবে। তার আগে বলো, তুমি কি একাই এসেছ, না আর কেউ নীচে অপেক্ষা করছে তোমার জন্য ?"

এতক্ষণে ঠোঁট নড়ে উঠল লোকটির। বলল, "আমি একাই এসেছি।"

"কী নাম তোমার ?"

"আমার নাম জটা।"

এমন সময় সিঁড়ির কাছ থেকে তিন্নি ও মউয়ের গলা শোনা গেল, "ও কে শুভদা ?"

"রাতের অতিথি। সোনার গণপতি নিতে এসেছেন।"

"সে কী !"

ততক্ষণে মা-ঠাকুরমাও উঠে এসেছেন ওপরে। সবাই অবাক। বললেন, "কে রে ? কে ও ?"

"তোমরা চিনবে না। যাই হোক, তোমরা নীচে যাও। আগে একটা ফোন করো থানাকে। তাড়াতাড়ি।"

ঠাকুরমা বললেন, "কাউকে ডাকব ?"

pathagar.net

"না না। কোনও দরকার নেই। থানায় একটা খবর দিলেই হবে। দেরি কোরো না।"

মা-ঠাকুরমা দু'জনেই নীচে গেলেন।

জটা অসহায়ভাবে বসে রইল সেখানে। ওর দু'পাশে তিন্নি আর মউ। সামনে শুভঙ্কর।

শুভঙ্কর একটু ঠাট্টার সুরে বলল, "তারপর জটাদা, রডের ঘা-টা একটু বেশি জোরেই পড়েছে, না? মাথাটা তো বেশ ফুলে উঠেছে দেখছি। কী আর করবে? মাঝে-মধ্যে এরকম একটু-আধটু হয়েই যায়। আমি জানতাম তোমরা খুব শিগগিরই এখানে আসবে। তবে যে আজই এসে হাজির হবে এটা কিন্তু জানতাম না। যে-মুহূর্তে খবর পেলাম তোমরা বাপির কোয়ার্টারে ঝামেলা করেছ তখন থেকেই ধরে নিয়েছি বাপি এখান থেকে চলে গেলেই রাতের অন্ধকারে চুপিচুপি তোমরা আমাকে ভয় দেখাতে আসবে। আসলে ব্যাপারটা কী জানো, আমি অনেক কিছুই আগেভাগে একটু বেশি বুঝে যাই। বাপি আজ চলে গেছেন। তোমরা আজই এসেছ। তোমাদের কথা বেশি করে ভাবতে গিয়ে ঘুমই আসছিল না আমার। তাই চুপচাপ অন্ধকারে পায়চারি করছিলাম আর প্রতীক্ষা করছিলাম তোমাদের পদধ্বনি শোনবার জন্য। ঠিক করছিলাম এখন থেকে দিনে ঘুমিয়ে রাতে জাগব। তা ...।"

তিন্নি ও মউ পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল।

একটু চুপ করে থেকে জটা বলল, "তুমি খুব বুদ্ধিমান ছেলে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এখনও সময় আছে। যদি নিজের ভাল চাও তো আমাকে ছেড়ে দাও। আর সোনার গণপতি দিয়ে দাও শিকারিবাজকে।"

"সোনার গণপতি আমাদের কাছে আছে এ-কথা কে বলল তোমাদের?"

"শোনো তবে। শিকারিবাজ সম্ভাব্য মৃত্যুর হাত থেকে অনেকটা ভাগ্যের জোরেই বলতে পারো, রক্ষা পেয়ে নতুন উদ্যমে নব শক্তিতে নতুন দল গঠন করেছে। এই দলে আমরা পাঁচজন আছি। আমি, শিকারি, সৈয়দ রাজা, সামশের আর কালোবাবা। আমরা এই পাঁচজন এমন কোনও খারাপ কাজ নেই যা করতে পারি না। আমরা বেশ কিছুদিন ধরে ছদ্মবেশে তোমাদের পিছু নিয়ে তোমাদের সমস্ত গোপন কথাবার্তা শুনেছি। আর তাতেই জেনেছি তোমরা ওই সোনার গণপতিকে খুব শিগগির রাবণ হ্রদে ফেলতে চলেছ। কিন্তু তোমরা ছেলেমানুষ। তাই না জেনে ও-কাজ করতে চলেছ। প্রথমত, ও-পথের শুরুতেই দস্যুভয় আছে। দ্বিতীয়ত, ওই অমূল্য সম্পদ জলে ফেলা গঙ্গার জলে পয়সা ফেলার মতোই অর্থহীন। আর তৃতীয়ত, হাজার চেষ্টা করলেও ও-কাজ তোমরা কখনও করতে পারবে না। কেননা, তোমরা হয়তো জানো না তিব্বত এখন চিনের অধীনে। সীমান্ত জুড়ে সে কী ভীষণ পাহারা। তাই বলি, হাতে হাত মেলাও বন্ধু। একদিকে সোনার গণপতি, অপরদিকে তোমার বাবা, মা, ঠাকুরমা, তুমি —তোমার এই গোলাপি বন্ধুরা, বিল্টুবাবু, সব এখন ভেবে দ্যাখো কী করবে?"

"ভেবে দেখেছি। তোমাদের মাথাগুলো ফুটো করার জন্যে পাঁচটা বুলেট আমাকে অবশ্যই খরচা করতে হবে।"

"এই এত প্রাণের চেয়েও ওই ধাতব মূর্তিটা তা হলে তোমার কাছে এত বড়

pathagar.net

হল ?"

"না। তার চেয়েও বড় হল তোমাদের পাঁচজনকে একই সঙ্গে জ্যান্ত কবরে দেওয়া।"

"এই তা হলে তোমার শেষ কথা ?"

"হ্যাঁ। এই আমার প্রথম এবং শেষ কথা।"

এইটুকু কথা বলার ফাঁকেই অনভ্যস্ত শুভঙ্করের হঠাৎ অসতর্কতায় জটা ওর কবজি লক্ষ্য করে সজোরে একটা লাথি মারল। লাথির চোটে হাত থেকে রিভলভারটা ছিটকে পড়ল সিঁড়ির নীচে। আর সেই সুযোগে তিন্নি ও মউকে দু'হাতে ঠেলে দিয়েই চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল জটা।

ওরা কী যে হল তা ভেবে দেখার আগেই নাগালের বাইরে চলে গেল সে। একটু পরে যখন পুলিশ এল তখন আর কোনও আতঙ্ক নেই। পুলিশ এসে সব কিছু লিখে নিয়ে বাড়ির সামনে পাহারা বসিয়ে তাদের কর্তব্য করে গেল।

॥ ১৬ ॥

দেখতে-দেখতে যাওয়ার দিন এগিয়ে এল। এই ক'দিনে আর কোনও উপদ্রব নেই। কোনও হুমকি নেই। কোনও চিঠিপত্তর নেই। ব্যাপারটা এমন হল যেন সব কিছুর মীমাংসা হয়ে গেছে। বিল্টু আর তিন্নি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেও শুভঙ্কর ও মউ কিন্তু অন্য আশঙ্কা করল। ওরা ধরেই নিল শিকারি আর এখানে কোনওরকম গোলমাল না পাকিয়ে যা করবার তা বাইরে গিয়েই করবে। অর্থাৎ পাহাড়ে-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে, অতি নির্জনে ওদের বাগে পেয়ে সশস্ত্র পাঁচজনে একত্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে ওরা। তবু কী আর করা যায় ? বিপদের ঝুঁকি নিয়ে যেতেও তো হবে। বেশ আনন্দ করেই যাচ্ছিল ওরা। কিন্তু বিপদের কালো মেঘ অকালবৈশাখীর ঝড়ে হঠাৎই কোথা থেকে উড়ে এল যেন। স্মৃতির পাতা থেকে মুছে যাওয়া শিকারিবাজ এক অশুভক্ষণে এমনভাবে এসে হাজির হল যে, সমস্ত পরিকল্পনাটাই বানচাল হতে বসেছে। অথচ উপায়ও নেই। যেতে ওদের হবেই। এখন গণপতি নিজেই নিজেকে রক্ষা করবেন।

জুনের চার তারিখে একটু বেলাবেলিই ওরা এসে হাজির হল হাওড়া স্টেশনে। আট নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে ওদের গাড়িটা। এঞ্জিনের পরের বগিতেই ওদের বার্থ। এই প্রথম এইরকম দূরপাল্লার গাড়িতে চাপা ওদের। কী ভাল যে লাগল ! ভয়ও করল একটু। ভয়ের কারণ এই, যতই সব কিছু বই পড়ে জানা থাক, যতই সব কিছুর বিবরণ বারবার মুখে শোনা থাক, তবু তো অজানা অচেনা দেশে পাড়ি দেওয়া এই প্রথম। তা ছাড়া শুভঙ্কর খুব আশা করেছিল বাপি অন্তত একদিনের জন্যও ছুটি নিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। কিন্তু কেন যে তিনি এলেন না, তা কে জানে ? পর-পর দু'দিন ফোনে লাইনও পাওয়া যায়নি তাঁর।

ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ওরা চারজনেই কেমন যেন বোবা হয়ে গেল। শুভঙ্করের খুব মন কেমন করতে লাগল ওর মায়ের জন্য। যে দুর্গম পন্থার পথিক ওরা, সেখান থেকে আর কি কখনও ওরা ফিরে আসবে ? আর কি কখনও দেখতে পাবে মাকে, বাপিকে, ঠাকুরমাকে ?

বিল্টু বলল, "তুই হঠাৎ এমন গম্ভীর হয়ে গেলি কেন শুভ ?

শুভঙ্কর সে-কথার কোনও উত্তর দিল না।

মউ বলল, "কচি খোকার মন কেমন করছে বুঝি মায়ের জন্য ?"

এবার হেসে ফেলল শুভঙ্কর। বলল, "তা একটু করছে বইকী।"

"আমাদের বুঝি কেউ নেই ?"

শুভঙ্কর বলল, "সবার সব কিছুই আছে। তবে দুর্যোগের মেঘ মাথায় নিয়ে দূর দেশে যাচ্ছি। তার ওপর সঙ্গে আছে এক দুর্লভ সামগ্রী। সেইজন্যই মনটা কীরকম হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য এখন আর খুব একটা আন-ইজি ফিল করছি না। বাড়ির কথাও সরিয়ে ফেলছি মন থেকে।"

"তা হলে ?"

"এখন শুধু ভাবছি বিপদটা কোন দিক থেকে কখন কীভাবে এসে হাজির হবে।"

মউ বলল, "সে যখন যা হওয়ার হবে। শুধু-শুধু আগে থেকে ওইসব ভেবে মন খারাপ করা কেন ?"

ট্রেন তখন ব্যান্ডেল পার হয়ে বর্ধমানের দিকে দ্রুতগতিতে ছুটছে। ব্যান্ডেলে স্টপ নেই। তাই থামেনি। একেবারে বর্ধমান থামবে। আজ প্রচণ্ড গরমের দিন। একফোঁটা মেঘ নেই আকাশে। বৃষ্টি নেই। প্রাণ যেন আইঢাই করছে। ওরা গাড়ির খাবার বেঁধে এনেছে বাড়ি থেকে। পলিথিনের একটা মাঝারি সাইজের জলের জায়গায় জল ভরে নিয়েছে।

বিল্টু বলল, "বর্ধমানে গাড়ি থামলে আমরা খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়ব, কী বল ?"

শুভঙ্কর বলল, "হ্যাঁ। সব লোকই মনে হয় তাই করবে। দেখছিস না সবাই কেমন খোশমেজাজে গল্প জুড়ে দিয়েছে।"

মউ বলল, "ততক্ষণ একটু ঠাণ্ডা কিছু খেলে হত না ?"

শুভঙ্কর বলল, "না। আমার বাপি আমাকে বারবার বলে দিয়েছেন রেলযাত্রায় ঠাণ্ডা পানীয় কখনও না খেতে। কেননা এগুলোর কোনওটাই আসল নয়। তার চেয়ে দুটো বাদাম-চানাচুর খেয়ে জল খেতে পারো ?"

"ওরে বাবা। এই গরমে ওসব কিছু খেতে মন চাইছে না।"

"তা হলে চুপচাপ বসে-বসে বাইরের জগতের দিকে দৃষ্টি মেলে দাও। চেয়ে-চেয়ে দেখো চিরুনির দাড়ার মতো কেমন ক্লিক-ক্লিক করে স্টেশনগুলো পার হচ্ছে।"

"কী দেখব ? বড় অন্ধকার যে ?"

তিন্নি বলল, "এর চেয়ে বরং আমরা বসে-বসে সহযাত্রীদের মুখগুলো দেখি। আমরা বরং অনুমান করবার চেষ্টা করি এদের মধ্যেই শিকারির কোনও লোক ছদ্মবেশে আছে কি না।"

বিল্টু বলল, "তিন্নি ঠিক বলেছে। এখন থেকেই আমাদের কাজ শুরু হোক। আমাদের প্রধান লক্ষ্য হোক সহযাত্রীদের দিকে নজর রাখা।"

বিল্টু ও শুভঙ্কর কামরাটার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত বেশ কয়েকবার পায়চারি করে বুঝে নিল এই বগিতে আর যাই হোক অন্তত সন্দেহ করার মতন কেউ নেই।

বিল্টু-শুভঙ্কর টহল দিয়ে এলে তিন্নি আর মউ গেল। ওরা ঘুরে এসে বলল,

pathagar.net

"না। সেরকম কেউ আছে বলে তো মনে হয় না। তবে একটা খুব অসুবিধের ব্যাপার আছে।"

"কীরকম!"

"বাথরুমের কলে জল নেই।"

"সে কী! দূরপাল্লার গাড়ি, অথচ কলে জল নেই?"

এক বাঙালি পরিবার নৈনিতাল যাচ্ছিলেন। এই ট্রেনে লখনউ পর্যন্ত যাবেন তাঁরা। ওদের মুখে এই কথা শুনেই লাফিয়ে উঠলেন, "কী বললে? কলে জল নেই?" বলেই তাঁরা দু-তিনজন মিলে এগিয়ে গেলেন কোচ অ্যাটেনডেন্টের দিকে, "বলি শুনছেন দাদা! বছর-বছর রেলের ভাড়া তো বাড়াচ্ছেন। কিন্তু এসব কী! গাড়িতে জল না ভরেই হাওড়া থেকে ছেড়ে দিলেন? এখন ছেলেমেয়ে নিয়ে করব কী? তার ওপর এত লোক।"

"এতে আমার তো কিছু করবার নেই দাদা। জল ভরবার লোক আলাদা।"

"বেশ তো। বর্ধমানে ট্রেন থামলে গার্ডকে বলুন। স্টেশন মাস্টারকে জানান। না হলে আমি কিন্তু চেন টানব। গাড়ি যেতে দেব না।"

"সেটা আপনার ইচ্ছে।"

দেখতে-দেখতে বর্ধমান এসে গেল। কিন্তু জলের ব্যবস্থাও হল না। চেনও টানল না কেউ। গাড়ি আপন গতিতে ছুটে এসে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত থেমে আবার ছুটে চলল ঝড়ের বেগে।

সবাই খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে শুয়ে পড়ল যে-যার। জানলার ধারে সাইড লোয়ার-আপার বার্থ পড়েছিল। তাই একদিকে নীচে-ওপরে করে বিল্টু ও তিন্নি শোওয়ার ব্যবস্থা করল। অপরদিকে শুয়ে পড়ল মউ ও শুভঙ্কর। তিন্নি ও মউকে শুতে দেওয়া হল আপার বার্থে। লোয়ার বার্থে শুল বিল্টু, শুভঙ্কর। পয়েন্ট থ্রি-টা সুকৌশলে হাতের কাছেই রাখল শুভঙ্কর। সোনার গণপতি রইল তিন্নির কাছে। কলার পেটোয় মুড়ে তার ওপর ছেঁড়া কাপড় জড়িয়ে সেই দুষ্প্রাপ্য বিগ্রহকে বুকে নিয়ে শুয়ে রইল তিন্নি। রাতের অন্ধকার বিদীর্ণ করে পঞ্জাব মেল সাঁ-সাঁ করে ছুটে চলল। সে কী প্রচণ্ড গতি! এক-এক সময় মনে হতে লাগল ট্রেনটা ছুটতে-ছুটতে লাইন থেকেই ছিটকে পড়ে যাবে বুঝি। কিন্তু না। সেসব অপ্রিয় ব্যাপার কিছুই ঘটল না। বরং কিছু সময়ের মধ্যেই ট্রেনের দুলুনিতে দু'চোখ জুড়ে ঘুম নেমে এল। এক-এক করে ঘুমিয়ে পড়ল সবাই।

সেই ঘুম ভাঙল পরদিন ভোরবেলা, পাটনাতে। একটা প্রচণ্ড হইচই শুনে জেগে বসল ওরা। তিন্নি হাত বুলিয়ে দেখল গণপতি ওর বুকের কাছে ঠিকই আছেন। কী ব্যাপার। এত হইচই কেন? দেখল দলে-দলে লোকজন ভিড় করে ঢুকে পড়েছে ওদের কামরায়। সে যে কত লোক তার ঠিক নেই। সেই লোকেরা উঠেই একেবারে ওদের যেন ঘাড়ে চেপে বসল।

মউ বলল, "এ কী! এটা তো রিজার্ভ কামরা।"

শুনে একজন যাত্রী বললেন, "রিজার্ভ কামরা তো কী হয়েছে? এখনও বার্থে শুয়ে ঘুমোবে নাকি? আবার সেই রাত্রিবেলা বার্থ পাবে। এখন সারাটা দিন চলবে এইরকম। সরে বোসো।"

তিন্নির চোখে প্রায় জল এসে গেল এইরকম অবস্থা দেখে। বলল, "এইভাবে কি এতটা পথ যেতে হবে আমাদের? এ যে অমানুষিক ব্যাপার। একে তো কলে জল নেই, তার ওপর এত লোকের ভিড়। মুখে-চোখে জল পর্যন্ত দেওয়া

pathagar.net

হল না।"

শুভঙ্কর বলল, "আরে, তিন-চার ঘণ্টার পর মুঘলসরাই নামে একটি বড় জংশন আসবে। শুনেছি ট্রেন সেখানে আধ ঘণ্টা দাঁড়ায়। আমরা ওইখানেই স্টেশনে নেমে মুখ-হাত ধুয়ে নেব। আপাতত এক কাপ করে চা খাওয়া যাক।"

তিন্নি আর মউ নাক-মুখ সিঁটকে বলল, "ওরে বাবা, আমরা কিচ্ছু খাব না। তোমরা দু'জনে খাবে তো খাও।"

বিল্টু, শুভঙ্কর চা কিনল। ওরা চায়ে চুমুক দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ছেড়ে দিল ট্রেন। দানাপুর, আরা, বক্সারের পর ট্রেন এসে থামল মুঘলসরাইতে। ওরা দু'জন-দু'জন করে প্ল্যাটফর্মে নেমে দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে নিল।

এদিকে বেলা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে প্রচণ্ড তাপমাত্রায় লু বইতে লাগল চারদিক থেকে। সে কী প্রচণ্ড জ্বলুনি। কাশীর গঙ্গা পার হয়ে বারাণসী, প্রতাপগড়, আমেথি, রায়বেরিলির দিকে যত এগোয় ততই জ্বলতে থাকে সব। জলের জায়গার মধ্যে জল যেন ফুটছে। এত গরম হয়েছে জলটা। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে, তবু সে-জল খাওয়া যাচ্ছে না। সমস্ত চেতনা যেন ক্রমশ লোপ পেয়ে আসছে ওদের। খবর পাওয়া গেল পাশের কামরায় একটি মেয়ে নাকি অজ্ঞান হয়ে গেছে। বাইরের গরম হাওয়া জানলা দিয়ে ঢুকে গায়ে ফোস্কা হয়ে যাচ্ছিল বলে জানলাটা বন্ধ করে দিল শুভঙ্কর।

এখন বিকেল চারটে তিরিশ। ট্রেন লখনউ স্টেশনে ঢুকছে। বেরিলি এখনও অনেক দূর। এখান থেকেও ঘণ্টা চারেকের পথ।

শুভঙ্কর বলল, "রেলযাত্রার এমন বিভীষিকার কথা আমি আগে কখনও শুনিনি। কত স্বপ্নের, কত আনন্দের রেল-ভ্রমণ যে এত বিরক্তিকর, তা কে জানত! এখন মনে হচ্ছে লখনউ থেকে নৈনি এক্সপ্রেসে রিজার্ভেশনটা পেলেই ভাল হত। আর ট্রেনে থাকতে একটুও ইচ্ছে করছে না।"

এমন সময় মউ হঠাৎ বলল, "শুভঙ্কর! ওই লোকটার দিকে একবার তাকিয়ে দ্যাখো। কী বীভৎস ওর মুখখানা। মনে হচ্ছে যেন কোনও কিছুতে খাবলে-খুবলে খেয়েছে ওকে। নখ দিয়ে আঁচড়েছে। একটা চোখও উপড়ে নিয়েছে বুঝি। লোকটা এক চোখে কেমন সাপের মতো তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে।"

শুভঙ্কর বলল, "সত্যিই তো। কী সাঙ্ঘাতিক।"

মউ বলল, "নিশ্চয়ই কখনও ভালুকের হাতে পড়েছিল বেচারা।"

বিল্টু আর তিন্নি বলল, "একে তুই বেচারা বলছিস? লোকটার চোখমুখ লক্ষ কর। আমরা কিন্তু রীতিমত ক্রাইম অনুভব করছি। ও সেই থেকে আমাদের দিকেই বা তাকিয়ে আছে কেন?"

লোকটি ওদের দিকে তাকিয়ে মৃদু একটু হাসল। সেই হাসির মধ্য দিয়েও চলকে উঠল একঝলক নিষ্ঠুরতা। পরের স্টেশন সাজাহানপুরে নেমে গেল লোকটি।

এক ঘণ্টা লেটে রাত দশটায় ট্রেন এসে থামল বেরিলিতে। সবাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

ওরা নেমে পড়ল ট্রেন থেকে। এখন স্টেশনের কাছাকাছি কোনও একটা হোটেলে ঢুকে পড়তে পারলেই কাল সকালে টনকপুর। কিন্তু এত রাতেও

pathagar.net

বেরিলি শহর জ্বলছে। বাতাসে আগুনের হলকা। ঘরবাড়ি, পথঘাট সব কিছু তেতে আছে। একফোঁটা বৃষ্টিও যে হয়নি কতদিন, তা কে জানে ? স্টেশন থেকে বেরিয়েই ওরা দেখল এক জায়গায় একটি মন্দিরে এক বিশাল হনুমানজির আরতি হচ্ছে। তার পাশেই আছেন রাম-সীতা এবং গণপতি। তবে সোনার নয়, পাথরের। ওরা সেইখানেই এক জায়গায় একটি হোটেলের দোতলায় পাশাপাশি দুটো ঘর পেয়ে গেল। একটিতে রইল তিন্নি আর মউ। অপরটিতে বিল্টু, শুভঙ্কর। ঘর পেয়ে ঘরে চাবি-তালা দিয়ে নীচের হোটেলে ডাল-ভাত ও ভেণ্ডি ভাজা খেয়ে পেট ভরাল। এখন এই অগ্নিকুণ্ডে শুয়ে কোনওরকমে এক ঘুম দিয়ে সকালটা এলেই পাড়ি দেবে টনকপুরের পথে। টনকপুরে নিশ্চয়ই এত গরম হবে না। ওরা শুনেছে হিমালয়ের কোলে সে এক অপূর্ব জায়গা।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই গরমের জ্বালা জুড়োতে তিন্নি ও মউ স্নানের জন্য তৈরি হল।

শুভঙ্কর বলল, "উঁহু। এখন স্নান নয়। এখন আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে টনকপুরে চলে যাই চল। ওখানে হিমালয়ের হিম-গলা জল নিয়ে সারদা নদী বয়ে আসছে। তাতেই স্নান করে দেহ ঠাণ্ডা করব। এখন চলো মুসাফির।"

ওরা বাথরুমের কাজ সেরে মালপত্তর নিয়ে নীচে নেমে এল। তারপর স্টেশনের কাছে একটা দোকানে বসে চা খেয়ে গরম-গরম জিলিপি খেল। এর পর চলল টনকপুরের বাস ধরতে। কিন্তু বাসস্ট্যান্ড এখান থেকে অনেক দূরে। দু'জন রিকশওয়ালা এগিয়ে এসে বলল, "টনকপুরকা বাস পাকড়েগা ? চলো, উঠো। পাঁচ-পাঁচ রুপিয়া লাগেগা।"

এরা কোনওরকম দরদস্তুর না করেই উঠে বসল রিকশয়। রিকশওয়ালারাই বলল, টনকপুরের একটানা বাস যদিও না পাওয়া যায়, পিলিভিতের বাসে উঠলেও হবে। কেননা টনকপুর থেকে পিলিভিত এবং পিলিভিত থেকে টনকপুরের বাস পনেরো মিনিট অন্তর ছাড়ে। এরই মাঝে দু-একটি টানা বাস। তা কপাল ভালই বলতে হবে। কেননা ওরা বাসস্ট্যাণ্ডে পৌঁছনো মাত্রই দেখল একটি টনকপুরের বাস ছাড়ায় অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

ওরা রিকশর ভাড়া মিটিয়ে বাসে উঠে যে যার পছন্দসই জায়গা বেছে নিল। অবশ্য ভিড় তো নেই। তাই এক-একজন এক-একটি জানলার ধার ম্যানেজ করল।

কুমায়ূন-রোহিলখণ্ড ডিপোর সরকারি বাস। ছেড়েই ছুটতে লাগল শাঁ-শাঁ করে।

কনডাক্টর এসে টিকিট কাটলেন। ভাড়া এক-একজনের ষোলো টাকা পঞ্চাশ পয়সা। এক অপূর্ব প্রকৃতির মধ্য দিয়ে বাস এগিয়ে চলল টনকপুরের দিকে। রিঠোরা, নবাবগঞ্জ হয়ে বাস এসে থামল পিলিভিতে। এই অঞ্চলের মধ্যে এই জায়গাটা খুব নামকরা। এখানে প্রচুর বাঙালি বাস করেন। পিলিভিতে আধঘণ্টা থেমে বাসটি লোকাল হয়ে যাত্রী তুলতে-তুলতে মন্থর গতিতে যেতে লাগল। এর পর মঝৌলা, তারপর ছোট্ট জগবুড়া নদীর ব্রিজ পেরোতেই গগনচুম্বি হিমালয়ের উচ্চ শিখর নজরে এল। চকরপুরা নামে একটি জায়গায় এসে টাইম নেওয়া হল বাসের। এর পর খাটিমা, তারপর বনবাসা। অনেক শিখ যাত্রী

উঠেছিলেন বাসে। এঁরা সবাই খাটিমায় নেমে গেলেন। কেননা এঁরা যাবেন নানকমাতা গুরুদ্বারে। আর নেপালি যাত্রী যাঁরা, তাঁরা নামলেন বনবাসায়। বনবাসায় সারদা নদীর সেতু পেরিয়ে ওপারে নেপালের মহেন্দ্রনগরে যাবেন তাঁরা।

মউ বলল, "আমার খুব নেপাল যেতে ইচ্ছে করে। বাড়ি ফেরার সময় হাতে টাকাপয়সা থাকলে মহেন্দ্রনগর আমি না ঘুরে যাব না কিন্তু।"

বিল্টু বলল, "আমারও তাই ইচ্ছে।"

এখান থেকে টনকপুর মাত্র দশ কিমি। তাই কিছু সময়ের মধ্যেই টনকপুরে পৌঁছে গেল ওরা। একেবারে স্ট্যান্ডে ঢুকিয়ে ড্রাইভার থামালেন বাস। ওরা ঝুপঝাপ করে নেমে পড়ল বাস থেকে। কী আনন্দ! কী আনন্দ! কিন্তু কী অসহ্য গরম। আর তেমনই রোদের তাপ।

ওরা বাসস্ট্যান্ড থেকে সামান্য একটু এগোতেই রাস্তার বাঁ দিকে পর-পর দুটি লজ দেখতে পেল। তারই একটিতে ঢুকে পড়ল ওরা। স্বপ্না লজ। লজটি একজন সর্দারজির। অবশ্য কাজের লোকেরা সবাই নেপালি। ব্যবহারও খুব ভাল। এক-একটি ঘরের জন্য ত্রিশ টাকা করে ভাড়া। প্রতি ঘরে দুটি করে ক্যাম্পখাট। আলো-পাখা আছে। তবে কমন বাথ।

লজটি দোতলা। ওরা দোতলার ঘর নিচ্ছিল। কিন্তু কাজের লোকেরা বারণ করল। বলল, "এই গরমে ওপরের ঘর কেউ নেয় না। নীচের ঘর ঠাণ্ডা। বিশেষ করে আজ পাঁচদিন বিদ্যুৎ নেই শহরে। তাই পাম্পে জল উঠছে না। আলো জ্বলছে না। পাখা ঘুরছে না।"

শুভঙ্কর বলল, "সে কী! তা হলে গরমে মরে যাব তো?"

"উপায় নেই। সব জায়গায় এই একই ব্যাপার চলছে। তাই আজ দুপুর থেকে বন্ধ শুরু হচ্ছে এখানে। অফিস, আদালত, দোকানপত্তর, ব্যাঙ্ক, সিনেমা হল সব বন্ধ।"

"কতদিন চলবে এইরকম?"

"যতদিন না সরকার বিদ্যুৎ দিতে পারেন।"

চারজনের মুখই শুকিয়ে গেল ভয়ে। বলল, "সেরেছে। কাল সকালেই যে আমাদের পিথোরাগড়ের বাস ধরতে হবে।"

"ধরবেন। বাস বন্ধ নয়। রেল আর বাস ছাড়া সব কিছুই বন্ধ।"

"ঠিক বলছ?"

ছেলেটি হাসল। বলল, "ঝুটমুট বলে কোনও লাভ আছে? এখন এক কাজ করুন। বাথরুমে জল নেই। যদি স্নান করতে চান তো নদীতে চলে যান। খাবার জল আমি ভরে দিচ্ছি। দুপুরে আপনাদের কষ্ট হলেও রাতে আমরা জেনারেটর চালাব। পাখা ঘুরবে। আলো জ্বলবে।"

রাত্রিবেলা পাখা ঘুরবে বা আলো জ্বলবে শুনে বুকে যেন বল এল। ওরা ঘরের ভেতর জিনিসপত্র রেখে আসল জিনিসটাই শুধু সঙ্গে নিয়ে চলে এল সারদা নদীতে।

নদীতে তখন বাড় এসেছে। অর্থাৎ পাহাড়ে বৃষ্টি হচ্ছে। তাই জল বাড়ছে। জলও ঘোলা। প্রচণ্ড গতি। বড়-বড় সাদা-সাদা গোল পাথরের বুকের ওপর

pathagar.net

দিয়ে পুণ্যতোয়া সারদা প্রবল প্রবাহে ছুটে চলেছে। নদীর ওপারে ঘন দেওদার বন ও পাহাড়। এপারে নদীতে সারি-সারি ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। একদল লোক রাস্তা তৈরির জন্য নদীগর্ভ থেকে পাথর তুলে ট্রাক বোঝাই করছে। প্রকৃতির ওপর থেকে মানুষের এই অমানুষিক লোভের হাত সরিয়ে না নিলে এর পরিণাম যে কী, কেউ তা ভেবে দেখে না। জঙ্গল কাটতে-কাটতে পর্বত যেমন শ্রীহীন হয়েছে, তেমনই পাথর সরাতে-সরাতে নদীও একদিন শ্রীহীন হবে। এই সমস্ত উপলখণ্ড উঠিয়ে নিলে নদীকে তখন খাল ছাড়া অন্য কিছু বলে মনেই হবে না। কিন্তু কার কী তাতে যায়-আসে ? সৌন্দর্য তো সবাই চায় না।

ওরা স্নানের জন্য জলে নামতেই মনে হল পা দুটো যেন কেটে নিল কেউ। সে কী দারুণ ঠাণ্ডা জল ! বরফগোলা তো বরফগোলা। তাও হাঁটুর নীচে। আর অসম্ভব টান বলে কোনওরকমে হাতের অঞ্জলি ভরে জল নিয়ে ঝাপটা দিয়ে-দিয়ে স্নান হল। বিল্টু আর শুভঙ্কর স্নান করলেও তিন্নি ও মউ এই খোলামেলা জায়গায় ওদের ছদ্মবেশের মুখোশ খুলে যাওয়ার ভয়ে স্নান করতে পারল না।

ফেরার পথে বাজারের কাছে একটা হোটেলে পেট ভরে খেয়ে নিল সকলে। তারপর ঘরে এসে যে যার ক্যাম্পখাট বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। সন্ধের আগে তো গরমের জন্য ঘর থেকে বেরনো যাবে না। এখন একটা ঘুম দেওয়া যাক। কিন্তু কিছুক্ষণ শোওয়ার পরই লাফিয়ে উঠল সকলে। ওঃ, সে কী প্রচণ্ড ছারপোকা। কামড়ের পর কামড় দিয়ে যেন অস্থির করে তুলল। শরীরের সমস্ত রক্ত শুষে নিতে লাগল চনচন করে।

তিন্নি আর মউ পাশের ঘরে শুয়ে ছিল। ছুট্টে উঠে এল। মউ বলল, "একে তো কারেন্ট নেই। তার ওপরে এইরকম ছারপোকার কামড়। কী করি বলো ?"

শুভঙ্কর বলল, "করবার কিছু নেই। এই তো সবে শুরু। এখন তো পাহাড়ের পাদদেশে আছি। এর পর যত ওপরে উঠব, ততই নানারকম অসুবিধে হবে।"

"কিন্তু এভাবে কি শোওয়া যায় ? ছেলেটাকে ডেকে বলো না একটু স্প্রে করতে।"

"কোনও লাভ হবে না। এক কথায় বলে দেবে ওসবের ব্যবস্থা নেই।"

তিন্নি বলল, "ব্যবস্থা থাকলে কি এত ছারপোকা এখানে থাকত ?"

শুভঙ্কর বলল, "এখন একটাই উপায় হচ্ছে, আমাদের সঙ্গে আনা পলিথিনের শিটগুলো ক্যাম্পখাটের ওপর বিছিয়ে শুয়ে পড়া। ছারপোকারা এতেই জব্দ। ওরা পলিথিন ভেদ করে কামড়াতে পারে না, ওর ওপর দিয়ে চলতেও পারে না।"

"তাই নাকি ?"

"হ্যাঁ। বাবার মুখে শুনেছি। ওঁকে তো প্রায়ই বাইরে-টাইরে যেতে হয়। তখন উনি ওইরকম ব্যবস্থা নেন।"

তিন্নি-মউ আর পাশের ঘরে গেল না। মউয়ের ফর্সা মুখ রাগে লাল হয়ে গেছে। ওরা ওদের ঘরে তালা দিয়ে এসে এই ঘরেই জানলা-দরজা খুলে ক্যাম্পখাট সরিয়ে মেঝেয় পলিথিন পেতে তার ওপরে বসে-বসে গল্প করতে

pathagar.net

লাগল।

শুভঙ্কর বলল, "এখানে এসে যেরকম উৎকট গরম আর রোদের তেজ দেখছি তাতে সন্ধের আগে বাইরে বেরনো যাবে না। আমাদের প্রথম কাজ হবে কাল সকালে পিথোরাগড়ের ফার্স্ট বাস ক'টায়, তা জেনে নেওয়া। তারপর সময় থাকলে একবার নদীর ঘাটে যাব। না হলে ঘোরাফেরা করব এখানেই।"

বিল্টু বলল, "সময় কাটানোর জন্য একটা সিনেমাও দেখা যেত। কিন্তু কপালগুণে আজ আবার সবই বন্ধ।"

মউ বলল, "তবে এখানে এসে যেরকম জমজমাট দেখছি তাতে মনে হচ্ছে শিকারিবাজ যদিও এখানে আসে খুব একটা বেকায়দায় ফেলতে পারবে না আমাদের।"

শুভঙ্কর বলল, "ভয় তো এখানে নয়। ভয় হচ্ছে ওপরে। এটা ভারত-নেপাল সীমান্ত নগরী। মিলিটারি বেস।"

ওরা কিছুক্ষণ চুপচাপ দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পা দোলাতে লাগল। তারপর একসময় তিন্নি বলল, "এখন পর্যন্ত আমরা নিরাপদ। কিন্তু রেলের সেই ভয়াবহ লোকটি যে সাজাহানপুরে নেমে গেল তার কথা কিছু ভেবেছেন?"

শুভঙ্কর বলল, "না। তবে আমার মনে হয় লোকটি হয়তো স্থানীয়। ওর এইরকম চেহারা দেখেই আমরা আতঙ্কিত হয়েছি। শিকারির দলের লোক হলেও আমাদের পিছু ছাড়ত না।"

মউ বলল, "তা ছাড়া লোকটা তো সাজাহানপুরে নেমে গেল।"

বিল্টু বলল, "তাতে কী? ওটা তো নকশাও হতে পারে? ও হয়তো ওখানে নেমে পাশের কম্পার্টমেন্টে গিয়ে খুব চাতুর্যের সঙ্গে আমাদের দিকে নজর রাখছে।"

ওরা যখন এইসব আলোচনা করছে, তেমন সময় লজের সেই ছেলেটি এসে বলল, "ভাইজি লস্যি লাগেগা?"

"কত করে?"

"পাঁচ-পাঁচ রুপাইয়া।"

"নিয়ে এসো।"

ছেলেটি চলে গেল। তারপর বেশ কিছুক্ষণ বাদে একটা ট্রে-তে করে চার গেলাস লস্যি এনে হাজির করল ওদের কাছে।

ওরা লস্যি খেতে-খেতে আবার শুরু করল আলোচনা।

শুভঙ্কর বলল, "তিব্বতে আমরা ঢুকতে পারব কি না জানি না। তবে কালকের বাসে পিথোরাগড় গিয়ে সেখানে একরাত কাটিয়ে তারপরে চলে যাব গারবিয়াং। সেইখানে গিয়ে যেভাবেই হোক আমাদের খুঁজে বের করতে হবে চেমং দাওয়া লামার পরিবারের যদি কেউ থাকেন, তাঁদের। তাঁর স্ত্রী শিরিং এতদিনে গত হয়েছেন নিশ্চয়ই। তবে ছেলেমেয়ে, নাতিনাতনিরা যদি থাকে তাদের সঙ্গেই আলোচনা করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।"

সবাই বলল, "হ্যাঁ। শুভস্য শীঘ্রম। আসল কাজ শেষ হলে বাড়িতে একটা করে চিঠি দিয়ে মনের আনন্দে সব কিছু ঘুরে দেখে তারপর বাড়ি ফিরব।"

আলোচনা শেষ করে কোনওরকমে দুপুরটা কাটাল ওরা। কিন্তু তারপরে

বিকেল হলেও রাস্তায় বেরোবার সাহস হল না ওদের। চারটে—সাড়ে চারটে। তখনও কী রোদের তেজ! আর আগুনের হলকা। অবশেষে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল পৌনে পাঁচটায়। ওরা আর অপেক্ষা না করে বেরিয়ে পড়ল।

বেরিয়েই দেখল স্বতঃস্ফূর্ত বন্‌ধ পালিত হচ্ছে চারদিকে। ওরা বাসস্ট্যান্ডে এসে দেখল শুধু পিথোরাগড় কেন, ধবচুলা, গারবিয়াং পর্যন্ত বাস যাচ্ছে এখান থেকে।

শুভঙ্কর এন্‌কোয়ারিতে যেতেই ওর মুখে গারবিয়াং-এর কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন সকলে। যিনি কাউন্টারে বসে ছিলেন তিনি বললেন, "গারবিয়াং যাওগে তুম!"

"হ্যাঁ।"

"লেকিন ক্যা কাম হ্যায় হুঁয়া?"

শুভঙ্কর বলল, "কাম-টাম কিছু নেই। ঘুমনে যায়গা। মানে বেড়াতে যাচ্ছি।"

"সমঝ গিয়া। লেকিন হুঁয়া তুমকো যানে নেহি দেগা।"

"কেন?"

"তুম হিয়াকা আদমি নেহি হো। ইস লিয়ে।"

"এখানকার লোকেরা যেতে পারবে?"

"লোকাল আদমিকে লিয়ে রেসট্রিকশন কুছ হ্যায়ই নেহি। লেকিন তুমকো টিকট ভি নেহি মিলেগা। আউর যানে সে ভি অ্যারেস্ট হো যায়েগা।"

"কিন্তু কেন? গারবিয়াং তো তিব্বতে নয়। ও তো ভারতের মধ্যেই।"

"তুমকো আস্কোট তক যানে দেগা। উধার যানে সে ইনার লাইন পারমিট লাগেগা তুমকো।"

"সে পারমিট কোথায় পাব!"

"চম্পাওয়াত মে মিলেগা। তুম সব চম্পাওয়াত যাও। লোহাঘাট যাও। লেকিন গারবিয়াং মাত যাও। পিথোরাগড় সে ঝুলাঘাট যাকে নেপাল দেখো।"

শুভঙ্কর বলল, "কাল কখন বাস পাব?"

"একদম শুব্‌ভা শুভে।"

ওরা বাসস্ট্যান্ড থেকে ফিরে টনকপুর শহরটাকেই ঘুরে বেড়িয়ে দেখতে লাগল। চৌরাস্তায় একটি দোকানে বসে চা খেতে-খেতে আলাপ হল একজনের সঙ্গে। মানুষটিও বড় ভাল। টনকপুর সম্বন্ধে অনেক কথাই বললেন তিনি। টনকপুর উত্তরপ্রদেশের নৈনিতাল জেলাতে অবস্থিত। হিমালয়ের সরযূ নদী সারদা নাম নিয়ে বইছে এখানে। এই পতিতপাবনী সারদার তীরে টনকপুর হল এক সীমান্ত নগরী। সারদার ওপারে নেপাল রাজ্য, এপারে ভারতবর্ষ। নদীর ঠিক মাঝামাঝি জায়গা থেকেই চলে গেছে এর সীমারেখা। এর উত্তর ভাগে পঞ্চমুখী মহাদেবের মন্দির থেকে যখন শোনা যায় ওঙ্কার ধ্বনি, পশ্চিমের গুরুদ্বার থেকে হয়তো তখন ভেসে আসে গ্রন্থসাহেবের সুর। আবার দক্ষিণের বনাঞ্চল যখন বাতাসে আন্দোলিত হয়ে শন্‌শন শব্দ শোনায়, পুবের মসজিদে তখন হয়তো কেউ আজান দিয়ে ওঠে 'আল্লা হো আকবর...।' মোট কথা, সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের ক্ষেত্র এই টনকপুর। এখানে দূরের পর্বতমালার ফাঁক দিয়ে সূর্য

ওঠে। মোরগের প্রহর গোনার ডাকে সচকিত পাখিরা কলতানে মুখর হয়। নদীর শীতল ধারায় নগরবাসীরা তৃষ্ণা মেটায়। কুমায়ুনকে তিব্বত থেকে আলাদা করে সুদীর্ঘ ১৪৮ মাইল পথ অতিক্রম করে সুন্দরী সারদা এখানে বেষ্টন করে আছে টনকপুরকে। অনাদিকাল থেকে দীর্ঘশীর্ষ শাল, ডাক ও চির বনের ছায়ায় ভরা সুউচ্চ পর্বতমালায় ঘেরা এই নগরী প্রকৃতি দিয়ে ঘেরা। সারদার ওপারে নেপাল রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কটাও বন্ধনের মতো। শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্যই নয়, সুপ্রাচীনকালে প্রজাপতি ব্রহ্মাও এই টনকপুরে একবার এক মহাযজ্ঞ করেছিলেন। সেই যজ্ঞস্থল এখনও আছে। নাম বরমদেব (বুম)। এইখানেই কিচেল নামক স্থানে ছিল কীচকের বাস। প্রাচীন টনকপুর নগরী এইখানেই ছিল। এখনও ধ্বংসাবশেষ অবশিষ্ট আছে। এ ছাড়াও আছে গোভিগোট নামক স্থানে বাণাসুরের অস্ত্রাগারের নিদর্শন। আর আছে টনকপুর মণ্ডি। অর্থাৎ শহরের প্রাণকেন্দ্র এক বিশাল মার্কেট। এত বড় মণ্ডি সারা উত্তর ভারতে আর কোথাও নেই। বলেই ভদ্রলোক গেয়ে উঠলেন, "গুড় কি মণ্ডি বড়ি ধমণ্ডি, আলু হলদি মীর্চা অরণ্ডি, সবকো ভায়ে অ্যায়সি এ মণ্ডি, নাম যাঁহা কা শুন্ ব্যাপারী দূর দূর সে আতা হৈ...।"

একেই বলে কপাল। এইরকম একজনের সঙ্গে পরিচয় না হলে টনকপুর সম্বন্ধে কিছুই জানত না ওরা।

ভদ্রলোক বললেন, "শুধু তাই নয়, যদি তোমরা অশোক অষ্টমীর সময় আসো, তখন দেখবে ওই দূরের পূর্ণাগিরি পাহাড়ে যাওয়ার জন্য কী বিরাট মেলা বসে এখানে। সারা রাত, সারা দিন ধরে পাহাড়ে ওঠে লোক। বহু দূর-দূরান্ত থেকে ওই সময় লোক আসে দলে-দলে।"

শুভঙ্কর বলল, "আপনি আমাদের অনেক উপকার করলেন। আপনার নামটা জানতে পারি কি?"

"মেরা নাম আনন্দ যাদব।"

ওরা দোকান থেকে সোজা চলে গেল পঞ্চমুখী মহাদেবের মন্দিরে। তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে একটু নিচুতে কয়েক ধাপ নামতেই দর্শন পেল শেষনাগের। এইটিই সারদা নদীতে যাওয়ার প্রধান পথ বা ঘাট। সকালে ওরা যে-ঘাটে স্নান করেছিল, সেটি আসলে আঘাটা।

কী অপূর্ব রম্য স্থান। কলকল শব্দে ছুটে চলেছে সারদা। চারদিকে পাহাড়ের পর পাহাড়। ওপারে গভীর বন। কিছু গৃহপালিত মোষ ওপারে চরতে গিয়েছিল। তারা এই খরস্রোতা নদী পার হয়ে যেভাবে সাঁতার কেটে ফিরে আসছে তা দেখবার মতো।

এইখানে নদীর বালুচরে এক সাধুর আশ্রম। আর সেই আশ্রমে হঠাৎ করে যার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ওদের, তাকে দেখেই শিউরে উঠল ওরা। ট্রেনের কামরায় দেখা সেই বীভৎস লোকটি। ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। লোকটি এখানে কী করছে? এই সাধুই বা কে? ইনি কি সত্যিকারের সাধু? না শিকারিবাজের দলের কোনও ছদ্মবেশী?

ওরা আর এক মুহূর্ত সেখানে না থেকে সোজা চলে এল স্বপ্না লজে। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। এবং আনন্দের ব্যাপার, পাঁচদিনের বিদ্যুৎ সঙ্কট একবেলার

ধর্মঘটেই কেটে গেছে। অর্থাৎ আর কোনও বিদ্যুৎ ঘাটতি নেই। আলোয় ঝলমল করছে চারদিক।

॥ ১৭ ॥

সে-রাত্রিটা কোনওরকমে কাটিয়ে পরদিন ভোর না হতেই ওরা বাসস্ট্যান্ডে চলে এল। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই, আগ্রা, নৈনিতাল, সব জায়গার বাস রয়েছে এখানে, নেই শুধু পিথোরাগড়ের। প্রায় ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করার পর বাস এল। বিল্টু, তিন্নি, মউ বাসে উঠে জায়গা রাখল। আর শুভঙ্কর দাঁড়াল টিকিটের লাইনে। এদেশের এইরকমই নিয়ম। আগে টিকিট কেটে তবে উঠতে হবে বাসে। শুভঙ্কর সকলের কথামতো চম্পাবতের টিকিট কাটল। বাসের ভাড়া ষোলো টাকা।

এই পথে বাসে যেতে-যেতে প্রকৃতির যে অনবদ্য রূপ ওদের চোখে পড়ল তাতে বিমোহিত হয়ে গেল ওরা। শুভঙ্করের পাহাড় দেখার সাধ ছিল। মিটল। বিল্টু ধ্যানস্থ। আর তিন্নি-মউ যেন সম্পূর্ণ অন্য জগতেই চলে এসেছে।

প্রায় ঘন্টা-তিনেকের জার্নির পর মুঠোর মধ্যে ধরা যাবে এমন একটি সাজানো-গোছানো সুন্দর উপত্যকায় এসে হাজির হল ওরা। এখানকার রেস্ট হাউসে একটা ঘর নিয়ে প্রথমেই ওরা চেষ্টা করল ইনার লাইন পারমিটের। কিন্তু না। ব্যাপারটা যত সহজ হবে ভেবেছিল, তা হল না। এখানকার অফিসার ওদের দেখে রীতিমত সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তারপর বললেন, "নেই। উয়ো নো ম্যান্‌স ল্যান্ড। উধার মাত যাও।"

"কিন্তু গারবিয়াং গ্রামে আমাদের যেতেই হবে একবার।"

"তুম পিথোরাগড় চলা যাও। উধারকা অফিসার তুমকো অর্ডার দেগা। ম্যায় নেহি দুঙ্গি। বুধি ক্যাম্পকা আগাড়ি কিসিকো যানে নেহি দেতা। অ্যায়সা মতলব ছোড়ো। তুম পিথোরাগড় সে বাগেশ্বর হোকর কৌশানি চলা যাও।"

সব শুনে মউ বলল, "ঠিক আছে। দরকার নেই কারও খোসামোদ করে। এখন সোজা পিথোরাগড় চলে যাই চলো, তারপর সেখানে গিয়ে যা করবার করব।"

তিন্নি বলল, "এদের যা ব্যাপার-স্যাপার দেখছি তাতে তো মনে হচ্ছে না এরা আর পিথোরাগড়ের পরে কোথাও যেতে দেবে বলে।"

এইভাবে বিল্টু বলল, "গণপতি আমাদের এতদূর নিয়ে এসেও কি ভরাডুবি করবেন ? তা হয় না। হতে পারে না। আমার মন বলছে পিথোরাগড় গেলেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

শুভঙ্কর বলল, "আজ এখানে বিশ্রাম নিয়ে, কাল সকালেই বরং আমরা পিথোরাগড়ে চলে যাই চলো। এখন একটু চারদিকে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াই। এমন প্রকৃতি তো সমতলে পাব না।"

চম্পাবতের সৌন্দর্যের সত্যিই তুলনা নেই। ওরা সারা বেলা ধরে এখানকার পার্বত্য পরিবেশ ঘুরে বাঘনাথ, মানেশ্বর আর জলেশ্বরের মন্দির দর্শন করল। তারপর বিকেলবেলা যখন পাহাড়ের ঢাল বেয়ে আরও অনবদ্য প্রকৃতির সন্ধানে

pathagar.net

নীচের দিকে অল্প একটু নেমেছে অমনই দেখল দু'জন লোক পিছু নিয়েছে ওদের।

মউ শুভঙ্করকে ইশারা করল। শুভঙ্কর বিল্টুকে। বিল্টু তিন্নিকে। ওরা আর না এগিয়ে এক জায়গায় থমকে দাঁড়াল। না দাঁড়ানো ছাড়া উপায় নেই। কেননা লোকগুলো যদি ওদের পিছু নিয়ে থাকে তা হলে যা হোক কিছু একটা করবে। আর ওদের সন্দেহ যদি অমূলক হয় তা হলে ওরা যেমন যাচ্ছিল তেমনই চলেই যাবে।

শুভঙ্কর চাপা গলায় বলল, "এইখান থেকেই আবার আমরা ওপরে উঠে যাব। কেননা এখনও চেঁচালে লোকজন ছুটে আসবে। আর বেশি দূরে গেলে কেউ আসবে না।"

মউ বলল, "কিন্তু এই মুহূর্তে ওরা যদি আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ?"

শুভঙ্কর বলল, "এই মৌনী স্তব্ধ হিমালয়ের বুকে আমার রিভলভার গর্জে উঠবে তা হলে।"

যারা ওদের অনুসরণ করছিল, তাদের ভেতর থেকে একজন এবার এগিয়ে এল ওদের দিকে। এসে বলল, "তোমরা এইভাবে এখানে চারজনে ঘোরাঘুরি করছ কেন ? বিকেল চারটের পর এদিকে আসা ঠিক নয়।"

শুভঙ্কর বলল, "আপনারা বাঙালি ?"

"মনে তো হয়। কিন্তু তোমরা এদিকে কোথায় যাবে ?"

"কোথাও নয়। এমনই ঘুরছিলাম।"

"আর যেয়ো না। বাঘ আসে এদিকে।"

"আপনারা কারা ?"

"আমরা এখানে একটা গবেষণার কাজে এসেছি। বছর তিনেক আছি এখানে।"

বিল্টু বলল, "আপনারা আমাদের একটা উপকার করবেন ?"

"কী উপকার ?"

"আমরা গারবিয়াং যেতে চাই। একটু যদি ব্যবস্থা করে দেন তো খুব ভাল হয়।"

"তোমাদের বাবা-মা ? আর কেউ ? তাঁরা কোথায় ?"

"আমরা চার বন্ধুতে এসেছি।"

"তোমাদের তো ইনার লাইন পারমিট লাগবে ভাই।"

"পারমিট পেলাম না।"

"এখানে না পেলেও পিথোরাগড়ে পাবে। তবে তোমাদের যেতে দেবে কি না সেটাই সন্দেহ। আসলে বর্ডার তো। দারুণ কড়াকড়ি। একদিকে নেপাল, একদিকে চিন। কাজেই বহিরাগতদের যাতায়াতে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আছে এখানে। কিন্তু তোমরা এত জায়গা থাকতে গারবিয়াং যেতে চাইছ কেন ?"

"আসলে আমাদের ইচ্ছে ছিল তিব্বতে যাওয়ার। ওখানে রাবণ হ্রদ দেখে কৈলাস-মানসে যাব বলেই এসেছিলাম। কিন্তু তিব্বতে তো যেতে দেবে না। তাই গারবিয়াং যাচ্ছিলাম। একজনের খোঁজে।"

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "তোমরা এক কাজ করো। যদি

বেড়াতে যাও তা হলে আলাদা। না হলে পিথোরাগড়েও যাওয়ার দরকার নেই তোমাদের। তোমরা কাল সকালেই যে-কোনও বাসে লোহাঘাট চলে যাও। ওইখানে বাসস্ট্যান্ডের গায়েই অমরজ্যোতি নামে একটি তিনতলা হোটেল আছে দেখবে। সেই হোটেলে পাসাং নামে একজন তিব্বতী কাজ করে। তার বাড়ি গারবিয়াং। এরা কয়েকপুরুষ আগে তিব্বত থেকে খাম্পা দস্যুদের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে এদেশে পালিয়ে এসেছিল। এবং সেই থেকেই রয়ে গেছে। তোমরা তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো। সে তোমাদের গারবিয়াং যাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করবে, বা সমস্ত রকমের খোঁজখবর দিতে পারবে।"

শুভঙ্কর বলল, "ধন্যবাদ।"

ওরা আর এগোল না। আবার ফিরে এল। চম্পাবতের জনপদে। খুবই জমজমাট এখানটা। হোটেল, রেস্টুরেন্ট, দোকানপত্তর সবই আছে। আর আছে চোখের সামনেই পটে আঁকা ছবির মতো অনবদ্য প্রকৃতি, যেদিকে দু' চোখ মেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকলেও দেখার তৃষ্ণা মেটে না।

সে-রাতটা চম্পাবতে কাটিয়ে পরদিন সকালের বাসেই ওরা চলে এল লোহাঘাটে। বেশি দূরের পথ নয়। মাত্র আধঘন্টা সময় লাগল আসতে। ঘন দেওদার বনে বেষ্টিত ভয়ঙ্কর সুন্দর একটি রমণীয় স্থান এই লোহাঘাট। লোহাঘাট টনকপুর থেকে একানব্বুই কিমি দূরে। লোহাবতী নদীর তীরে আশ্চর্য সুন্দর একটি পার্বত্য জনপদ।

ওরা বাস থেকে নেমেই খোঁজ করল অমরজ্যোতি লজের। বেশি খুঁজতে হল না। মেইন রোডের ওপর তিনতলা লজ। তবে এর ওপরে ওঠার পথটি বড় সঙ্কীর্ণ। যাই হোক, ওপরে উঠে দোতলায় ঘরের খোঁজ করতেই পেয়ে গেল একটা ফোর বেডেড রুম। বাইরে এসে এই প্রথম ওরা একঘরে রইল। কেননা, এখানকার পার্বত্য প্রকৃতি এমনই যে, ভীষণ সুন্দরের মধ্যেও কেমন একটা ভয়-ভয় ভাব এনে দেয়।

এই হোটেলের মালিক কুমায়ুনের মানুষ। ভারী মিষ্টি ব্যবহার। ওদের কথাবার্তা শুনে এবং খাতায় নাম-ঠিকানা লেখবার সময় অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন, "তুম বঙ্গালি! কলকাত্তা সে আয়া?'

শুভঙ্কর বলল, "হ্যাঁ। আপকা মুলুক দেখনে কে লিয়ে।"

"তো ঠিক হ্যায়। তুম সামান রাখো ঘর মে। ইধার চোরি-ওরি কুছ নেহি হোতা। মাত ডরো ইধার। পাহাড় দেখো। জঙ্গল দেখো। নদী চলা যাও। স্নান করো হুঁয়া পর। বাবড়ি হ্যায়।"

বিল্টু বলল, "রাবড়ি! রাবড়ি পাওয়া যায় এখানে?

"রাবড়ি নেহি। বাবড়ি। ঝরনা।"

শুভঙ্কর বলল, "আচ্ছা, আপকা হিঁয়া পর পাসাং নাম কা কোই আদমি হ্যায়?"

লজ মালিকের চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল, "পাস্যাং!"

"জি হাঁ।"

"লেকিন উসকা নাম ক্যায়সে মালুম হুয়া তুমনে? ক্যা কাম হ্যায়

pathagar.net

তুমহারা ?"

শুভঙ্কর বলল, "কাম কিছু নেই। চম্পাবত মে দো বাঙ্গালি বাবু কা সাথ মুলাকাত হুয়া.... ।"

"সমঝ গিয়া। ঝোড়ুবাবু, রামনবাবু। হাঁ হাঁ। উনহানে পাস্যাং কা নাম বতায়া তুমকো। এহি না ?"

"হ্যাঁ।"

"ও আভি আ যায়েগা। এক-দো ঘন্টেকে বাদ। হামারা কুছ কামকে লিয়ে দেবী ধুরা গয়া থা কাল। আজ ও আ যায়েগা।"

যাক। এতক্ষণে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল ওরা। ঘরে জিনিসপত্তর রেখে স্নানের সরঞ্জাম নিয়ে ওরা চলল ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন দেওদার বনের ভেতর দিয়ে লোহাবতী নদীতে স্নান করতে। বেশ খানিকটা যাওয়ার পর একটা সাধুর আশ্রম আর মন্দির দেখতে পেল ওরা। এইখানেই খরস্রোতা লোহাবতীর সঙ্গে কাগড় নামে একটি ছোট্ট নদী, নদী না বলে একে ঝরনা বলাই ভাল, এসে মিলেছে। সেই মিলনস্থলের কাছে, যেখানে একটু জল বেশি সেখানে পাথরের খাঁজে বসে স্নান করে নিল বিল্টু-শুভঙ্কর। স্নান করতে পারল না শুধু তিন্নি আর মউ। ওরা স্নান করা মানেই ওদের ছদ্মবেশ ফাঁস হয়ে যাওয়া। তাই ওরা এক জায়গায় চুপচাপ বসে নদীতে মাছ ধরা দেখতে লাগল। কয়েকটি পাহাড়ি ছেলেমেয়ে কেউ ছিপ ফেলে, কেউ জাল পেতে দুরন্ত নদীতে ছোট-ছোট মাছ ধরছে। ওরা সেইসব দেখে ফেরার সময় দেখল এক জায়গায় কয়েকজন স্বামীজি বাংলায় কথাবার্তা বলছেন।

ওরা ছুটে গেল স্বামীজিদের কাছে। বলল, "আপনারা বাঙালি ?"

"তার আগে বলো তোমরা কারা ?"

"আমরা বেড়াতে এসেছি। পিথোরাগড় দেখতে যাব। আপনারা ?"

"আমরা মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রমে থাকি।"

শুভঙ্কর বলল, "ভারী চমৎকার মায়াময় নাম তো ? আশ্রমটা কোথায় স্বামীজি !"

"সে এখান থেকে ন' কিলোমিটার দূরে। আজ যেতে পারবে না। গেলে কাল সকালে যেয়ো। তবে কোনও যানবাহন নেই, হেঁটে যেতে হবে কিন্তু।"

"তাই যাব। কালই যাব আমরা।'

"কোথায় উঠেছ তোমরা ?"

"আমরা উঠেছি অমরজ্যোতিতে।"

"তা হলে এক কাজ করো। ওই লজ থেকে ডান দিকের পথ ধরে একটু এগিয়ে যাকে জিজ্ঞেস করবে সেই দেখিয়ে দেবে সহজ পথটি। বনের ভেতর দিয়ে পথ। ওই পথে গেলে হাঁটতে কম হবে। তবে হ্যাঁ, সঙ্গে জলের জায়গা আর টিফিন নিতে ভুলো না কিন্তু।"

স্বামীজিরা চলে গেলেন।

ওরা ফেরার পথে যথারীতি খাওয়াদাওয়ার পাট সাঙ্গ করেই লজে ফিরল। খাবার কষ্ট খুব এখানে। ডাল, ভাত আর ঢ্যাঁড়শের তরকারি ছাড়া কোনও খাদ্য নেই। তবু কী আর করা যাবে ? ওরা তো এখানে খেতে আসেনি। যে-কাজে

pathagar.net

এসেছে সেই কাজটা ভালয়-ভালয় উদ্ধার হলেই বাঁচে ওরা। কিন্তু কীভাবে যে কী হবে তা ওরা ভেবেও পাচ্ছে না। রাবণ হ্রদে যাওয়ার আশা মন থেকে প্রায় মুছেই ফেলেছে। এখন গারবিয়াং গিয়ে দাওয়া-লামা পরিবারের কাউকে খুঁজে পেলেই খুশি হবে ওরা। যাঁদের জিনিস, তাঁদের হাতে পৌঁছে দিতে পারলেও অনেকটা দায়মুক্ত হতে পারবে। ডায়েরিতে সেইরকম নির্দেশই তো ছিল।

যাই হোক, লজে ফিরে যখন ওরা জানলার ফ্রেমে বাইরের ঢেউ-খেলানো পাহাড়মালা আর দেওদার বনের দিকে তাকিয়ে যে-যার জায়গায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছে, ঠিক তখনই দরজায় একটা টকটক শব্দ।

শুভঙ্কর দরজা খুলেই সভয়ে পিছিয়ে এল কয়েক পা। দেখল ওর চোখের সামনে মূর্তিমান বিভীষিকার মতো দাঁড়িয়ে আছে সেই বিকৃত চোখ-মুখের লোকটি। যাকে ওরা সাজাহানপুরে ট্রেন থেকে নেমে যেতে দেখেছিল। যাকে শেষবারের মতো দেখেছিল টনকপুরে সারদার তীরে সাধুর আশ্রমে—সেই লোকটি।

শুভঙ্কর কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "কে তুমি!"

লোকটি শয়তানের হাসি হেসে বলল, "চিনতে পারছ না বন্ধু? আমি সে-ই.....।"

মউ তখন ছুটে এসেছে দরজার কাছে। বলল, "আমি চিনেছি। শিকারি বাজ। শয়তান কোথাকার।"

শিকারি বলল, "ঠিক বলেছ। দেখছ তো বুনো ভালুকের সঙ্গে লড়াই করেও কীভাবে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছি? শুধু ওই সোনার গণপতির লোভে। ওটা আমার চাই। ওটা আমাকে দিয়ে দাও। তোমরাও তা হলে বিপদ-মুক্ত হবে। আমিও শান্ত হব।"

শুভঙ্কর বলল, "ওটা তোমাকে দেওয়ার জন্য এতদূর টেনে আনিনি। যদি নিজের মঙ্গল চাও তো এখনও বলছি কেটে পড়ো।"

শিকারিবাজ হাসল। বলল, "সোনার গণপতি না নিয়ে আমি ফিরছি।"

মউ বলল, "তুই আমার বাবার হত্যাকারী। আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলুম তোর বুক চিরে রক্তপান করব। এখনই দেখছি তার উপযুক্ত সময়। একটু সবুর কর। সোনার গণপতি পাইয়ে দিচ্ছি তোকে।" বলেই চোখের পলকে একটা ছোরা নিয়ে এসে ওকে মারতে গেল মউ।

চতুর শিকারি তার আগেই ধরে ফেলল মউয়ের হাতটিকে। বলল, "ও তুমি। আমাদের শশিমাস্টারের মেয়ে। ভোল একেবারে পালটে ফেলেছ দেখছি? আমি তো তোমাকে ছেলে ভাবছিলাম। তা যাকগে। তোমার হাতের এই ছোরা আমার বুকে গাঁথবে না। ঠেকে থাকবে।" বলেই ছোরাটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল শিকারি। তারপর বলল, "শোনো, বেশি গোলমাল পাকাবার চেষ্টা বা চেঁচামেচি কোরো না। এতে ফল খারাপ হবে। শেষ পর্যন্ত জিনিসটা পুলিশের হাতেই চলে যাবে হয়তো। ঠিক আছে। আমি আসি। আবার দেখা হবে। আশা করি সেইটাই হবে শেষ দেখা।"

শিকারিবাজ আর দাঁড়াল না। চলে গেল।

pathagar.net

ওরাও ভেবে পেল না প্রকাশ্য দিবালোকে এই অমরজ্যোতির তিনতলায় কোন সাহসে উঠে এল শিকারি। লোহাবতী নদীতে যখন ওরা স্নান করতে গিয়েছিল তখনও তো সেই নির্জনে সে দেখা করতে পারত ওদের সঙ্গে। শুভঙ্কর দোতলায় ম্যানেজারের ঘরের কাছে এসে দেখল, ঘরে তালা দেওয়া। শিকারি এই সুযোগটাই নিয়েছে তা হলে। তার ওপর লোক নেই বলে লজ একদম ফাঁকা।

শুভঙ্কর যখন দোতলা থেকে আবার তিনতলায় নামল তখন তিনতলার বারান্দায় কে যেন ডাকল ওকে, "খোঁকাবাবু ।"

শুভঙ্কর তাকিয়ে দেখল অল্পবয়সী এক সুদর্শন তিব্বতি যুবক ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে।

শুভঙ্কর বলল, "কে ?"

"পাসাং।"

শুভঙ্কর ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরল পাসাংকে।

পাসাং বলল, "খেরাং নালা খ্যাসি ইউ পে ?" অর্থাৎ তোমরা কি আমার খোঁজ করছিলে ?"

"হ্যাঁ। এসো-এসো, আমাদের ঘরে এসো, এই মুহূর্তে তোমাকে আমাদের ভীষণ দরকার।"

শুভঙ্কর পাসাংকে ওদের ঘরে নিয়ে এল। তারপর সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, "আমরা গারবিয়াং যেতে চাই। এই ব্যাপারে তুমি কি আমাদের কোনও সাহায্য করবে ? চম্পাবতের দু'জন বাঙালিবাবুর মুখে তোমার নাম শুনেই এখানে এসে তোমার খোঁজ করেছি আমরা। শুনলাম তুমি নাকি কী একটা জরুরি কাজে দেবী ধুরা গিয়েছিলে ?"

"লাহো, লেকা থেসার গঙ্।" অর্থাৎ হ্যাঁ, সে-কাজ হয়ে গেছে।

"তুমি কি পারবে আমাদের গারবিয়াং যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে ?"

পাসাং হেসে বলল, "থিলা গম্পা গোরে য়েনা দেলেরে। গারবিয়াং লা ঘারে যেরেনি দো হিরে।" অর্থাৎ অনুমতি লাগবে। কিন্তু পেয়ে যাবে। গারবিয়াং-এ কী কাজ আছে তোমাদের ?

শুভঙ্কর বলল, "সব বলব। আগে বলো তুমি পারবে কি না ? একটু হিন্দি মিশিয়ে বলো। না হলে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে।"

পাসাং বলল, "লাহো, লাহো অর্থাৎ হ্যাঁ-হ্যাঁ। ওঁহি পর মেরা মকান হ্যায়। উধার তুমকো সাইট সিন দেখনে মিলে গা। উধার সে কালাপানি যাও। কালি নদী কা উৎস দেখো।"

"আমরা রাবণ হ্রদে যেতে চাই।"

"আরে বাবা। উধার তো হামকো ভি যানে নেহি দেগা। ও তো চায়নাবালা টিবেট। লেকিন তুম কিঁউ উধার যানা চাতে হো ?"

বিল্টু-শুভঙ্কর তখন যাওয়ার উদ্দেশ্যটা একটু অন্যরকম করে বুঝিয়ে বলল ওকে। তবে এই বলার মধ্যে সুকৌশলে সোনার গণপতির প্রসঙ্গটা বাদ দিল। শুধু বলল, "এমন একটা দামি জিনিস আছে আমাদের কাছে যেটা কিনা চেমং দাওয়া লামার পরিবারের কারও হাতেই দিতে হবে। ওঁর স্ত্রী শিরিং দাওয়া

pathagar.net

লামার হাতে দিতে পারলেই ভাল হত। কিন্তু....।"

পাসাং বলল, "শিরিং লামু! ও তো আভিতক জিন্দা হ্যায়।" বলেই ছুটে গেল বারান্দার কাছে। গিয়েই নীচের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ডাকল, "বাংদি! এ বাংদি! জলদি পাঁচ-সাত কাপ চায় লা না ভাই। আ কে দেখ তেরা কৌন আয়া।"

পাসাং-এর দু'চোখে আনন্দ আর ধরে না। তেমনই আনন্দ বিল্টু, শুভঙ্কর, তিন্নি ও মউয়ের চোখে।

একটু পরেই বাংদি একটা কেটলি করে চা এবং কয়েকটি কাপ নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল।

পাসাং তাকে কী যেন বলতেই খুশিতে উপচে পড়ল বাংদি। ওদের প্রত্যেককে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে বলল, "খোকাবাবুরা। আমি বাংলা জানে। হর সাল আমি তোমাদের কলকাত্তায় শীতের মরসুমে একটা নেপালি দলের সঙ্গে উলেনের পোশাক বিক্রি করতে যাই।"

শুভঙ্কর বলল, "সত্যি!"

বাংদি বলল, "সত্যি। এই সালমে ভি যাব। কলকাত্তা খুব ভাল জায়গা। বড় শহর। ওখানে আমাদের অনেক টিবেটিয়ান আছে। আমি বুদ্ধগয়া ভি গেছি। আমরা চারপুরুষ আগে টিবেটিয়ান ছিলাম। এখন ইন্ডিয়ান হয়ে গেছি। আমার বাবা তিন সাল আগে মারা গেছে। আমার ঠাকুরমা শিরিং লামু এখনও জিন্দা আছেন। বিরানব্বুই বছর বয়স হয়েছে তাঁর। কিন্তু দেখলে মনে হবে ষাট সাল সে জায়দা নেহি।"

শুভঙ্কর বলল, "আমার দাদু একবার তিব্বত গিয়েছিলেন। সেই সময় তোমার দাদু আর ঠাকুরমার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। ওঁরা খুব যত্ন করেছিলেন তাঁকে। এইসব কথা তাঁর ডায়েরি পড়ে জানতে পারি। সেইজন্যে আমাদের খুব ইচ্ছে একবার গারবিয়াং যাওয়ার।"

"ব্যস। হো যায়েগা। পিথোরাগড়ে ডি· এম· অফিসে গিয়ে আমি তোমাদের পারমিশন করিয়ে নেব। তোমরা আমার সঙ্গে যাবে। তোমরা গেলে ঠাকুরমা খুব খুশি হবেন। আমি তোমাদের সবকিছু ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেব। কবে যাবে তোমরা?"

"কাল সকালেই যদি যাই?"

"না না। কাল মাত যাও। কাল সানডে হ্যায় না? ডি· এম· অফিস বন্ধ থাকবে পিথোরাগড়ে। পরশু সবেরে একসাথ হো কর সবাই যাব। ইনারলাইন পারমিট নিয়ে এক রাত থাকব ওখানে। তারপর বুড়ির জন্যে কিছু কেনাকাটা করে চলে যাব ধরচুলা। ওখান থেকে তাওয়াঘাট, সিরখা, জিপতি, মালপা হয়ে গারবিয়াং। অনেক দূরের পথ। আমি তোমাদের কালাপানিও দেখিয়ে আনব।"

পাসাং বলল, "কাল তোমরা ফুল রেস্ট নিয়ে নাও। চাও তো সুভে মায়াবতী চলা যাও। উসকে বাদ পরশু চলা যাও পিথোরাগড়।"

শুভঙ্কর বলল, "মায়াবতীতে কী আছে?"

"ও তো ম্যায়নে নেহি বতানে শিখেগা। সাইট সিন দেখনে কে লিয়ে যাতা হ্যায় আদমি লোক। বাঙ্গালি বহুত যাতা।"

pathagar.net

শুভঙ্কর বলল, "তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে পাসাংভাই ?"

বাংদি বলল, "আমি যাব, ডরো মাত।"

বিল্টু বলল, "তোমরা দু'জনেই চলো না ?"

"দেখা যায়গা।"

শুভঙ্কর বলল, "শোনো বাংদি, আজ দুপুরে একটু আগে এখানে একটা খুব খারাপ ঘটনা ঘটে গেছে।"

বাংদি, পাসাং একসঙ্গে বলে উঠল, "ধেনদে গাদনে ইয়াং ঝুঙগ্‌মা নেয়ং। ইধার কুছ খারাপি নেহি হোতা।"

"জানি। তোমরা পাহাড়িরা খুব ভাল মানুষ। কিন্তু আমরা ক'জন ছেলে এইভাবে বেরিয়েছি বলে কিছু বদমাশ লোক আমাদের পিছু নিয়েছে কলকাতা থেকে। তারাই এখানে এসে আমাদের খুব ভয় দেখিয়েছে। ওরা হয়তো পাহাড়ে জঙ্গলে আমাদের পেলে মারধোর করে সমস্ত টাকাকড়ি কেড়ে নেবে। শুধু তাই নয়, প্রাণেও মারতে পারে আমাদের।"

পাসাং আর বাংদির চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল। বলল, "তব তো কাল সুভে যানা-ই হোগা।"

সকলের চা-পর্ব শেষ হলে বিকেলবেলা লোহাঘাটের পথ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে সন্ধে পর্যন্ত কাটাল ওরা। তারপর খেয়েদেয়ে ঘরের মধ্যে খিল-কপাট।

পরদিন সকালে একটা দোকানে কিছু জলখাবার খেয়ে এবং কিছু সঙ্গে নিয়ে মায়াবতীর পথে রওনা হল ওরা। বাংদি আর পাসাং দু'জনেই চলল সঙ্গে। ওরা যে-পথে নিয়ে চলল সেই পথে পাকদণ্ডী বেয়ে গেলে দু' কিলোমিটার পথ কম হবে।

দেওদার, পাইন আর চীর বনের ভেতর দিয়ে সে যে কী অপূর্ব পথযাত্রা, তা স্মরণে রাখার মতো। এখানে চারদিকেই দীর্ঘ উন্নত শৈলশৃঙ্গরাজি। গভীর ঘন গিরিকানন। রডোডেনড্রনের রঙিন শোভা। দূরে নেপাল রাজ্যের পর্বতমালা। পাসাং আর বাংদি ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। পথ অবশ্য সোজা। এ-পথ ভুল হওয়ার নয়। সেই পর্বতরাজ্যে যেতে-যেতে দু-একটি ছোট-ছোট গ্রাম পড়ল। তারপর একসময় মোটরপথে মিশে গেল পথটি। আর কোনও পাকদণ্ডী নয়।

শুভঙ্কর, বিল্টু, তিন্নি, মউ এমনই অভিভূত যে, ওরা প্রকৃতির এই স্বর্গরাজ্যে এসে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতেও ভুলে গেল যেন। এক সময় ওরা মাদার সেভিয়ারের কিচেন গার্ডেনে এসে পৌঁছল। তারপর দেখল এক জায়গায় কয়েকটি পাথর সাজানো আছে। তার পাশে একটি লাল শালুর পতাকা। সেখানে লেখা আছে 'মায়ীপীঠ'। তারপর আরও একটু এগিয়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠেই দেখল মায়াবতীর অদ্বৈত আশ্রম।

এখানকার স্বামীজিদের মুখে মায়াবতীর গল্প শুনল ওরা। মায়াবতীর উচ্চতা সমুদ্রতল থেকে ছয় হাজার চারশো ফুট। এইখানে বসেই স্বামী বিবেকানন্দ 'প্রবুদ্ধ ভারত' সম্পাদন করেছিলেন। সেভিয়ার দম্পতির টাকায় হিমালয়ের এই দুর্গম এবং নয়নাভিরাম পরিবেশে ১৮৯৯ সালে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্বামী

pathagar.net

বিবেকানন্দ এই আশ্রমে যে ওক গাছের ছায়াতলে বসে বিশ্রাম করতেন, গান গাইতেন, সেই গাছটি আজও আছে। এখানে ভগিনী নিবেদিতা, আচার্য জগদীশচন্দ্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নন্দলাল বসু, অনেকেই এসেছিলেন। বহু মনীষীর পদরেণু-ধন্য এই মায়াবতী আজ এক তীর্থভূমি।

মায়াবতী আশ্রমের ফুলবাগিচায় বসে ওরা সঙ্গে আনা খাবার খেয়ে আশ্রমের কলে জল খেল। তারপর আবার শুরু করল পথ-চলা। এবার অবতরণ।

নামার সময় কোনও কষ্ট নেই, নেই কোনও বাধাবিপত্তি। শিকারিবাজের দলের কারও টিকিও দেখা গেল না। তবে লোহাঘাটে ফিরে এসে অমরজ্যোতিতে গিয়ে দেখল, ওদের ঘরের তালা ভাঙা। আর ঘরের ভেতরেও লণ্ডভণ্ড অবস্থা। অর্থাৎ কিনা কেউ এসেছিল। এসে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছে সোনার গণপতিকে। কিন্তু না পেয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেছে।

পাসাং আর বাংদি বলল, "অ্যায়সা তো কভি হুয়া নেহি।"

শুভঙ্কর বলল, "আমি তো আগেই বলেছিলাম, আমাদের পেছনে লোক লেগেছে। তোমাদের সরলতার সুযোগ নিয়েই তারা এখানে এসে এই কাজ করতে সাহস পেয়েছে।"

লজের মালিকও এসে দেখলেন সবকিছু। তারপর বললেন, "যো-আদমি তুমহারা দুশমন বন গিয়া,ও বাঙ্গালি ?"

"হ্যাঁ। বাঙালি তো আছেই, নন-বেঙ্গলিও থাকতে পারে দু-একজন।"

"আমি তুরন্ত পোলিশবালে-কো খবর দিয়ে দিচ্ছি। ও-আদমি আরিস্ট হো যায়েগা।"

শুভঙ্কর বলল, "কোনও দরকার নেই। কাল সকালেই আমরা চলে যাচ্ছি এখান থেকে।"

বাংদি বলল, "লেকিন ও তুমহারা পিছু লিয়া কিস লিয়ে ?"

শুভঙ্কর বলল, "সব বলব।" কিন্তু এমনভাবে বলল যাতে মনে হল ও সকলের সামনে কথাটা বলতে চায় না।

লজের মালিক চলে গেলে ঘরে ঢুকে যে-যার জায়গায় গিয়ে বসল। পাসাং এবং বাংদিও বসল একপাশে।

শুভঙ্কর বলল, "শোনো বাংদি। আমাদের কাছে এমন একটা জিনিস আছে, যেটা আমি তোমার ঠাকুরমা শিরিং লামুর হাতে তুলে দিতে চাই। আর সেই জিনিসটার লোভেই ওই শয়তানরা আমাদের পিছু নিয়েছে।"

বাংদি কিছুক্ষণ অবাক চোখে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "আমার জন্মেরও অনেকদিন আগে, সেই সময় আমার ঠাকুরদাদা চেমং লামু একটা খুবই দামি জিনিস নিয়ে নিখোঁজ হন। তাঁর মৃত্যুর খবর পর্যন্ত আমরা পাই না। তোমরা সেই জিনিসটার কথা বলছ না তো ?"

শুভঙ্কর বলল, "তা আমরা জানি না। তবে এমন একটা জিনিস আমাদের কাছে আছে, যেটা তোমার ঠাকুরমাকে দিলে উনি খুব খুশি হবেন।"

বাংদি শুভঙ্করকে এমন এক ইঙ্গিত করল, যাতে বোঝা যায় ব্যাপারটা সে বুঝে গেছে।

এরপর থেকে ওদের সঙ্গে ছায়ার মতো লেগে রইল বাংদি এবং কথায়-কথায়

pathagar.net

বুঝিয়ে দিল দুর্বৃত্তরা টনকপুরে অঘটন ঘটালে হয়তো-বা পার পেত। কিন্তু এই কুমায়ুন পর্বতমালা অঞ্চলে গোলমাল করলে পালাবার পথ পাবে না। তবু ভয় নেই। প্রয়োজন হলে বাংদি ওদের জন্য জীবনও দেবে।

পরদিন সকালেই ওরা লোহাঘাট ত্যাগ করে চলল পিথোরাগড়ের দিকে। পাসাং যেতে পারল না। অবশ্য যাওয়ার দরকারই বা কী ? বাংদি যখন যাচ্ছে। ওরা তো এখন বাংদিরই গেস্ট। ঠিক সকাল আটটায় চম্পাবত থেকে পিথোরাগড়ের একটা বাস এল। ফাঁকা বাস। সকলেই বসবার জায়গা পেল। বাসের ভাড়া নিল তেরো টাকা পঞ্চাশ পয়সা করে। সেই বাসে চেপে পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে অতলস্পর্শী খাদের গা বেয়ে ঘাট ব্রিজে সরযূ নদী অতিক্রম করে ওরা যখন পিথোরাগড়ে পৌঁছল, বেলা তখন বারোটা। পিথোরাগড়ে নেমেই ওদের মনে হল ওরা যেন কোনও যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে গেছে। চারদিকে থিকথিক করছে মিলিটারি। এর মধ্যে বেশিরভাগই গোর্খা রেজিমেন্টের লোক। কিন্তু মুশকিল হল, এই ব্যস্ত জনপদে কোনও হোটেলেই জায়গা নেই। অবশেষে অনেক ঘুরে থানার সামনে একটি লজে ওদের ঢুকিয়ে দিল বাংদি। কপালগুণে এই লজে দরজা আছে, জানলা আছে, কিন্তু জানলায় কোনও গ্রিল নেই। কারণ কী ? এ-দেশে নাকি চুরি হয় না। এরা চুরি করতে জানে না। তাই অনেক জায়গাতেই এইরকম ব্যবস্থা।

যাই হোক, ওরা ঘরে জিনিসপত্তর রেখে স্নানখাওয়া সেরে ডি· এম অফিসে চলল ইনার লাইন পারমিটের জন্য। বাংদিকে এরা সবাই চেনে। তাই যাওয়ামাত্রই কাজ হাসিল হয়ে গেল। এইভাবে এবং এত তাড়াতাড়ি যে মুশকিল আসান হয়ে যাবে, তা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। বিল্টু, শুভঙ্কর, তিন্নি, মউ চারজনেরই ছাড়পত্র পাওয়া গেল বাংদির রেফারেন্সে।

বাংদির মনেও আনন্দ আর ধরে না। সেও আজ অনেকদিনের পর বাড়ি ফিরছে। তার চেয়েও আনন্দের ব্যাপার, বিল্টু, শুভঙ্কর ওর সমস্ত খরচখরচা বহন করছে। তাই বাংদি এখন ওদের গাইড নয়, বডিগার্ডও।

বাংদির মুখে শুনল এই পিথোরাগড় সোর উপত্যকায় অবস্থিত। এর অনবদ্য সৌন্দর্য এমনই যে, একে 'ছোট কাশ্মির' বলা হয়। সমুদ্রতল থেকে এর উচ্চতা ১,৮১৫ মিটার। ৮ কিমি লম্বা এবং ৫ কিমি চওড়া এই পিথোরাগড় যেন প্রকৃতির স্বর্গরাজ্য। শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্য নয়, এই স্বর্গরাজ্যে বেশ কয়েকটি ছোট-বড় মন্দিরও আছে। বাংদি ওদের ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সব দেখাল। জগদম্বা, শিব, লক্ষ্মীনারায়ণ, কত মন্দির। লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের গায়েই আবার রাম মন্দির। তারপর এখানকার সেই বিখ্যাত উল্কা মন্দির। যে মন্দিরের দেবী এখানে সদা-জাগ্রতা, সেই মন্দিরের পাশেই আছে ভৈঁরো বাবার থান। আর মন্দিরের পেছন দিকে আছে ১৯৭১ সালের একটি শহিদ স্তম্ভ। যেখানে আছে পাক-ভারত যুদ্ধে নিহত ভারতীয় সেনাদের নামের তালিকা। এই স্তম্ভের ত্রিমুখী ফলকের অপর দুই অংশে আছে ১৯৬২ সালের চিন-ভারত যুদ্ধে নিহত এখানকার শহিদদের নাম এবং ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে নিহত শহিদদেরও নামের তালিকা। এর পাশেই গোবিন্দবল্লভ পন্থের জনমিলন কেন্দ্র।

ওরা সব কিছু দেখে ব্রাইট এণ্ড কর্নারে দাঁড়িয়ে সোর উপত্যকার সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগল। চারদিকে পাহাড়ের ঢালে কত রঙিন ফুলের বাহার। যেন বহুবর্ণের কার্পেট বিছিয়ে দিয়েছে কেউ। আর আছে বহুদূরের তুষারাবৃত পঞ্চচুলি শৃঙ্গ, দেখে মন ভরে গেল ওদের। এই জায়গায় দাঁড়িয়েই সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত দেখেন টুরিস্টের দল। ওরাও দেখল। তারপর আগামীকাল গারবিয়াং যাওয়ার পরিকল্পনা করতে-করতেই নির্জন পথ বেয়ে লজের দিকে ফিরে আসতে লাগল ওরা।

সবে কয়েক পা এসেছে এমন সময় হঠাৎ ওদের ওপর শুরু হল এলোপাথাড়ি পাথর-বৃষ্টি। একটা পাথর এসে লাগল তিন্নির কপালে। তিন্নি 'মাগো' বলে বসে পড়ল পথের ধারে। বাংদি সঙ্গে-সঙ্গে সকলকে সতর্ক করে তিন্নিকে পাঁজাকোলা করে সরে এল একটি বড় পাথরের খাঁজের আড়ালে। ভাগ্যে সেই সময় সেনাবাহিনীর একটি জিপ এসে পড়েছিল, তাই রক্ষে। না হলে কী হত কে জানে ? দু'জন জওয়ান জিপ থেকে নেমেই ছুটে এল ওদের দিকে। তারপর দুর্বোধ্য ভাষায় কী বলল, তা ওরা কেউই বুঝল না। বুঝল শুধু বাংদি। আর বুঝল বলেই বাংদিও ওদের ভাষায় কী সব যেন বলে গেল গড়গড় করে। জওয়ানরা ওদের অপেক্ষা করতে বলে দ্রুত চলে গেল ক্যাম্পের দিকে। তারপর যখন ফিরে এল, তখন দু' গাড়ি বোঝাই হয়ে সদলবলে। রক্তাক্ত তিন্নিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা অ্যাম্বুলেন্সও এসে গেল। ওদের হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়ে চারদিকে ঘিরে শুরু হয়ে গেল জোর তল্লাশি।

তিন্নিকে ওখানকার হাসপাতালে ভর্তি করে ওরা যখন লজে ফিরে এল তখন রাত্রি হয়েছে। বাংদি এই রাতে ওদের বাইরে যেতে বারণ করে নিজেই দোকান থেকে রুটি আর মাংস কিনে নিয়ে এল।

বিল্টু, শুভঙ্কর ও মউ এই আকস্মিক বিপদে খুবই মুষড়ে পড়ল। এমন যে হবে বা হতে পারে তা ওদের অজানা নয়। তবু এই পরিবেশের জন্য ওরা নিশ্চিন্তই ছিল।

মউ বলল, "একটা কথা আমি ভেবে পাচ্ছি না, ওরা ওইভাবে পাথর না ছুঁড়ে সরাসরি তো আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত।"

শুভঙ্কর বলল, "আসলে ব্যাপারটা কী জানো ? ওরা আমাদের বাগে পাচ্ছে না কিছুতেই।"

"কেন ?"

"ওরা জানে ট্রেনের কামরায় হুজ্জোতি করলে আমার রিভলভারের গুলি ওদের খেল খতম করে দেবে। এবং ট্রেনের যাত্রীদের কাছ থেকেও ওরা ছাড়া পাবে না। একবার ধরা পড়লে ফাঁসির দড়ি যে শিকারির অমোঘ নিয়তি তা সে ভালই জানে। অতএব ট্রেনের মধ্যে আক্রমণ করার পরিকল্পনাটা আদৌ করেইনি।"

মউ বলল, "কিন্তু টনকপুরেও তো সারদার তীরে সেই সাধুর আশ্রমে ওরা ধরতে পারত আমাদের ?"

"পারত। কিন্তু টনকপুর যেহেতু একটি গঞ্জ এবং মিলিটারি বেস, তাই ওরা রিস্ক নেয়নি। তা ছাড়া সোনার গণপতিকে সব সময় তো আমরা সঙ্গে নিয়ে ঘুরছি তা ওরা জানত না। আর সেইজন্যেই চম্পাবত বা লোহাঘাটে নির্জনে

pathagar.net

আমাদের আক্রমণ না করে ওরা আমাদের নজরে রাখে এবং যে-মুহূর্তে আমরা মায়াবতী রওনা হই ঠিক তখনই ওরা এসে ঘরের জিনিসপত্তর ঘাঁটে।"

"তা না হয় হল। কিন্তু সেদিন দুপুরে শিকারি তো আমাদের ঘরে ঢুকেই চড়াও হতে পারত আমাদের ওপর। তার সেই তো ছিল মোক্ষম সুযোগ।"

"না। ও-কাজ করতে গেলে ও ভুল করত। শিকারিবাজ বাস্তুঘুঘু। প্রথমত, ও আমাদের চারজনের সঙ্গে পেরে উঠত না। দ্বিতীয়ত, সোনার গণপতি নিয়ে পালাতে গেলেই ও ধরা পড়ত। তৃতীয়ত, এই দুর্লভ সামগ্রীও এমনভাবে পেতে চায়, যাতে করে ওর দলের লোকেদেরও চোখে ধুলো দিয়ে কেটে পড়তে পারে ও। তাই এখনও ও সুযোগের অপেক্ষায় আছে। এখন ও জেনে গেছে সোনার গণপতিকে আমরা কাছছাড়া করি না। এবার তাই পথেঘাটে আক্রমণ করবে আমাদের। পিথোরাগড় নির্জন পার্বত্য শহর বলেই হয়তো ভেবেছিল শিকারি। কিন্তু এত মিলিটারি যে পিঁপড়ের মতো থিক-থিক করবে এখানে, তা ভাবেনি। এখানে গুলি চালানোর বিপদ আছে। তাই পাথর ছুঁড়ে আমাদের ঘায়েল করতে চেয়েছিল। কাছে আসতে পারেনি বাংদির জন্য। কেননা, কাছে এলে বাংদি ওদের ছিঁড়ে খেত।"

তিন্নির জন্য মন খারাপ। তবু যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। ওরা তাই বাংদির আনা রুটি আর মাংস খেয়ে শুয়ে পড়ল। রাত দশটা। পিথোরাগড়ে যেন গভীর রাত। ওরা বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে-করতেই ঘুমিয়ে পড়ল একসময়।

ঘুম যখন ভাঙল তখন সকাল হয়ে গেছে। বাংদি বলেছিল সূর্যোদয় দেখতে যাওয়ার কথা। কিন্তু এখন আর সম্ভব নয়। তার ওপর তিন্নি নেই। সত্যি, কী যে আছে কপালে তা কে জানে ? ওরা তো চেষ্টার ত্রুটি করছে না। কিন্তু গণপতি সহায় হচ্ছেন না কেন ? এখনও চিনারা কেন তিব্বত সীমান্তে ওদের পথ আটকে রেখেছে ?

সকালবেলা ওরা প্রথমেই গেল তিন্নির খোঁজ নিতে। ভাগ্য ভাল। আজই ছেড়ে দিল ওরা তিন্নিকে। মাথায় ব্যান্ডেজ। চোখের কাছে একটু ফোলা ভাবও আছে। ওষুধ,ইনজেকশন যা দেওয়ার তা দিয়েছে ওরা। তিন্নি এখন সুস্থ। কাল ওর রক্ত দেখে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল সকলে। এখন নিশ্চিন্ত। আজকের দিনটা ওরা আর বেশি ঘোরাফেরা করল না। লজে বসেই রমণীয় উপত্যকার অনেক সৌন্দর্য দেখা যায়। তবে বিকেলবেলা আর-একবার বরফে ঢাকা পঞ্চচুলী শৃঙ্গ দর্শন করল।

পরের দিন সকালেই যাতে রওনা হওয়া যায় সেইভাবেই তৈরি হয়ে নিল ওরা। বাংদি ওর ঠাকুমার জন্য কী সব যেন কিনল। বিল্টু, শুভঙ্করও টুকিটাকি কিছু কেনাকাটা করল। বাংদি বলেছিল, আজ একবার ঝুলাঘাটে গিয়ে নেপাল দেখে আসতে। কিন্তু তিন্নিকে ঘরে রেখে কোথাও যেতে রাজি হয়নি ওরা। যদিও বাংদি পাহারা দিত তিন্নিকে, তবুও না।

সে-রাতটা কোনওরকমে কাটিয়ে পরদিন সকালেই জৌলজীবীর বাস ধরল ওরা। প্রথমেই ওগলা হয়ে আস্কোট। তারপর জৌলজীবী। এইখানে একরাত থাকতে হবে ওদের।

বাস থেকে নেমে কিছু পথ এগিয়ে কয়েকটি দোকানঘরের পেছনে ছোট্ট

একটি হোটেল। সেখানেই থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হল। দুপুরের পর এসেছিল ওরা। তাই নেমেই খাওয়া-দাওয়া করতে হল।

এরপর যথারীতি শুরু হল নৈসর্গিক দৃশ্য দেখা। শুধু পাহাড়, পাহাড় আর পাহাড়। সিলাস হিমবাহ থেকে নেমে আসা গৌরী গঙ্গার সঙ্গে কালী নদীর সঙ্গম এখানে। জৌলজীবীতে বাংদির একটু বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এখানে লেডেন অংমু ও ছিমি য়োডেন নামে ওদেরই সমবয়সী দুটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল বাংদি। এখন থেকে এরাও ওদের সঙ্গ নেবে। ওরাও যাবে গারবিয়াং। শিরিং লামু ওদেরও প্রিয়জন।

ছিমি আর লেডেন মেয়ে। কাজেই তিন্নি ও মউয়ের সঙ্গে দারুণ জমে উঠল ওদের। তবে মুশকিল হল যা কিছু কথাবার্তা সবই ইঙ্গিতে এবং দোভাষীর মাধ্যমে। বলা বাহুল্য দোভাষীর কাজটা বাংদিই করল।

এখানে বেশ ঠাণ্ডা আছে। তাই শীতবস্ত্র পরতে হল সকলকেই। দূরের বরফের পাহাড় আর নেপাল রাজ্যের পর্বতমালার সৌন্দর্যে এবার একটু রুদ্ররূপ যেন ফুটে উঠেছে। তবু ওরা নির্জন জৌলজীবীর পথে-পথে ঘুরে এই রুদ্ররূপই দর্শন করতে লাগল।

সন্ধে হয়-হয়, এমন সময় ওরা দেখল জটাজুটধারী জনাচারেক সাধু একটি পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে পথ রোধ করে দাঁড়াল ওদের। কী ভীষণ রূপ তাদের। চোখে যেন অগ্নিদৃষ্টি।

ছিমি, লেডেন, বাংদিও রুখে দাঁড়াল। বাংদি ওদের ভাষায় কী যেন বলল, কিন্তু ওরা তা বুঝল না।

ওদের লক্ষ্য বিল্টু ও শুভঙ্কর।

একজন সাধু বলল, "এবার কোথায় লুকোবি তোরা বাছাধন ? কে তোদের বাঁচাবে ? ভালয়-ভালয় দিয়ে দে বলছি।"

বলার সঙ্গে-সঙ্গেই ক্যারাটের প্যাঁচে সাধুটাকে মুহূর্তে কাত করে দিল লেডেন অংমু।

ততক্ষণে বাকি তিনজনের হাতে রিভলভার চকচকিয়ে উঠেছে।

শুভঙ্কর ওর পয়েন্ট থ্রি-টা বের করতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই একজন ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর।

লেডেন যাকে কাত করে দিয়েছিল সেই সাধুটা এবার উঠে দাঁড়িয়ে ওকে আক্রমণ করতে যেতেই লেডেন ঘূর্ণির মতো নিজেকে ঘুরিয়ে নিয়ে ওকে এমন একটা রদ্দা মারল যে, লাট্টুর মতো ঘুরে গিয়ে পাহাড়ের একটা দেওয়ালের গায়ে ধাক্কা খেল সাধুটা। আর তখনই দাড়ি, জটা খুলে গিয়ে যার আত্মপ্রকাশ ঘটল, সে হল জটা। অর্থাৎ যে কিনা শিবপুরের বাড়িতে নৈশ অভিযানে গিয়ে শুভঙ্করের রডের ঘা খেয়েছিল।

এমন চমৎকার ছদ্মবেশ যে, চেনবার উপায়টি নেই কাউকে। এরই মধ্যে শিকারিবাজও হয়তো আছে। কিন্তু আর-একজন ? দলে তো এদের পাঁচজন থাকবার কথা। শিকারি, জটা, সৈয়দরাজা, জামশেদ, কালোবাবা। আর-একজন তা হলে কোথায় ?

শুভঙ্কর বলল, "হয় তোমরা পথ ছাড়ো, না হলে আমরা ভীষণ চেঁচাব।"

"কোনও লাভ হবে না। বহু কষ্টে আমরা এখানে এসেছি। ভালয়-ভালয়

ওটা দিয়ে দাও, না হলে সব ক'টাকে মেরে শেষ করে দেব।"

শুভঙ্কর বলল, "যাই করো, ও-জিনিস নিয়ে তোমরা কিছুতেই পালাতে পারবে না। আস্কোটেই ধরা পড়বে। চেকিং দেখেছ তো? আমার ব্যাগ আর রিভলভারটা বাংদি নিয়ে রেখেছিল তাই। না হলে আমরাও ওটা আনতে পারতাম না। কিন্তু ওই বেড়া তোমরা টপকালে কী করে?"

"প্রয়োজন হলে আমরা চিনের বেড়াও টপকাব।"

ওরা আর বাক্যব্যয় না করে শুভঙ্করের কাঁধ থেকে ঝোলাব্যাগটা কেড়ে নিল। এই ব্যাগেই সোনার গণপতি রয়েছেন। সেটাকে হস্তগত করে ভাল করে দেখে শুভঙ্করের পয়েন্ট থ্রি-টাও কেড়ে নিল ওরা। তারপর রিভলভার দেখিয়ে এক-এক করে বাঁধতে গেল সকলকে। এরই মধ্যে বাংদি হঠাৎ একটা বিকট চিৎকার করে মাথা নিয়ে গোত্তা মারল একজনের পেটে। যেই না মারা, মউ অমনই তার অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে ছিনিয়ে নিল রিভলভারটি। সেই রিভলভার মউয়ের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বাংদিই এবার তাগ করল ওদের দিকে। ততক্ষণে ওরাও গুলি চালিয়েছে। ছিমি য়োডেন ঝাঁপিয়ে পড়ল বাংদির ওপর। বাংদি টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল মাটিতে। গুলি লাগল সাধুর বুকে। সাধু দু' হাত ওপরে তুলে চেঁচিয়ে উঠল, "আল্লাহ।"

তিন্নি আর শুভঙ্কর তখন বাঁধা পড়েছে। তিন্নির তো বাধা দেওয়ার কোনও শক্তিই নেই। শুভঙ্কর অসহায়। খেল শুরু করল এবার বিল্টু। সে ভল্ট খেয়ে একজনের গলা ধরে ঝুলে পড়তেই লেডেন অংমু আর-একজনের রিভলভারের মুঠিতে পায়ে করে মারল এক লাথি।

বাংদি ততক্ষণে জটাকে গুলি করেছে।

আর মউয়ের লক্ষ্য শিকারিবাজ। সকলের ছদ্মবেশই খসে পড়েছে তখন। শিকারি তখন আক্রমণ না করে ব্যাগটা নিয়ে প্রাণপণে দৌড়চ্ছে। এতদিনের চেষ্টায় প্রত্যাশার ধন হাতের মুঠোয় পেয়েছে সে। তাই দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটেছে।

মউও তখন মরিয়া। সোনার গণপতি তার লক্ষ্য নয়। তার লক্ষ্য শিকারিবাজ।

ওদিক থেকে বাংদিও বাঘের মতো ছুটে আসছে তখন। দু'জন মরেছে। বাকি দু'জনের একজনকে ঘায়েল করেছে বিল্টু ও ছিমি।

লেডেন অংমু শুভঙ্কর ও তিন্নিকে বাঁধনমুক্ত করছে।

আর শিকারিকে বাঘিনীর মতো তাড়া করছে মউ ও বাঘের মতো বাংদি।

মউ চিৎকার করে বলছে, "শয়তান! শিকারিবাজ আজ আর তোর নিস্তার নেই। আজ তুই আমার শিকার হলি। সোনার গণপতিতে আমার কাজ নেই। আমি চাই তোকে। তুই আমার বাবাকে মেরেছিস।"

শিকারি এখন নিরস্ত্র। না হলে সে কী করত তা কে জানে? তবুও হঠাৎ একবার ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা পাথর কুড়িয়ে মারতে গেল মউকে। ততক্ষণে মউই একটা পাথর দিয়ে পালটা মার মেরেছে।

খ্যাপা বাংদি ওর দিকে রিভলভার তাগ করেছে তখন। এইসব পাহাড়িরা এমনিতে খুব ভাল। কিন্তু খ্যাপালে যে এরা কী ভয়ানক হতে পারে তা বাংদির

pathagar.net

এই সময়কার চেহারা না দেখলে ধারণা করা যাবে না।

মউ চিৎকার করে উঠল, "না বাংদি, না। ওকে মেরো না, ও আমার শিকার। আমায় মারতে দাও ওকে। আমি নিজের হাতে ওকে খুন করব। ও আমার বাবাকে মেরেছে। ও খুনি।"

মউয়ের আঘাত মোক্ষম জায়গাতেই লেগেছে শিকারির। ওর নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত ঝরছে। কিন্তু তবুও সে আর পালাবার পথ পাচ্ছে না। কেননা, আর পথ নেই। এবার যা আছে তা হল অতলস্পর্শী খাদ। যেখানে ভয়ঙ্কর গর্জন করে গৌরী গঙ্গা ও কালী নদী এক হচ্ছে।

মউ আবার একটা পাথর ছুঁড়ল। ফের একটা। শিকারির সর্বাঙ্গ রক্তে ভেসে গেল। ও এবার দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল সেখানেই।

মউ ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেল শিকারির কাছে। বলল, "খুব কষ্ট। না রে? আমার বাবারও মরবার সময় এমনই কষ্ট হয়েছিল। এইভাবে যারা মরে, তাদের সবারই কষ্ট হয়। প্রতিজ্ঞা করেছিলুম তোর রক্ত আমি পান করব। কিন্তু তখন না বুঝেই ওইরকম প্রতিজ্ঞা করেছিলুম। কিন্তু তোর রক্তে আমার ঘেন্না। ও কখনও মুখে দেওয়া যায়? তবে একটা টিপ্পা আমি পরব।" বলে সত্যি-সত্যিই ওর রক্তে একটা টিপ্পা নিল মউ। তারপর বলল, "এই জৌলজীবীর মাটি, পাথর তোর রক্তে ভিজে উঠুক। আর কালী গৌরীর জল লাল হয়ে উঠুক তোর ওই রক্তের লালে। তোর খেল খতম শিকারি। একবার শুধু ভগবানকে ডাক।" বলেই একটা সজোরে লাথি মারল ওকে।

শিকারি আর্তনাদ করে উঠল, "আ-আ-আ।"

শিকারির খেলা শেষ হল। ওর আর্তনাদের সুর পাহাড়ে-পাহাড়ে ধ্বনিত হয়ে হারিয়ে গেল দূর-দূরান্তে। হাজার ফুট নীচে কালী গৌরীর সঙ্গমে দেহটা ওর পুতুলের মতো ভাসতে-ভাসতে হারিয়ে গেল কোথায় যেন।

ইতিমধ্যে চিৎকার-চেঁচামেচি ও গুলির শব্দে অনেক লোক ছুটে এসেছিল সেখানে। তার মধ্যে সেনাবাহিনীর লোকও ছিল কয়েকজন। যে-লোকটাকে বিল্টু ধরে রেখেছিল তার নাম জামশেদ। ওর মুখেই জানা গেল কালোবাবা পিথোরাগড়ে সেনাবাহিনীর তল্লাশির সময় গুলিতে নিহত হয়েছে।

বিনা অনুমতিতে ছদ্মবেশে চোরাপথে এই নো-ম্যান্‌স ল্যান্ডের মধ্যে ঢুকে পড়ার অপরাধে জামশেদকে গ্রেফতার করা হল। শুধু তাই নয়, জটা ও সৈয়দের হত্যার দায়টাও চাপিয়ে দেওয়া হল জামশেদের ঘাড়ে। আর শিকারির ব্যাপারটা? ওটা তো একটা অ্যাক্সিডেন্ট।

সবই হল। কিন্তু সর্বনাশের চরম যেটা, সেটা যে সকলের অলক্ষ্যেই হয়ে যাবে তা কেউ ভাবেনি। এই মারামারি, রক্তারক্তির মধ্য দিয়েই সোনার গণপতি উধাও হয়ে গেলেন। শুভঙ্করের ঝোলাটা শিকারির কাঁধেই ছিল। সম্ভবত, শিকারির সঙ্গে-সঙ্গে সেটারও সলিল সমাধি হয়েছে কালী ও গৌরী গঙ্গার সঙ্গমে।

pathagar.net

॥ ১৮ ॥

সারারাত ঘুমোতে পারল না কেউ। এতদূর এসে এত কষ্ট করেও সোনার গণপতিকে যথাস্থানে রেখে আসতে পারল না, এ দুঃখ কী কম! কিন্তু কী আর করা যাবে? গণপতি নিজেই যখন চলে গেছেন, তখন তাঁর ইচ্ছার ওপরে তো কথা নেই। তাঁর ইচ্ছাতেই তো সব। কথায় আছে, 'মূকং করোতি বাচালম্, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্। যৎ কৃপা তমহং বন্দে, পরমানন্দমাধবম্।'

তাই আর গারবিয়াং যাওয়ার কোনও কারণ থাকতে পারে না। গিয়ে করবেটাই বা কী? কোন মুখে শিরিং লামুকে বলবে ওরা যে, ওই দুর্লভ সামগ্রী নিয়ে এতদূর এসেও তীরে এনে তরী ডোবাল?

বাংদি তো হতবাক।

ছিমি য়োডেন, লেডেন অংমু সবাই দুঃখ পেল।

সবাই বলল, "এতদূর এসে আমাদের দেশ না দেখেই চলে যাবে তোমরা?"

শুভঙ্কর বলল, "আমরা গেলেই বরং বৃদ্ধা লামু দুঃখ পাবেন।"

বাংদি বলল, "না, উনি দুঃখ পাবেন না। এইবার তোমরা সত্যি করে বলো তো, কী তোমরা এনেছিলে? সেই অভিশপ্ত সোনার গণপতি নয়তো?"

শুভঙ্কর বলল, "ঠিক তাই। যার দুটো চোখই হিরের।"

বাংদি বলল, "তোমরা একবার চলো গারবিয়াং-এ। আমার ঠাকুমা শিরিং লামু হয়তো তোমাদের কিছু জিজ্ঞেস করবেন। ওই গণপতির রহস্য আমরা জানি।"

এর পরে আর না করা যায় না। তাই সাত-সকালেই রওনা হল ওরা। এখান থেকে ওরা ধরচুলা যাবে। তারপর গারবিয়াং। ধরচুলার একজন ব্যবসায়ীর ট্রাক যাচ্ছিল। ওরা সেইটেই ম্যানেজ করল। বিল্টু, শুভঙ্কর, তিন্নি, মউ, ছিমি, লেডেন,বাংদি,সবাই উঠল ট্রাকে।

সবে পাহাড়ের একটা বাঁক নিয়েছে এমন সময় উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল তিন্নি, "রোখ্‌কে, রোখ্‌কে। শুভদা, শিগগির গাড়ি থামাও।"

ট্রাক থামল। ড্রাইভার নেমে এসে জিজ্ঞেস করল,"ক্যা হুয়া?"

"কুছ নেহি। আভি নেহি যায়েঙ্গে। হামারা যানে কো থোড়া দের হোগা।"

শুভঙ্কর, বিল্টু অবাক হয়ে বলল, "কেন! কী হল? শরীরের কষ্ট হচ্ছে তোমার? মাথায় লাগছে?"

"না। আমি সুস্থই আছি।" বলেই তিন্নি দ্রুত নেমে পড়ল ট্রাক থেকে। সকলকে নামতেও বলল।

সবাই নামল।

ওদের নামিয়ে দিয়ে ট্রাক চলে গেল ধরচুলার দিকে।

বাংদি বলল, "কী হল বহিনজি! নেমে পড়লে কেন?"

লেডেল অংমু বাংলা জানে না। তবে লেখাপড়া জানে। তার সুন্দর ফরসা মুখে বিস্ময় এনে জিজ্ঞেস করল, "হোয়াটস দ্য রং?"

তিন্নি বলল, "লুক দ্যাট। গোল্ডেন গণপতি অ্যান্ড ডায়মন্ড আই।"

pathagar.net

সবাই অবাক বিস্ময়ে দেখল, পাহাড়ের ঢালে একটি গাছের ডালে আটকে শুভঙ্করের সেই ব্যাগটা ঝুলছে। আর তার ঠিক নীচেই একটি পাথরের খাঁজে ঝুঁকে আছেন সোনার গণপতি। সকালের সোনার রোদে ধাতব গণপতি ঝকঝক করছেন। জ্বলজ্বল করে জ্বলছে যেন হিরের চোখ দুটো। সোনার গণপতি পাথরের খাঁজে এমনভাবে আটকে আছেন, যেন মনে হচ্ছে অবাক বিস্ময়ে কালী ও গৌরী গঙ্গার মিলন দেখছেন তিনি। হয়তো আর-একটু পরেই ঝাঁপিয়ে পড়বেন সেই মহা সঙ্গমে।

বাংদি চোখের পলকে এক দারুণ তৎপরতায় গাছের ডালপালা ধরে সেই ঢাল বেয়ে নেমে পড়ল নীচে। খুব বেশি দূরে নয়। সামান্য নামতেই নাগাল পেল তার। তারপর আবার গণপতিকে উদ্ধার করে ঝোলা ব্যাগে ঝুলিয়ে নিয়ে উঠে এল ওপরে।

আনন্দের বন্যা বয়ে গেল সকলের মনে। হারানিধি ফিরে পেল। একটু পরেই সরকারি বাস এলে সেই বাসে প্রথমেই এল ধরচুলায়। ধরচুলা হল ভৈরব গর্জনে ছুটে চলা কালী নদীর অববাহিকায় সুন্দর একটি সবুজ উপত্যকা। চারদিকে দীর্ঘ উন্নত ভীষণ পর্বতমালা। আর ধান, যব, ভুট্টার খেত।

এইখানে আসামাত্রই গারবিয়াং-এর বাস পেয়ে গেল ওরা। সরকারি বাস। কালী নদীর ধারে-ধারে পার্বত্য পথে দ্রুতগতিতে ছুটে চলল বাস। অনবরত মিলিটারি ট্রাক আনাগোনা করে বলে রাস্তা ভাল। চারদিকে পাহাড়। ঢালু দিকে গভীর উপত্যকা। সেই উপত্যকার গহ্বর থেকে সাদা-সাদা মেঘগুলো যেন স্তম্ভ পাকিয়ে ওপরদিকে উঠছে। এই নয়নমনোহর দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেল সকলে।

শুভঙ্কর কবির মতো উক্তি করল, "প্রকৃতির এই সুমহান রহস্যের কিছুও যদি বুঝতাম! কোথায় আমরা, কোথায় এই মেঘমালা। মেঘস্তরের উঁচুতে আমরা কীভাবে আছি ? ভাবতে পারো ?"

মউ গান গেয়ে বলল, "আলোক সাগরে অন্ধ স্নান করে আলো কেমন বুঝতে নারে। এও ঠিক তাই।"

তিন্নি বলল, "একটা জিনিস লক্ষ করেছ তোমরা ? এখানে শীতও যেমন, রোদের দাপটও তেমন। জানলার ফাঁক দিয়ে গায়ের ওপরে যেখানে রোদ পড়ছে, সেখানটা যেন পুড়ে যাচ্ছে। ভাবতেও বিস্ময় লাগে। স্বর্গ কি এখানেই ?"

অনেক পরে বাস এসে এক জায়গায় থামল। এই জায়গাটার নাম বুধিগড়। এইখানে ইনার লাইন পারমিটটা কঠোরভাবে চেকিং করল রক্ষীবাহিনীর লোকেরা। এর পর একেবারেই গারবিয়াং। গারবিয়াং হল তিব্বত যাওয়ার পথে ভারতের শেষ গ্রাম।

ওরা যখন বাস থেকে নামল তখন প্রচণ্ড শীতে যেন সর্বাঙ্গ জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে। এই গারবিয়াং গ্রামে প্রচুর চমরি গাই আছে।

বাংদিই দেখাল। বলল, "উয়ো দেখো, তুমহারা মুলুক মে উয়ো নেহি হোগা।" তারপর বলল, "শীতে খুব কষ্ট হচ্ছে তো ? বহত জাড় লাগছে ?

pathagar.net

এখানে ঠাণ্ডা একটু বেশি।"

সবাই বলল, "হ্যাঁ। তা লাগছে বইকি।"

"টিবেট গেলে আরও জায়দা ঠাণ্ডা লাগবে।"

ওরা যখন বাস থেকে নেমেছে তখন খোঁড়ামতো একজন লোক ছুটতে-ছুটতে এল সেখানে, "এ বাংদি! তুমহারা সাথ এ কৌন আয়া! তাম্বু লাগে গা?

"নেহি বাবা।"

"বাবা নেহি। ডিকি ছুজুম।"

"মেরা ঘর তো হ্যায়।"

"ও তো হ্যায়। লেকিন ইয়ে বাঙ্গালিকে লিয়ে। ইয়ে লোগ ক্যায়সা আ গিয়া হিঁয়া পর?"

"মেহমান হ্যায় হামারা। ইনার লাইন পারমিটভি হ্যায়।"

"লেকিন হামারা তাম্বুমে আরাম মিলে গা। তেরা গদ্দি পর খটমল হোগা। মকান ভি আচ্ছা নেহি। অ্যায়সা জাড়মে এ সব নেহি বাঁচ সকতা।" বলে শুভঙ্করকে বলল, "হাম লোগ কা সাথ তাম্বু, চুটকা হ্যায়। ওহি তুমকো দেকে বাঁচায়েঙ্গে। হাম লোগও পাহাড়িয়া আদমি। মেরা নাম ডিকি ছুজুম। কই সুরত সে বেইঠা-বেইঠা রাত বিকায়েঙ্গে। তুম মরণেসে হাম লোগ্ কা রুপাইয়া ক্যায়সে মিলেগা?"

বাংদি এবার রুখে দাড়াল, "তুম যাওগে কি নেহি?"

"গোঁসা মাত করো দাদা। ম্যায় যাতে হেঁ। মেরা নাম ডিকি ছুজুম—আ। ভিখ্ নেহি মাগেঙ্গে।"

ওরা ঘন কৃষ্ণবর্ণের একটি পাহাড়ের গায়ে ছোট্ট একটি ঘরে ঢুকল। কাঠের ঘর। ওপরে টালি। ওরা যেতেই বেঁটেখাটো চেহারার এক লোলচর্ম বৃদ্ধা বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বাংদি, লেডেন, ছিমি সবাই প্রণাম করল বৃদ্ধাকে। ওদের দেখাদেখি বিল্টু, শুভঙ্কর, তিন্নি, মউও প্রণাম করল।

ইনিই শিরিং লামু। এককালে যে অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন তা দেখলেই বোঝা যায়। উনি প্রসন্নবদনে বিল্টুদের দিকে তাকিয়ে বাংদিকে ইশারায় জিজ্ঞেস করলেন, "থে শো শু শু রে?" অর্থাৎ এরা কারা?

বাংদি বলল, "মেরা দোস্ত ভাই বহিন।"

শিরিং লামু হাসি-হাসি মুখে ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ইয়া ফে," অর্থাৎ ভেতরে এসো।

ওরা ভেতরে ঢুকলে ওদের বসিয়ে রেখে বৃদ্ধা লামু ছিমি আর লেডেনকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন। তারপর টিনের মগে করে সকলের জন্য গরম চা নিয়ে এসে এগিয়ে দিলেন হাতে-হাতে। পরে বললেন, "আর একদিন দেরি করলে আমার সঙ্গে দেখা হত না। আমার পাসপোর্ট, ভিসা সব এসে গেছে। কাল সকালেই আমি চলে যাব এই জীবনের শেষবারের মতো, মানস পরিক্রমায়।"

বাংদি তখন বিল্টু, শুভঙ্কর, তিন্নি ও মউয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল ঠাকুরমার। এবং ওদের আসার কারণ, এমনকী আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা খুলে

pathagar.net

বলল।

শিরিং লামু বিস্মিত এবং অভিভূত হয়ে গেলেন। অনেকটা স্বগতোক্তির মতোই উনি নিজের ভাষায় বিড়বিড় করে বললেন, "এই জন্যই তোমরা ঠিক সময়টিতে এসে পড়েছ। এই দিনটির জন্যই আমি বুঝি এতদিন বেঁচে ছিলাম। এবং এই আমার শেষ যাত্রা। হয়তো আমি আর কখনও ফিরে আসব না। রাবণ হ্রদে ওটাকে বিসর্জন দিয়ে মানস সরোবরে স্নান করে দেহরক্ষা করব আমি।" বলে বিল্টু ও শুভঙ্করকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর চুমোয়-চুমোয় ভরিয়ে দিলেন ওদের দু'জনকে।

বিল্টু, শুভঙ্কর দু'জনে মিলে সোনার গণপতি অর্পণ করল শিরিং লামুর হাতে।

শিরিং লামু গণপতিকে প্রথমে মাথায় ঠেকালেন। তারপর সেটিকে বুকে নিয়ে সে কী কান্না। আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি। কাঁদবার তো কথাই। এই দেবতার গ্রাসেই তো শিরিং আজ পতিহারা। কত দীর্ঘ দিবারাত্রি, কত মাস, কত বছরের পর অক্ষত শরীরে সোনার গণপতি ফিরে এলেন। কিন্তু তাঁর পতি তো ফিরলেন না। তাই কেঁদে-কেঁদে সারা হয়ে গেলেন।

বাংদির মা, অর্থাৎ শিরিং-এর পুত্রবধূ কী একটা কাজে পাশের গ্রামে গিয়েছিলেন। তিনি এসে রান্নাবান্না করে খাওয়ালেন সকলকে। কত কী খাওয়া। সরু আতপ চালের ভাত, ফুলকা, রাজমা, বাথুয়া শাকের ঘন্ট, পাঁপড় ইত্যাদি।

তারপর চোখে আর ঘুম এল না কারও। শুধু গল্প, গল্প, আর গল্প। কত যে গল্প করলেন শিরিং, তার শেষ নেই। তাঁর কাছ থেকেই জানা গেল এই মূর্তির ইতিহাস। কুমায়ুনের চাঁদ রাজাদের আমলে ১৬৭৩ সালে চম্পাবতের রাজা বজবাহাদুর তিব্বতের খাম্পা দস্যুদের দমনের জন্য এবং তিব্বতিদের নানা উৎপীড়নের সংবাদ পেয়ে উনটাধুরা পাস অতিক্রম করে তিব্বত আক্রমণ করেন এবং জয়ী হন। এর পর কৈলাস ও মানস পরিক্রমার সময় তিনি অভীষ্টসিদ্ধির জন্য মানত করেন একটি রত্নময় সিদ্ধিদাতার ধাতব মূর্তি রাবণ হ্রদে বিসর্জন দেবেন বলে। যেহেতু কথিত আছে রাবণ হ্রদের অতল জলধিতলে কুবেরের ঐশ্বর্য থাকে, তাই তিনি এইখানেই গণপতি অর্পণের সিদ্ধান্ত নেন। সেই গণপতি এক সন্ন্যাসীর মাধ্যমে বিসর্জন পাঠাবার পর থেকেই যত কিছু অঘটন ঘটতে থাকে। যে-ঘটনার পরম্পরায় আজ এখানে সকলের আসা।

শিরিং লামুর মুখে রূপকথার গল্পের মতো সব কিছু শুনতে লাগল ওরা। শিরিং লামু তিব্বত সম্বন্ধেও কত কথা বললেন। পামির ও তিব্বত হচ্ছে পৃথিবীর ছাদ। এর গড় উচ্চতা ১৩৫০০ ফুটের ওপর। অর্থাৎ কলকাতা থেকে প্রায় আড়াই মাইল ওপরে এর অবস্থান। এর উত্তরে তাকলামাকান ও গোবি মরুভূমি। পশ্চিমে লাদাখ। তিব্বত এবং মানস সরোবরে শিরিং লামু খুব কম করেও পঞ্চাশবার গেছেন। ৮৮ কিলোমিটার আয়তনের এই মানস সরোবরের তিনশো ফুট নীচে আছে এক উষ্ণ প্রস্রবণ। যার ফলে এই সরোবরের মাঝখানের জল তীরের চেয়ে পঞ্চাশ ফুট উঁচুতে। এই সরোবরে গল্প-উপাখ্যানের বর্ণনার মতো কোথাও কিন্তু থরেথরে পদ্ম ফুটে নেই। তবে

সরোবরে শোভাবর্ধনকারী 'ঙঙবা' হাঁসগুলি এখনও আছে।

তিন্নি অবাক বিস্ময়ে সব শুনতে-শুনতে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, মানস সরোবর আর রাবণ হ্রদের মধ্যে পার্থক্যটা কী?"

বাংদি ওর প্রশ্নটা বুঝিয়ে দিল শিরিং লামুকে।

শিরিং লামু বললেন, "তোমরা নিশ্চয়ই জানো, লঙ্কেশ্বর রাবণ ছিলেন দারুণ শিবভক্ত। তিনি হিমালয়ের উচ্চ শিখরে বসে শিবের তপস্যা করতে লাগলেন। সন্তুষ্ট শিব বর দিতে চাইলে রাবণ এমন বর চাইলেন যে, শিবও চমকে উঠলেন। শিব সহ কৈলাস লঙ্কায় নিয়ে যাবেন এই ছিল রাবণের প্রার্থনা। শিবকে বাধ্য হয়েই তথাস্তু বলতে হল। তবে একটা শর্ত জুড়ে দিলেন এই যে, এক রাতের মধ্যেই এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে। বলদর্পী রাবণ খুশিমনেই কৈলাস আনতে চললেন। কিন্তু যেতে-যেতে মহামায়ার মায়ায় এমনই মোহিত হয়ে গেলেন যে, পথেই বিলম্ব হয়ে গেল তাঁর। ফলে রাত্রি প্রভাত হয়ে গেল। শর্ত ভঙ্গ হল। তাই রাবণের শত অনুরোধেও কৈলাস আর যেতে রাজি হল না। ক্রুদ্ধ রাবণ তখন ভীষণ মূর্তি ধারণ করে কৈলাস পর্বতকে সমূলে উৎপাটন করবার চেষ্টা করলেন। সেই মহাশক্তির কাছে কাবু হল কৈলাস। বড়-বড় পাথর ও বরফের চাঁই ভেঙে পড়তে লাগল। প্রাণভয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল পশুপক্ষীর দল। পার্বতীও ভীত হয়ে জড়িয়ে ধরলেন শিবকে। শিব হলেন দেবাদিদেব মহাদেব। তিনি নির্বিকার। মুখ টিপে একটু হাসলেন শুধু। তারপর কৈলাস শিখরে পায়ের বুড়ো আঙুলে করে একটু চাপ দিলেন। কৈলাস স্থির হয়ে গেল। রাবণ আর নড়াতেও পারলেন না তাকে। এদিকে পরিশ্রমে ঘর্মাক্ত হয়ে রাবণ হার মানলেন। রাবণের গায়ের ঘর্মেই যে হ্রদের সৃষ্টি হল তারই নাম রাবণ হ্রদ বা রাক্ষসতাল। শিব অবশ্য রাবণকে নিরাশ করলেন না। বললেন, "যতদিন কৈলাস থাকবে ততদিন তোমার নামে এই হ্রদও থাকবে। এবং কৈলাস-মানসে এসে রাবণ হ্রদ দর্শন না করলে তার তীর্থযাত্রাও বিফল হবে।" তিব্বতের ১৪,৯০০ ফুট উঁচুতে এই রাবণ হ্রদ। তিব্বতি ভাষায় এর নাম 'লাংগাক সো'। এর চারদিকে অনুচ্চ মালভূমি ও পাহাড় আছে। এর আয়তন ১২২ কিলোমিটার। থলথলে কাদা ও চোরাবালিতে ভরা হ্রদ। মানসের চেয়েও এর পরিধি বৃহত্তর। এই হ্রদের বুকে দুটি দ্বীপও আছে। সুমিষ্ট জল। গভীরতা ১৫০ ফুট। এরও মাঝখানে আছে একটি উষ্ণ প্রস্রবণ। কিংবদন্তি, সেখানেই কুবেরের ধনাগার।

গল্প করতে-করতে রাত শেষ হয়ে এল। আকাশের পট থেকে রাতের কালিমা তখনও ঘোচেনি। বাসের হর্ন শোনা গেল। একজন পাহাড়ি মানুষ এসে ডাক দিলেন শিরিং লামুকে। এই বাসেই যেতে হবে তাঁকে। রাজধানী দিল্লি থেকে অনুমোদন নিয়ে কিছু যাত্রী চলেছেন কৈলাস-মানসের পথে। সরকারি তত্ত্বাবধানে যেতে হবে তাঁদের সঙ্গেই। এটাই নিয়ম। এই নিয়মের অন্যথা হয় না। তিব্বত সীমান্তে চিনা রক্ষীবাহিনীর নজর এড়িয়ে ভেতরে প্রবেশ করার অধিকার বা উপায় কারও নেই। আপাতত এই বাস ওদের তাকলাকোট পর্যন্ত নিয়ে যাবে।

কেউ হাসিমুখে, কেউ চোখের জলে বিদায় দিল শিরিং লামুকে। এইটাই

pathagar.net

শেষ বিদায়। শিরিং লামু রাবণ হ্রদে সোনার গণপতি বিসর্জন দিয়ে মানস সরোবরে স্নান করে কৈলাস পরিক্রমা করবেন। তারপর চলে যাবেন ডোলমা পাসের কাছে, তাঁর গ্রামে। যেখানে তিনি জন্মেছিলেন। হয়তো আর কখনও তিনি ফিরবেন না। কেননা জরা ও বার্ধক্যে ভগ্ন শরীরের জন্য হয়তো-বা ফেরা হবে না।

শিরিং লামুকে নিয়ে সরকারি বাসটা গারবিয়াং গ্রাম ছেড়ে চলে গেল কালাপানি হয়ে তাকলাকোটের দিকে। আর সেই আবছা অন্ধকারে একটি উপত্যকার মতো অংশ বেয়ে বিল্টু, শুভঙ্কর, তিন্নি, মউ, বাংদি লেডেন ও ছিমি চলে এল এমন এক জায়গায়, যেখান থেকে দূরে বহুদূরে যেসব বরফের পাহাড় আছে তার ফাঁক দিয়ে রামধনুর রংবাহারে সারা আকাশ ভরিয়ে দিয়ে উঠে আসবেন সূর্যদেব। ওই, ওই তো আকাশের পটভূমিতে শুরু হয়েছে রঙের খেলা। গারবিয়াং-এর প্রচণ্ড শীতকে উপেক্ষা করেও একটি-দুটি করে ভোরের পাখি ডাকছে। পুবের আকাশে ভাসমান মেঘগুলো যেন ইন্দ্রের ঐরাবতের মতো মনে হচ্ছে। তার একটু নীচে রঙিন উপত্যকায় পুঞ্জ-পুঞ্জ যে মেঘস্তর জমে আছে, সেগুলোকে মনে হচ্ছে সূর্যের প্রতীক্ষায় মানসের 'ঙঙবা' হংসমালা যেন অধীর আগ্রহে উন্মুখ হয়ে ভাসছে।

সেই নব সূর্যোদয়ের জবাকুসুম রঙে রাঙা হয়ে উঠেছে সকলে। তিন্নি শুভঙ্করের কাঁধে হাত রেখে বলল, "ওই, ওই দ্যাখো শুভদা! দেখতে পাচ্ছ? ওই আমার স্বপ্নের দেশ। আমি যে কতবার স্বপ্ন দেখেছি ওই দেশের। ওটা আকাশ নয়, বুঝেছ। ওই আকাশ আর বরফচূড়ার কোলে ওই যে আলোর উপত্যকা, ওই হল আসল মানস সরোবর। ওই মেঘগুলো ঠিক যেন পালতোলা নৌকো। আচ্ছা শুভদা, এখন কি মনে হচ্ছে না এই আকাশ, এই প্রকৃতি, এই রঙিন পটভূমি—এর সবটাই আমাদের স্বপ্নের মানস। আর আমরা সেই সরোবরের বুকে একটা দ্বীপে এসে আশ্রয় নিয়েছি অথবা মেঘের ভেলায় ভেসে চলেছি। আর ওই তুষার-কিরীট পাহাড়টাকে দ্যাখো, ওটা কি পাহাড়? না। উনি পর্বতরূপী গণপতি। সিদ্ধিপ্রদ। সিদ্ধিদাতা। ওই দ্যাখো, ইন্দ্রের শ্বেত হস্তী কেমন শুঁড় দোলাচ্ছে।"

শুভঙ্কর বলল, "কী হল তোমার? কীসব আবোলতাবোল বকছ? তোমার কথার কোনও খেই পাচ্ছি না। তিন্নি! তুমি সুস্থ আছ তো?"

মউ বলল, "আজকাল ও কিছুদিন ধরেই এইসব আবোলতাবোল বকছে। স্বপ্ন দেখছে। ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়ে উঠছে। কী যে হয়েছে ওর, কে জানে?"

তিন্নির গলার স্বর ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে এল। সে বলল, "আমি আবোলতাবোল বকছি, তাই না? তোমরা দ্যাখো, ভাল করে দ্যাখো, তা হলেই সব কিছু দেখতে পাবে। তোমরা 'ঙঙবা'র ডাক শুনতে পাচ্ছ না? আমি পাচ্ছি। তোমাদের কি দিব্যদৃষ্টি নেই? আমি তো সব কিছুই দেখতে পাচ্ছি। তোমরা পাচ্ছ না কেন? মউ, তুমি সেই গানটা একবার গাইবে? ওই যে গো, সেই গানটা, আলোক সাগরে অন্ধ স্নান করে আলো কেমন বুঝতে নারে।" এই পর্যন্ত বলেই মউয়ের কাঁধের ওপর আচ্ছন্নের মতো লুটিয়ে পড়ল তিন্নি। বোঝাই গেল, দারুণ আবেগে জ্ঞান হারিয়েছে সে।

বিল্টু, শুভঙ্করের মুখ শুকিয়ে গেল ভয়ে। কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "কী হল! ও হঠাৎ ওরকম হয়ে গেল কেন?"

মউ বলল, "ভয় নেই। এরকম ওর মাঝে-মাঝেই হয়। ঘরে গিয়ে চোখেমুখে একটু জলের ঝাপটা দিলেই ঠিক হয়ে যাবে।"

লেডেন, অংমু ও ছিমি পাঁজাকোলা করে তুলে নিল তিন্নিকে। তারপর শিরিং লামুর সেই কুটিরের দিকে এগিয়ে চলল ধীরে-ধীরে। রজতগিরির স্বর্ণচূড়ায় তখন অর্কের অবস্থান। শুভঙ্করের মনে হল, ওই অগ্নিবলয়টা সূর্য নয়। ওটা আসলে সোনার গণপতির হিরের চোখ।

—

pathagar.net